ধর্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্ব

ও

কর্ত্তব্য-বিচার।

ন বেদ ত্বামীশ সাক্ষাদ্ধি বেদঃ,
নো বা বিষ্ণুর্নো বিধাতাখিলস্য।
ন যোগেন্দ্রা ইন্দ্রমুখ্যাশ্চ দেবাঃ,
ভক্তো বেদ ত্বামতস্ত্বাং প্রপদ্যে॥

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত

কলিকাতা,
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১২।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

শ্রীবারেশ্বর পাঁড়ে।

PRESS, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন

পূর্ব্বে শিক্ষিতগণ জাতীয় ধর্ম্মকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, ও আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে যেরূপ লজ্জা বোধ করিতেন, এক্ষণে সে ভাব আর নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মগণও আগ্রহসহকারে হিন্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিতেছেন। পূর্ব্বে বিশ্বাস থাকিলেও লজ্জা-ক্রমে কেহ দেবমূর্ত্তির দর্শন ও প্রণামাদি করিতে পারিতেন না, এক্ষণে সে লজ্জা আর নাই। এক্ষণে অনেককেই সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-আচার-পরায়ণ দেখা যায়। কাযেই বোধ হয় এক্ষণে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে কারণে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, এক্ষণকার ধর্ম্মপরায়ণতাও সেই কারণ-সম্ভূত। পূর্ব্বে সাহেবদিগের ব্যবহারাদি দর্শনে সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহারা দেবতা-স্বরূপ; তাঁহাদের নিকট ছোট বড় নাই, তাঁহাদের স্বার্থপরতা নাই, কোনরূপ কুসংস্কার নাই, যাহা সত্য ও ন্যায়সম্মত, তাঁহারা তাহারই পরতন্ত্র; জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন ও সতত আমাদের হিতসাধনে তৎপর থাকেন; আমাদিগের হিতেরই জন্য তাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা দান ও সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এইরূপ নানা সংস্কারপরায়ণ হইয়া আমাদের শিক্ষিতগণ সাহেবদের বাক্যকে বেদবাক্য জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মত-বিরুদ্ধ বলিয়া, জাতীয় ধর্ম্ম ও রীতিনীতির প্রতি এককালে বীতশ্রদ্ধ হইয়া-ছিলেন। এক্ষণে সাহেবদের দেবভাবের প্রতি সে বিশ্বাস আর নাই।

অন্যান্য মানবের ন্যায় স্বার্থসাধনই যে তাঁহাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য, এ কথা এক্ষণে অনেকেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী যে উৎকৃষ্ট, এ বিশ্বাস আমাদের এখনও বিলক্ষণ আছে। উন্নতি করিতে হইলে যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদেরই পথাবলম্বন কর্ত্তব্য, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণই আছে। তাই তাঁহাদের অনুসরণে যেমন সভা সমিতি আন্দোলনাদি করিয়া থাকি, সেইরূপ তাঁহাদেরই অনুসরণে জাতীয় ধর্ম্ম ও রীতিনীতির পরতন্ত্র হইবার চেষ্টা করিতেছি। দেখিয়াছি, ভাল ভাল বিজ্ঞ পণ্ডিত সাহেবগণের বাইবেলে কিঞ্চিন্মাত্রও বিশ্বাস নাই, তথাপি তাঁহারা জাতীয় রীতিনীতি ত্যাগ করেন না, জাতীয়তা রক্ষা তাঁহাদের মতে একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক পাশ্চত্যপণ্ডিত আমাদের জাতীয়ভাব ত্যাগ করিবার জন্য যথেষ্ট নিন্দাও করেন। তাই আমরা তাঁহাদের উপদেশে ও অনুকরণে জাতীয়তা রক্ষার খাতিরে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়াছি, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বশতঃ নহে।

এ ভাব যে মন্দের ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, সৎ কর্ম্মের কাচও ভাল, এবং কাচ করিতে করিতে প্রকৃত পথে আসার সম্ভাবনাও আছে। কিছু কিছু হইতেছেও বটে। এক্ষণে অনেকে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন ও অনেকে বুঝিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্মের তুল্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া এক্ষণে অনেকে বুঝিয়াছেন আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অপেক্ষা কোনও বিষয়ে নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেক বিষয়ে ইহার মত অনেক উৎকৃষ্ট। ইহাতে এই হইয়াছে যে, পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতি, ঋষিগণের প্রতি যে ঘৃণার ভাব ছিল, সেটুকু গিয়াছে, প্রত্যুত তাঁহারা যে বিলক্ষণ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন, এ বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অতি অল্প লোকেরই জন্মিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ পালন করা যে নিতান্তই কর্ত্তব্য, এ বিশ্বাস এখনও হয় নাই। আপন আপন যুক্তির সহিত যেখানে ধর্ম্মশাস্ত্রমতের বিরোধ হয়, সেখানে

যুক্তিরই জয় হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সকল কথা আপনার যুক্তি ও পাশ্চাত্য মতের সহিত সামঞ্জস্য হয়, সেইগুলিই শিক্ষিতগণ মানেন। সেইজন্য এক্ষণে তাঁহারা শাস্ত্রের অংশবিশেষকে শ্রদ্ধা করেন ও অংশবিশেষের নিন্দা করেন। এ নির্ব্বাচন বিষয়ে সকলে একমত নহেন। কেহ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের মতে বর্ণভেদপ্রথা উঠাইয়া দিয়া হিন্দু হয়েন, কেহ উপনিষদের মতানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া হিন্দু হয়েন, কেহ পরাশরের মতে বিধবাবিবাহ দিয়া হিন্দু হয়েন। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র অনন্ত রত্নাকর, ইহাতে না পাওয়া যায়, এমন মতই পৃথিবীতে নাই। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার উপযোগী সকলপ্রকার ব্যবস্থাই ইহাতে আছে। যাঁহার যেমন প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস, তদনুরূপ ব্যবস্থা দেখাইয়া আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন।

ইহাকে শাস্ত্রপরায়ণতা বলে না, ইহা স্বেচ্ছাচারেরই প্রকারভেদ মাত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে হইলে সম্পূর্ণ ভাবে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধভাব দৃষ্ট হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অবলম্বনে সে বিরোধের ভঞ্জন করিতে হয়। নিজের স্বাধীন যুক্তিমাত্রের উপর নির্ভর করিলে, অথবা ইচ্ছা মত কোন এক বিশিষ্ট বা সম্প্রদায়িক মতের অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মশাস্ত্র মান্য করা হয় না, নিজেকেই মান্য করা হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা নিজের প্রাধান্যই জ্ঞাপন করা হয়। এরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণতায় পরকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহকালের মঙ্গলই সাধিত হয় না। যে জাতীয়তা রক্ষার উদ্দেশে এক্ষণে শিক্ষিতগণের ধর্ম্মশাস্ত্রের অবলম্বন, সে জাতীয়তা রক্ষাও হয় না; যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস স্বজাতির মধ্যে একতা-বিধানের হেতু, এরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণতায় তাহাও হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে কি ইহ, কি পর, কোন কালেরই হিতকর কার্য্য করা যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রে অটল বিশ্বাস না হইলে কর্ত্তব্যপালনেই প্রবৃত্তি হয় না, স্বার্থসাধন ভিন্ন যে কোন কর্ত্তব্য মানবের আছে, এ বিশ্বাসই জন্মে না।

এই সকল কথা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক্ষণে আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়াছে, বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অলৌকিক বাক্যে বিশ্বাস বা অন্ধবিশ্বাস আমাদের জন্মিতে পারে না। সেইজন্য হৃদয়ে স্থান পাইবে না বলিয়া, আধ্যাত্মিক পথের অনুসরণে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া এই ধর্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। এক্ষণকার শিক্ষা ও সংস্কারের উপযোগী যুক্তিরই আশ্রয়ে আলোচনা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞানহীনের দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনাই নাই। কেবল মনের আবেগ বশতই এই দুর্ব্বহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। 'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ'। তবে ভরসা এই যে, "মানবতত্ত্ব" লেখার প্রয়াস আমার এককালে বিফল হয় নাই। মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছিল, সে সকল তখনকার সময়ের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি আগ্রহের সহিত সকলে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; এমন কি, এক্ষণে অনেককেই ঐ সকল মতের পোষকতা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, ভরসা করি সকলে একটু সময় নষ্ট করিয়া পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। তাহা হইলেই সকল শ্রম সফল বোধ করিব। আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুস্তকের আয়তন-বৃদ্ধি-ভয়ে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

এই গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের অনুবাদ যথাস্থানে দেওয়া হয় নাই, গ্রন্থের শেষে স্বতন্ত্র ভাবে দেওয়া হইয়াছে। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিয়া লইবেন।

১৫ ভাদ্র, ১৩১২ সাল;
কলিকাতা।

শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা।

সূচী।

পরিচ্ছেদ।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১	**ধর্ম্মশাস্ত্রই কর্ত্তব্যানুরাগের কারণ**	১—২০
	প্রকৃতির পরবশ হইলে মনুষ্য মনুষ্য হয় না	৩
	প্রকৃতির নিদেশে চলিলে পশুবৃত্তিরই অনুশীলন হয়	৪
	ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতাই মানবত্বানুশীলনের কারণ	৫
	অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না	১০
	যুক্তির আশ্রয়ে কর্ত্তব্য স্থির হয় না	১২
২	**স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না**	২১—৩৬
	কার্য্যফল দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না	২২
	প্রতিশোধভয়ে বা উপকারের আশায় কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না	২৪
	সমাজভয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় না	২৬
	রাজশাসন মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না	৩২
৩	**নীতিশাস্ত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না**	৩৭—৬৭
	সাম্যবাদ	৪০
	অন্তঃসংজ্ঞাবাদ	৪৯
	সমাজবাদ	৫৪
	হিতবাদ	৫৭
	স্বার্থসাধনই নীতিপরায়ণতার উদ্দেশ্য	৬১
৪	**ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা নহে**	৬৮—৯৪
	কল্পিত হইলেও মিথ্যা নহে	৭৮
৫	**ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে**	৯৫—১৩৩
	ঈশ্বরপ্রকরণ	৯৮
	নীতিপ্রকরণ	১০৪
	অনুষ্ঠানপ্রকরণ	১১৪

পরিচ্ছেদ।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
৬	ধর্ম্মশাস্ত্র স্বার্থপরের প্রণীত নহে ...	১৩৪—১৪৬
৭	ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না	১৪৭—১৬৬
৮	ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরেরই প্রণীত	১৬৭—১৮২
	সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র	১৭২
৯	ধর্ম্মশাস্ত্র উন্নতির বিঘ্নকারক নহে	১৮৩—২০৬
	ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতাই প্রকৃত উন্নতির উপায়	২০২
	হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনীয় না হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই থাকে না ...	২০৪
১০	হিন্দুর অবনতি হইল কেন ? ...	২০৭—২১৫
১১	ধর্ম্মশাস্ত্র-সমন্বয় ...	২১৬—২২৪
১২	পাশ্চাত্য পথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না	২২৫
১৩	ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে উন্নতি হইবে না	২৫৭—২৯৮
	হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বর্ত্তমানকালের অনুপযোগী নহে	২৬৭
	আপাত-করণীয় প্রধান কর্ত্তব্যনিচয়	২৭৭
	শিক্ষিতগণকেই নেতা হইতে হইবে	২৯৩
পরিশিষ্ট	এই গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের বঙ্গানুবাদ	২৯৯—৩০৪

ধর্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্ব

ও

কর্ত্তব্য বিচার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মশাস্ত্রই কর্ত্তব্যানুরাগের কারণ।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরবশ হইয়া আত্মোদর-পূরণাদি করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিলেই যেমন মনুষ্যেতর জীবগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, মনুষ্যের সেরূপ নহে। মনুষ্যও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশীভূত বটে, কিন্তু প্রবৃত্তির নিরোধ করিবার শক্তিও মানবের আছে। তাই মনুষ্য পশ্বাদির ন্যায় কেবল স্বার্থপর নহে, তাই মনুষ্য পরার্থের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে, তাই মনুষ্য সর্ব্বজীবের প্রধান। তাই সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মনুষ্যভুক জন্তুগণও মানবের বশ্যতা স্বীকার করে। এই সময়োচিত স্বার্থত্যাগ ও প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির সংযমই মানবের মানব-ধর্ম্ম। যে সকল বৃত্তির পরবশ

হইয়া মানব পরার্থ-সাধন-পরায়ণ হয় ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংযম ও পরিবর্দ্ধন করে, সেই বৃত্তিগুলি মানব ভিন্ন অন্য কোন জীবের নাই। কিন্তু অন্যান্য জীবের যে সকল বৃত্তি আছে, তৎসমস্তই মনুষ্যের আছে। যথা—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মস্তু তেষাং হি বিশেষ এব,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

কিন্তু পরার্থসাধনী বৃত্তিগুলি মানবের প্রাকৃতিক হইলেও তেমন তেজস্বিনী নহে। পশুধর্ম্ম যেরূপ স্বতঃ স্ফুরিত ও স্বতঃ পরিবর্দ্ধিত হয়, মানবধর্ম্ম সেরূপ হয় না; স্বার্থসাধনে যেরূপ আশু দুঃখ নিবারণ ও সুখ অনুভব হয়, পরার্থসাধনে সেরূপ হয় না, পাশব ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা-সাধনে যত শীঘ্র সুখ অনুভূত হয়, সংযম-জনিত সুখ তত শীঘ্র অনুভূত হয় না। বিশেষ অনুশীলন না করিলে স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জনিত সুখও পাওয়া যায় না। তাই মানব পশ্বাদির ন্যায় স্বভাবতঃ স্বার্থপর। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জীবগণ প্রকৃতি বশতই হিংস্র; মেষ ছাগ প্রভৃতি প্রকৃতি বশতই নিরীহ; তাই হিংসাতেই ব্যাঘ্রাদির সুখ ও অহিংসাতেই ছাগাদির সুখ; তাই কোন সিংহ-ব্যাঘ্রই মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করে না এবং কোন ছাগ-মেষই মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে না। মনুষ্যের মধ্যে উভয় প্রবৃত্তিই আছে; প্রাণিহিংসা দ্বারা মাংস ভোজন করিয়া মানব সুখীও হয়, দুঃখও পায়। আবার মাংস ত্যাগ করিয়াও সেইরূপ সুখীও হয়, দুঃখও পায়। প্রকৃতিই এরূপ ভিন্নতার প্রধান কারণ হইলেও কেবল প্রাকৃতিকতা কারণ নহে। তাহা যদি হইত অর্থাৎ ইতর প্রাণিগণ যেমন স্বাভাবিক প্রকৃতি বশতঃ হিংস্র বা নিরীহ হয়, মনুষ্য যদি সেরূপ হইত, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই একরূপ হইত, অর্থাৎ সকল সিংহই যেমন একইরূপ হিংসাপরায়ণ ও সকল মেষই যেমন একইরূপ নিরীহ, সকল মনুষ্যও সেইরূপ একইরূপ পশুধর্ম্ম

শু. মানবধর্ম্ম-পরায়ণ হইত। তাহা ত নহে। কত লোক স্বার্থসাধনজন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বিনাশ সাধন করেন, আবার কত লোক পরের জন্য অকাতরে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এক জন স্বর্গের দেবতা ও অপর একজন নরকের কীট।

প্রকৃতির পরবশ হইলে মনুষ্য মনুষ্য হয় না।

সত্য বটে সকলের প্রকৃতি সমান নহে। কাহারও পশুপ্রকৃতি প্রবল ও কাহারও মানবপ্রকৃতি প্রবল। প্রকৃতি বশতঃ কেহ অধিক ক্রোধী, কেহ অধিক কামুক, কেহ অধিক হিংসুক, কেহ অধিক দয়ালু ও কেহ অধিক বিনীত; সেই জন্য মানবগণের কার্য্য ভিন্নরূপ হয়; যাঁহার যেমন প্রকৃতি, তিনি তদনুরূপ গুণ-সম্পন্ন ও তদনুরূপ কার্য্য-পরায়ণ হয়েন। কিন্তু অনেক সময়েই মানবকে প্রকৃতির বিরোধী গুণ-সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। অনেক সময়েই দেখা যায়, মহাক্রোধী ব্যক্তি বিনীত হইয়াছেন, ভয়ানক স্বার্থপর একান্ত পরার্থপর হইয়াছেন; আবার অনেক দয়ালুকেও অনেক সময়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইতে দেখা যায়। সুতরাং কিপ্রকারে বলা যাইবে যে, মানব কেবল প্রকৃতিরই অনুরূপ গুণসম্পন্ন হয়? আবার ইহাও দেখা যায়, যেখানে কেবল প্রকৃতিরই পরবশ হইয়া মানব অত্যধিক দয়া-ক্ষমাদি মানবীয় গুণসম্পন্ন হয়, সেখানে সে গুণ অনিষ্টেরই কারণ হইয়া থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, অতিরিক্ত ক্ষমা-দয়াদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অশেষ কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, অথবা দয়ার বশীভূত হইয়া দয়ালু সমস্ত অর্থ দান করিয়া ফেলেন ও অবশেষে তাঁহার নিজের ও পরিবারবর্গের দুঃখের সীমা থাকে না। ঐরূপ অযথা ক্ষমাশালীর প্রতিপদে ক্ষমা দেখিয়া দুর্বৃত্তগণ নির্ভয়ে তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করে। সুতরাং প্রাকৃতিক মানবীয় গুণসম্পন্ন হইলেও মানুষ মানুষ হয় না। প্রয়োজন মত মানবীয় গুণেরও সংযম করা আবশ্যক। নচেৎ মানব, সকল জীবের শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, নিজেরই অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। ঈশ্বর মানবে যে মানবধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম

দিয়াছেন, ঐ উভয়েরই যথা-পরিচালনা করিতে পারিলেই মানবত্ব রক্ষা হয়, অর্থাৎ আবশ্যক মত পশুধর্ম্ম ও আবশ্যক মত মানবধর্ম্ম উভয়েরই পরবশ হইলে মানুষ মানুষ হয়। কোন একটীর অযথা প্রাবল্য বা বিলোপ হইলে মানবত্ব থাকে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি পাশব-বৃত্তি সকলের পরবশ না হইলে জীবন রক্ষা হয় না, সৃষ্টিও থাকে না; আবার দয়া, ভক্তি, ত্যাগাদি মানবীয় বৃত্তি সকলের পরবশ না হইলে লোকস্থিতি ও আত্মোন্নতি সম্পাদিত হয় না। তাই মানবের এই উভয়-প্রকার বৃত্তিরই যথা-পরিচালন আবশ্যক।

কিন্তু পশুপ্রবৃত্তি সকল যেমন প্রকৃতি বশতঃ প্রবল, মানবীয় প্রবৃত্তি-গুলি সেরূপ প্রবল নয়। জীবন ও বংশ-রক্ষার জন্য ঈশ্বর ঐ প্রবৃত্তি-গুলিকে তেজস্বিনী করিয়াছেন। সুতরাং কেবল প্রকৃতির বশে চলিলে মানব প্রবল পশুবৃত্তিরই পরবশ হয়। দুর্ব্বল বৃত্তির কার্য্য করিতেই পারে না।

প্রকৃতির নির্দেশে চালিলে পশুবৃত্তিরই অনুশীলন হয়।

আবার নিজের আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি যেমন সর্ব্বদা স্বভাবতঃ প্রযো-জনীয় ও সেইজন্য নিয়ত যেমন পাশববৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়, সংযমের ও পরের প্রয়োজন সাধনের তত প্রয়োজন না থাকায় দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধাদি মানবীয় বৃত্তি সকলের তেমন অনুশীলন হয় না। একে মান-বীয় বৃত্তি সকল স্বভাবতঃ পাশববৃত্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল, আবার সে সকলের পরিচালনা না হওয়ায় আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পশুপ্রবৃত্তি সকল স্বভা-বতঃ প্রবল ও নিয়ত সে সকলের পরিচালনা হওয়ায় আরও শক্তিসম্পন্ন হয়। কাযেই বিরুদ্ধভাবাপন্ন স্বভাবতঃ দুর্ব্বল মানবীয় বৃত্তিগুলি পরিচাল-নার অভাবে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া এককালে বিলয়প্রাপ্ত হয়। পরি-চালনা না থাকিলে—ব্যবহার না থাকিলে তীক্ষ্ণ অসিরও ধার থাকে না। অতএব মানব হইতে হইলে যাহাতে পশুপ্রবৃত্তি সকলের পরিচালনার

সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় বৃত্তি সকলের পরিচালনা হয়, তাহার উপায় আবশ্যক। নচেৎ কখনই মানবের মানবত্ব রক্ষা ও উন্নতি হয় না; পশ্বাদির ন্যায় চিরকাল একভাবেই প্রকৃতিপরায়ণ থাকিয়া যায়।

কিন্তু ক্ষুধার বশবর্ত্তী হইলে যেমন স্বভাবতঃ ভোজনের প্রবল ইচ্ছা হয়, কামের বশবর্ত্তী হইলে যেমন স্বভাবতঃ সন্তানোৎপাদনের প্রবল ইচ্ছা হয়, শীত-বাতাদির কষ্ট দূর করিবার জন্য যেমন স্বভাবতঃ গৃহ ও বসনাদিলাভের প্রবল ইচ্ছা হয়, প্রাকৃতিক আকর্ষণ জন্য যেমন স্ত্রীপুত্রাদির হিতাভিলাষ স্বতঃ মনে উদিত হয়, অহঙ্কারপরায়ণ হইলে যেমন স্বভাবতঃ আত্মগৌরববৃদ্ধির প্রবল ইচ্ছা হয়, পরের হিত সাধন ও দুঃখ নিবারণাদির ইচ্ছা সেরূপ স্বতঃ প্রবল হইবার কারণ দেখা যায় না; দয়া ক্ষমা প্রভৃতির ক্ষণিক উত্তেজনায় কখন কখন পরার্থসাধন ও ইন্দ্রিয়াদি-দমনের ইচ্ছা জন্মিলেও স্বার্থপরতা ও প্রবল ইন্দ্রিয়ের প্রবল তাড়নায় তখনই সে ইচ্ছা বিলুপ্ত হয়। সুতরাং নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, কেবল প্রকৃতির পরবশ হইলে মানবীয় বৃত্তি সকলের পরিচালনা হওয়া একান্ত অসম্ভব। কেবল প্রকৃতির পরবশ হইয়া চলিলে পশ্বাদির ন্যায় স্বার্থসাধন ও কামনাপূরণরূপ সুখের চেষ্টা ভিন্ন মানবের যে অন্য কর্ত্তব্য আছে, তাহা মানব বুঝিতেই পারে না। কাযেই বলিতে হইবে, মানুষকে মানুষ করিবার জন্য প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোন পরিচালক আছে। সেই পরিচালকের নিদেশবর্ত্তী হইয়া মানব প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজনানুরূপ দমন ও পরিবর্দ্ধন করে। ধর্ম্মশাস্ত্রই যে সেই পরিচালক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণতাই মানবত্বানুশীলনের কারণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া মানব আত্মতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কর্ত্তব্যতত্ত্ব, স্বার্থতত্ত্ব ও সুখতত্ত্ব বুঝিতে পারে; তাই প্রয়োজন মত প্রবল পশুবৃত্তিসকলের দমন ও দুর্ব্বল মানবীয় বৃত্তি সকলের পরিচালনায় যত্নবান্ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে বুঝিতে পারে, প্রাকৃতিক পাশব সুখ-স্বার্থ অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রোক্ত

মানবীয় সুখ-স্বার্থ অধিক স্থায়ী ও আনন্দপ্রদ; তাই সেই লোভনীয় সুখের আশায় ও কর্ত্তব্যবোধে মানব মানবত্ব লাভের চেষ্টা করে। ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে, মৃত্যু হইলে শরীরমাত্রেরই ধ্বংস হয়, আত্মার ধ্বংস হয় না; আত্মা অনন্তকালস্থায়ী। দেহ ধারণ করিয়া জীবগণ অতি অল্প দিনই ইহ সংসারে বাস করে; সুতরাং ইহকালের ক্ষণিক দৈহিক সুখদুঃখ, সুখদুঃখই নহে. পরকালের অনন্তকালস্থায়ী আত্মার সুখদুঃখই চিন্তনীয়। অর্থাৎ যাহাতে পরকালে দুঃখ না পাইয়া সুখী হওয়া যায়—ঈশ্বরসাযুজ্য লাভ করিয়া পরমানন্দ লাভ হয়, তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। পৃথিবী মানবের কর্ম্ম-ভূমি। এই পৃথিবীতে যে জীব যেমন কর্ম্ম করিবে, সে জীবের আত্মা পরকালে সেই কার্য্যের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে। যে সকল কার্য্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র-মতে কর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে ইহকালে দুঃখ হইলেও তাহা পরকালের চিরসুখের কারণ; এবং যে সকল কার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে অকর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে কামনাপূরণ-জনিত ইহকালে প্রভূত সুখ হইলেও তাহা পরকালের নানা দুঃখের কারণ। ধর্ম্মশাস্ত্রজাত এই জ্ঞান লাভ করিয়া বা এই বিশ্বাসের পরতন্ত্র হইয়া মানব ইহকালের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়জনিত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কষ্টকর কর্ত্তব্যে রত হয়, এবং অনুশীলন দ্বারা কর্ত্তব্যানুরাগের পরিবর্দ্ধন করিয়া তাহার সহায়তায় প্রাকৃতিক স্বার্থপরতার আকর্ষণকে খর্ব্ব করিয়া মানবত্বের বৃদ্ধি করে। ধর্ম্মশাস্ত্র অলৌকিক অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রণীত বিশ্বাস থাকায় তল্লিখিত কর্ত্তব্য ও কর্ম্মফলের প্রতি কাহারই সন্দেহমাত্র থাকে না; তাই আগ্রহসহকারে প্রবৃত্তির দমন করিবার চেষ্টা করে। পাশববৃত্তির পরিচালনা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় বোধে মানবীয় বৃত্তির পরিচালনায় যত্নবান্ হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরে ভক্তি থাকাতেই মানব পাশববৃত্তির দমন ও মানবীয় বৃত্তি সকলের পরি-বর্দ্ধনের চেষ্টাজন্য নানা কষ্ট গ্রহণ করে। সেই অনুশীলনের ফলে মানব করিতে না পারে এমন কোন কঠিন কার্য্যই নাই। কেহ নিরম্বু উপবাস

করিতেছেন, কেহ অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেছেন, কেহ দিবানিশি জপতপে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কেহ স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন, কেহ পরের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, সতী পতির চিতাগ্নিতে অনায়াসে আপনার দেহ ভস্মীভূত করিতেছেন। যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনের বিমলানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। ঈশা, বুদ্ধ, চৈতন্যাদি মহাপুরুষগণ সমস্ত পাশব সুখ ত্যাগ করিয়া কেবল সেই আনন্দেই নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের উদাহরণে লোকে অনেক স্বার্থই বিসর্জ্জন দেন।

ঈশ্বরে ও ভবিষ্যৎ নিত্য সুখলাভের প্রতি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে স্বার্থপর সুখ-লিপ্সু পশুধর্ম্মপ্রধান মানব কখনই পাশব সুখের পথ ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপালনের দুঃখের পথ অবলম্বন করিত না। সুখভোগই যখন মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন ইচ্ছা করিয়া মানব সে সুখভোগ ত্যাগ করিবে কেন? করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেই বা কি প্রকারে? প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কি অপ্রাকৃতিক উপায়ে হইতে পারে? কখনই না। প্রকৃতির ন্যায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রও ঐশ্বরিক, সুতরাং প্রাকৃতিক; তাই ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে প্রাকৃতিক পাশব প্রবৃত্তির দমন হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকাতেই পরকালের সুখের আশায় ও দুঃখের ভয়ে, কর্ত্তব্যবোধে ও ঈশ্বরের প্রিয় হইবার অভিলাষে পাশব প্রবৃত্তি সকলের দমনের চেষ্টা করে ও সেই অনুশীলন জন্য মানব মানবীয় গুণ-সম্পন্ন হয়। সত্য, দম, অস্তেয়, ক্ষমা, দয়া, বিনয়াদির পরতন্ত্রতা যে মানবত্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেই মানব তাহা জানিতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলে মানবের এ সকল জানিবারই কোন সম্ভাবনা ছিল না। ধর্ম্মশাস্ত্রই মানুষকে মানুষ করে। অতএব যদি মানবত্ব-সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া যে মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে এক্ষণে লোকের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। অজ্ঞের অশ্রদ্ধা নহে, পাপিষ্ঠের অশ্রদ্ধা নহে, নাস্তিকের অশ্রদ্ধা নহে; যাঁহারা বিজ্ঞ ও সভ্য, যাঁহারা জনসমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, যাঁহারা আধুনিক জগতের উন্নতি-বিধাতৃরূপে আপনাদিগকে পরিচিত করেন, যাঁহারা কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট মানবকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন অসাধরণ পণ্ডিত বর্গই এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের নাস্তিকেরা অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর, পরকাল এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই স্বীকার করিতেন না, যাঁহাদের মতে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ," তাঁহারাই ধর্ম্মশাস্ত্রের অমর্য্যাদা করিতেন। এক্ষণে কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অমর্য্যাদা করেন। যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা ত ধর্ম্মশাস্ত্রকে গ্রাহ্য করেনই না; যে শ্রদ্ধাপরায়ণ ভক্তগণ ঈশ্বর-সেবা ও পরার্থ-সাধনকে মুখ্য কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা করেন; তাঁহারাও ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণকে মূর্খ ও কুসংস্কারসম্পন্ন মনে করেন। অধিক কি, যাঁহারা ঈশ্বরপ্রণীত মনে করিয়া সম্পূর্ণভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের পরতন্ত্র, যাঁহাদের মতে ধর্ম্মশাস্ত্র অবিশ্বাস করিলে চিরকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাঁহারাও পাকতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের অযথা নিন্দা করেন। তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আর সমস্তকেই ভ্রান্ত ও মানবের মনঃকল্পিত বলেন। খৃষ্টান বলেন, কেবল বাইবেল সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা; মুসলমান বলেন, কোরাণ ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মশাস্ত্রকে মানবের মনঃকল্পিত মিথ্যা মনে করেন—স্বসম্প্রদায়স্থ কতকগুলি লোক ভিন্ন পৃথিবীর যাবতীয় লোককেই ভ্রান্ত, কুসংস্কারসম্পন্ন ও মিথ্যাধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ মনে করেন।

এইরূপে কি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশ্বাসী, কি ধর্ম্মশাস্ত্র-অবিশ্বাসী সকলেই স্বসম্প্রদায়স্থ জনগণ ভিন্ন সকলকেই ভ্রান্ত বিবেচনা করেন। যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি সকলকে সেই মতাবলম্বী করিবার অভি-প্রায়ে আপন মতের বা ধর্ম্মশাস্ত্রের নানাবিধ প্রশংসা ও অন্য মতের বা ধর্ম্মশাস্ত্রের নানা নিন্দা করেন। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহাদের অনেকেই পণ্ডিত, তার্কিক ও বাগ্মী। তাঁহাদের মনোহর বক্তৃতা-শ্রবণে ও সুললিত প্রবন্ধ-পাঠে সাধারণ লোকে যে মোহিত হইবে, তাহাতে আর কথা কি? তাঁহারা যে আপন মতের সারবত্তা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা নহে; কিন্তু যে মত পরিত্যাগ করাইয়া লোককে নিজ মতে আনিবার চেষ্টা করেন, সে মতের এত দোষ দেখান এবং সে মতে থাকিলে যে বৃথা বহু কষ্ট পাইতে হয়, তাহা এমন কৌশলে বুঝাইয়া দেন যে, সাধারণ লোকে তাহাতেই ভুলিয়া যায়। যে নূতন মতের কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা সত্য কি না বুঝিতে না পারিলেও, যে মত অবলম্বনে এক্ষণে চলিতেছেন, তাহা যে মিথ্যা ও দোষপূর্ণ, এ কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হয়। নিয়ত এইরূপ আলোচনা হইতে থাকায় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের বিশ্বাসের একান্ত শিথিলতা হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম প্রথম যাঁহারা ঐ সকল বক্তৃতায় ভুলিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিশেষের পরতন্ত্র হইয়া কর্ত্তব্যবিশেষে অনুরাগী হইতেন; কিন্তু ক্রমে সে ধর্ম্মেরও ঐরূপ নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে শান্তি পাইবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহা আর পাইলেন না—যে বিশ্বাসভরে নরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিশ্বাস আর থাকিল না। এইরূপে লোকের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি, সকল মতের প্রতিই বিশ্বাসের হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে।

অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

যাঁহারা মানব-মন হইতে এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাস উঠাইতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই মতে মানবের কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া উচিত; তাঁহাদের সকলেই স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ও স্বার্থপরগণকে নিতান্ত ঘৃণা করেন; তাঁহাদের সকলেরই মতে জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত—সমাজের হিতের জন্য নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। যিনি তাহা না করেন, তিনি মনুষ্য-নামেরই যোগ্য নহেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মানবত্বের সে পথ যে তাঁহারা নিজেই রোধ করিতেছেন, একথা একবারও ভাবেন না। একথা কেহ ভাবেন না, যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে প্রাকৃতিক স্বার্থপরতার দমন করিতেছিল, সে বিশ্বাস যদি তাহাদের নষ্ট হইল, তবে কি প্রকারে মানব প্রকৃতির দৃঢ় শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবে? বিশ্বাস-জাত অভ্যাসবলেই প্রবল স্বভাবের দমন হয়। সে বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া মানব স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া সংযমী হইতে অভ্যাস করিবে? যদি মনুষ্যবাক্য বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র অবিশ্বসনীয় হয়, তবে বিশ্বাসের উপযোগী এমন কি আছে যে, তাহার উপর আস্থা রাখিয়া প্রাকৃতিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মানুষ দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে পারে? বিশ্বাস করিয়াই মানব জ্ঞানী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। শাস্ত্রকারের শাস্ত্রে বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানে বিশ্বাস, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের বাক্যে বিশ্বাস, গুরুর শিক্ষায় বিশ্বাস, জ্ঞানীর উপদেশে বিশ্বাস করিয়াই মানব বুঝিতে পারে যে, পশুত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্ব স্পৃহনীয়। তাই লোভনীয় পশুত্বের দমন ও কষ্টকর মনুষ্যত্বের পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা করে। ধর্ম্মশাস্ত্রের কল্যাণেই ঐ সকলের প্রতি লোকের বিশ্বাস জন্মে; নচেৎ স্বার্থপর মানুষের কথা স্বার্থপর মানুষ কখনই বিশ্বাস করিত না। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণেরা জানেন, মিথ্যা কহিলে, পরের অনিষ্ট করিলে নিজেকেই দুঃখ পাইতে হয়; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণেরা নিজের মঙ্গলের জন্যই বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারেন না।

প্রাকৃতিক স্বার্থপরতাই ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণকে পরহিতৈষী করে। তাই লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণের বাক্যে বিশ্বাস করে। যতক্ষণ জানিতে পারে, এ ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, ততক্ষণ সকলে তাঁহাকে বিশ্বাস করে ও তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ হিতকর মনে করে। যখন বিশ্বাস জন্মে, এ ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ নহেন, তখন হইতে আর তাঁহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না। ধর্ম্মহীন মনুষ্য ও পশুতে যখন কিছুমাত্র ভেদ নাই, স্বার্থসাধনই যখন তাহাদের উদ্দেশ্য, তখন স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে তাহারা যে প্রবঞ্চনা করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? অধিক কি, এইজন্য অধর্ম্মপরায়ণ পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রকেও যখন কেহ বিশ্বাস করে না, তখন পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতিকে বিশ্বাস করিবে কেন? কাযেই ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসমাত্রেরই লোপ হইয়া থাকে।

যাঁহারা এই বিশ্বাস ভঙ্গ করিতেছেন, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে কি দিতেছেন যে, তাহার অবলম্বনে মানুষ জ্ঞানী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে বা তত্তদবলম্বনে বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহাদের মতাবলম্বী হওয়াই কর্ত্তব্য। তাঁহারা কি জানেন না, বিশ্বাস ভঙ্গ করা যত সহজ, বিশ্বাস উৎপাদন তত সহজ নহে? যাঁহারা চিরাবলম্বিত পৈতৃক ধর্ম্মে অবিশ্বাস জন্মাইয়া ধর্ম্মান্তরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার এমন কি পথ দেখাইয়া দিতে পারেন যে, তাহাতে সংশয়বানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে? যদি আমার চিরাবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা হইতে পারে, তবে তোমার অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা না হইবার এমন কি উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পার যে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস জন্মিবে? সেরূপ বুঝাইয়া দিবার উপযোগী কিছু উপায় আছে কি? কিছুই না। বিশ্বাস না করিলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সত্যতা প্রমাণ হয় না। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস ভঙ্গই করিলেন, কোন অবলম্বন ত দিলেন না! ঐরূপে যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রেরই প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, তাঁহারা তাহার পরিবর্ত্তে

এমন কি অবলম্বন দেন যে, তাহার উপর নিশ্চয়ই বিশ্বাস জন্মিতে পারে, কোন সংশয়েরই কারণ থাকে না। মনুষ্যকৃত বলিয়া যখন ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বসনীয় নয়, তখন তোমার বিজ্ঞান-দর্শনাদির কথাতেই বা বিশ্বাস জন্মিবে কেন? বিজ্ঞান-দর্শনাদির মতও ত মনুষ্যের মত। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনুষ্য অবিশ্বসনীয় হইতে পারে, আর বিজ্ঞানদর্শনকার মনুষ্য অবিশ্বসনীয় হইতে পারে না, এ কথার অর্থ কি? আর কাহার কথাতেই বা বিশ্বাস করিবে? ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাস্তিকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আস্তিকগণের ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর নাই; কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর থাকিলেও তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন নাই, তাঁহার কৃত নিয়মাবলম্বনে চলিলেই কর্ত্তব্য করা হয়। কেহ বলেন পরকালের ইষ্টানিষ্ট ভাবিয়া কার্য্য করিতে হয়। কেহ বলেন ইহকালের সুখই সর্ব্বস্ব, পরকাল মিথ্যা; পরকাল থাকিলেও ইহকালের মঙ্গলামঙ্গলের উপরই পরকালের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। কেহ বলেন ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ কর্ত্তব্য; কেহ বলেন স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ কর্ত্তব্য নয়। কেহ বলেন দান করা উচিত; কেহ বলেন দরিদ্রগণকে দান করিলে লোকের আলস্য বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সমাজোন্নতির পথ রোধ হয়। কেহ বলেন ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য; কেহ বলেন প্রতিশোধস্পৃহা বলবতী না হইলে উন্নতি হয় না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত। কাহার কথা সত্য মনে করিয়া তদবলম্বনে মানবত্বের অনুশীলন করিবে?

যুক্তির আশ্রয়ে কর্ত্তব্য স্থির হয় না।

যদি বল জ্ঞানমার্গের ও যুক্তিমার্গের আশ্রয়ে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু কয়জন যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারেন? পৃথিবীর পোনের আনা তিন পাই লোক যে মূর্খ, যুক্তির মর্ম্মই যে তাহারা বুঝিতে পারে না; কি প্রকারে তাহারা যুক্তির আশ্রয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিবে? বিশ্বাসপরায়ণ

হইয়াই যে তাহারা কর্ত্তব্যনিরত হয়। আবার ধর্ম্মশাস্ত্র যদি মিথ্যা হয়, তবে যুক্তির মূলভিত্তি কিসের উপর স্থাপিত হইবে? কোনও অলৌকিক বা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের উপর ভিত্তি স্থাপন না করিয়া কি কোনও যুক্তির প্রয়োগ হইতে পারে? না অসার ভিত্তির উপর স্থাপিত যুক্তির অনুমোদিত জ্ঞান সত্য হইতে পারে? কখনই না। দার্শনিকেরা ঈশ্বর ও পরকালের সত্তা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি-তর্কের আশ্রয় লয়েন, তাহার মূলভিত্তি ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে যে কতকগুলি সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই সংস্কারগুলিকে তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানে মূলভিত্তি করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকায় ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল বিষয়ে জ্ঞান জন্মিয়াছে। তাই সেই পরিজ্ঞাত বিষয়ের অস্তিত্ব যে অসম্ভব নহে, তাহাই দার্শনিকেরা শাস্ত্রসম্মত নানা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। তথাপি সকলে একমত হইতে পারেন না। কোন দার্শনিক ধর্ম্মশাস্ত্র, ঈশ্বর ও পরকালাদির সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছেন, কেহ বা বিপরীত সপ্রমাণ করিতেছেন। বস্তুতঃ কেবলমাত্র যুক্তিমার্গের অবলম্বনে ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরকালতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি না হইত, যদি যোগী ভক্তগণ ঈশ্বর দেখাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে কখনই কাহারই মনে স্বতঃ ঈশ্বরজ্ঞান উদিত হইত না। এমন কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই যে, তাহার উপর মূলভিত্তি স্থাপিত করিয়া অবিসংবাদিতরূপে ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপাদি নির্ণীত হয়—অলৌকিকবিষয় লৌকিকের ন্যায় প্রমাণ হয়।

'কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, সুতরাং বিশ্বের কারণ আছে' এ যুক্তির প্রয়োগে ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ হয় না। কারণ, কারণ ভিন্ন যে কার্য্য হয় না, এ কথার প্রমাণ কৈ? নিয়তই ত বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে। পথে যাইতে যাইতে কেহ ধন কুড়াইয়া পান, কেহ জন্মলাভ-মাত্রেই অতুল ধনের অধীশ্বর হয়েন। এরূপ ধনলাভের কারণ পথভ্রমণ না

জন্মগ্রহণ হইতে পারে না। কারণ, লক্ষ লক্ষ লোকে পথভ্রমণ ও জন্মগ্রহণ করিতেছে, সকলের ত ধনলাভ হয় না। প্রত্যুত কেহ পথভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হয়েন ও কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পড়েন। এইরূপে অনেক কার্য্যেরই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া কারণবাদিগণ কেহ অদৃষ্টকে, কেহ ঘটনাবলীর সমাবেশের ইতরবিশেষকে কারণ বলিয়া গোঁজা মিল করিয়া দেন। কারণবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারাই ঐরূপ বুঝাইয়া দেন; কিন্তু কারণবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তাঁহারা সে সকল যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিবেন কেন? সুতরাং ঐ যুক্তির অনুসরণে ঈশ্বরের সত্ত্বা সপ্রমাণ হয় না। যদিও স্বীকার করা যায় যে, কারণানুসন্ধান মানবের স্বাভাবিক, তাহা হইলে ঈশ্বরেরও কারণানুসন্ধান আবশ্যক হইবে। সুতরাং যুক্তিমার্গের অনুসরণে—কারণবাদের প্রয়োগে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না, অনবস্থা দোষ ঘটে; অথবা বিশ্ব অনাদি অনন্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়; সঙ্গে সঙ্গে 'যাহার উৎপত্তি নাই, তাহার উৎপাদকও থাকিতে পারে না' এই যুক্তির আশ্রয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর অসিদ্ধ হয়েন। (মানবতত্ত্বে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।) ফলতঃ কেবল যুক্তির আশ্রয়ে ঈশ্বরসত্তা সপ্রমাণ হয় না; যুক্তিবলে বড় জোর ইহাই সপ্রমাণ হইতে পারে যে, আমরা যখন স্বয়ম্ভূ নই, তখন নিশ্চয়ই কোন এক শক্তির বলে আমরা উদ্ভূত। সেই শক্তিই ঈশ্বরপদবাচ্য। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার শক্তি, তাঁহার কর্ম্ম ও তাঁহার কৃত নিয়মাবলীর বিষয় কিছুই আমরা জানিতে পারি না। তিনি দয়াদি গুণসম্পন্ন কি না, পক্ষপাতাদি-দোষবর্জ্জিত কি না, ইহকালের কৃতকার্য্যের ফল পরকালে দেন কি না, তাঁহার নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় কি না, এ সকল জানিতে পারা যায় এমন কোন প্রমাণ বা কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। তাই শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রবিরোধী যুক্তিকে যুক্তি বলেন না।

যদিও স্বীকার করা যায় যে, যুক্তির অবলম্বনে কোনও রূপে পণ্ডিত-গণের ঈশ্বর ও পরকালের সত্তা বিষয়ে কিছু জ্ঞান জন্মিতে পারে, তাহা হইলেও কোন কার্য্য পরকালের মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য পরকালের অমঙ্গলজনক, তাহা বুঝিবার উপযোগী কিছু পাওয়া যায় না। পরকাল যখন কেহ দেখেন নাই, কোন্ কার্য্য করিয়া পরকালে কে কিরূপ ফল পাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে যখন কাহারও প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নাই, নিজে একবার পরকালে এই সকল পাপপুণ্যের ফলভোগ করিয়া আসিয়াছি এরূপ কথা যখন কেহ বলিতে পারেন না, তখন অপৌরুষেয় বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া লোকে কিপ্রকারে বলিবে এই কার্য্য করিলে পরকালে অমঙ্গল হইবে ও এই কার্য্য করিলে পরকালে মঙ্গল হইবে? কোন্ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ইহার পোষকতা করিবে? তুমি যত জ্ঞানীই হও, যত তর্ক যুক্তি দ্বারা তোমার মতের সমর্থন কর, কোন্ কার্য্যের পরকালে কিরূপ ফল তাহা তুমি কখনই যুক্তি দ্বারা বুঝিতে ও বুঝাইয়া দিতে পারিবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না, যাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর আত্মা আর দেহ পরিগ্রহ করে না, নিরাকার ভাবে অবস্থিতি করে, তাঁহারা কিপ্রকারে বুঝিবেন ইহকালের জীবাব-স্থিতির জন্য যে সকল কার্য্য প্রয়োজনীয়, পরকালের নিরাকার আত্মার স্থিতির জন্য সেই সকল কার্য্যই প্রয়োজনীয়। অতএব লোকে যদি বিশ্বাসহীন হয়, তাহা হইলে কেবল যুক্তির আশ্রয়ে কখনই তাহারা ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ হইয়া বা পরকালের সুখের আশায় কোনও স্বার্থ বিসর্জ্জন করিবে না। তাহা যদি না হইল, তবে মানব স্বার্থত্যাগী হইবে কেন? কেন মানুষ, আপনাকে বিপন্ন ও দুঃখান্বিত করিবে? কেন লোকে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের হিতসাধন করিবে? কেন লোকে মুখের গ্রাস দিয়া ক্ষুধার্ত্তের প্রাণ রক্ষা করিবে? কেন ভবিষ্যতে স্ত্রীর কষ্ট হইবে মনে করিয়া বৃদ্ধ বিবাহসুখে বঞ্চিত থাকিবে?

কেন লোকে কষ্ট করিয়া পুত্রাদির জন্য অর্থ রাখিবে? পুত্রই বা কেন বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার কষ্ট গ্রহণ করিবে? মনুষ্য ভিন্ন কোন্ জীব এরূপ করিয়া থাকে? কিসে বুঝিবে আত্মবঞ্চনা করিয়া বা নিজের ভোগসুখের কিঞ্চিন্মাত্রও অল্পতা করিয়া পরের হিত সাধন করা মানবের কর্ত্তব্য? সুখই যখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন কিসের বিনিময়ে, কোন্ প্রত্যাশায়, কি লোভে, কি ভয়ে, কোন্ অনুরাগের ভরে সেই সর্ব্বস্বধন সুখের অল্পতা করিবে?

যদি ধৰ্ম্মশাস্ত্র মানবপ্রণীত. বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে, তবে অহিং-সাদির পরবশ হওয়া যে কর্ত্তব্য, তাহা লোকে জানিবে কি প্রকারে? কোন্ ভিত্তিহীন যুক্তির বলে বুঝিতে পারা যায় আপনার অনিষ্ট করি-য়াও সত্য বলা ও পরের হিত সাধন করা উচিত? কোন্ ভিত্তিহীন যুক্তির বলে বুঝা যায় পরস্ত্রী ও পরধন অপহরণ করা অনুচিত? কোন্ ভিত্তিহীন যুক্তির বলে বুঝা যায় পিতা মাতা প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা এবং সতত তাঁহাদের সেবা ও আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য? ধৰ্ম্মশাস্ত্রমতেই মিথ্যা কহা, পরের অনিষ্ট করা প্রভৃতি অনুচিত এবং সকলকে আপনার ন্যায় দেখা, নিকৃষ্ট বৃত্তির দমন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করা প্রভৃতি উচিত। তাই লোকে সত্য এবং পরহিতের অনুরোধে স্বার্থের হানি করে এবং ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে বশীভূত করে। যদি ধৰ্ম্মশাস্ত্র স্বার্থপরের কপোলকল্পিত ও মোহজনক হয়, তবে ধৰ্ম্ম-শাস্ত্রের ঐ সকল আজ্ঞা কেন পালনীয় হইবে? বড় বড় পণ্ডিত-গণ এপর্য্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্ব ও কর্ত্তব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কত আলোচনা করি-য়াছেন, কত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফল কি হই-য়াছে? মানবের কর্ত্তব্য কি, তাহা কি স্পষ্ট করিয়া কেহ দেখাইতে পারিয়াছেন? না এমন কোন পথ কেহ দেখাইয়াছেন যে, সে পথের অনুসরণ করিলে মানব আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবে?

তাহা ত পারেনই নাই, অধিকন্তু বিপরীতই স্থির করিয়াছেন। ঈশ্বর-তত্ত্ব স্থির করা যে মানুষের সাধ্যাতীত, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি ও প্রমাণতত্ত্বের শেষে সমস্তই অন্ধকার! মূল অনুসন্ধান কেহই করিতে পারেন নাই।

এরূপ তত্ত্বজ্ঞানে আমাদের লাভ কি? কিছু পাইলাম না, যাহা ছিল তাহাই হারাইলাম মাত্র। যাহা ছিল, তাহা কাণাকড়ি হইলেও কিছু সম্বল ত বটে! সেটুকু ফেলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যদি কিছু পাই, তাহা হইলে তাহার মূল্য আরও কিছু কম হইলেও মনে করিতে পারি যে, কিছু পাইলাম। কিন্তু কৈ? সে কাণাকড়ির পরি-বর্ত্তে ত কিছুই পাইলাম না। কোন্ সম্বল লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব? কিসের সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করিব? স্বীকার করি-লাম, ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগকে যে পথ দেখাইয়া দিতেছে, সে পথ সম্পূর্ণ সরল নহে, জটিল। সেপথে কাঁটা খোঁচাও আছে। কিন্তু সে পথে গেলে যদি আমরা ঈপ্সিত স্থানে যাইতে পারি, মনের সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, পরস্পর মিলিত হইয়া বাস করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য ত সাধিত হইল; না হয় একটু কম উন্নতি হইল—রাজ্যেশ্বর না হইয়া গৃহস্থ হইয়াই থাকিলাম। কিন্তু যাঁহারা বলিতেছেন ধর্ম্মশাস্ত্রের পথ প্রশস্ত নয়, তাঁহারা যে পথ দেখাইয়া দেন, তাহা যে সহজ ও সুপ্রশস্ত এবং সে পথে গেলে যে ঈপ্সিত লাভ হইবে, মানবনাম সার্থক হইবে, সংসার সুখের হইবে, তাহার প্রমাণ কি? মানবকে যে স্বার্থ ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থসাধনরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে, তাহার হেতু তাঁহারা কি দেখাইয়া থাকেন? তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা কি সকলের হৃদয়ে স্থান পায়? যদি যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে না পারে, তবে ঈশ্বরপ্রণীত নয় বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র যথন বিশ্বসনীয়

নয়, তখন তোমার আমার কথা বিশ্বাস করিয়া নিয়মানুবর্ত্তী হইবে কি প্রকারে? বস্তুতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বসনীয় না হইলে কোন মানুষ-কেই মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না; মানুষের চিন্তাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কোন তত্ত্বকথাই হিতকর মনে করিতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্রই মানুষকে আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রতিবেশী প্রভৃতির সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে ও পরস্পরের হিতাভিলাষী করি-য়াছে; তাই পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করে ও পরস্পরের স্বার্থকে পরস্পরের স্বার্থ মনে করে; তাই সকলে কর্ত্তব্যের পরতন্ত্র হইয়া পর-স্পর মিলিত হইয়া বিশ্বস্তভাবে পরস্পরের অভাব নিরাকরণের চেষ্টা করে, বলবান্ দুর্ব্বলের রক্ষা বিধান করে। ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুযায়ী কর্ত্ত-ব্যের পরতন্ত্র হইয়াই লোকে অন্নহীনের অন্নদান, রোগীর চিকিৎসা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করে। ধর্ম্মশাস্ত্র পরা-য়ণ হইয়াই লোকে জানে ঈশ্বর আমাদের সকলেরই পিতা, মানবগণ তাঁহার পুত্রস্বরূপ সুতরাং ভ্রাতা; তাই ঈশ্বরপ্রীতির জন্য পরস্পর পরস্পরের হিতচেষ্টা করে। ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস করিয়াই লোকে জানে আমাদের অস্তিত্ব ক্ষণিক নহে, অনন্তকাল আমাদের স্থিতি; এবং যেমন বাল্যশিক্ষার ফলে যৌবনের হিত সাধিত হয়, যৌবনের সংযমের ফলে বার্দ্ধক্যে সুখী হওয়া যায়, সেইরূপ ইহজীবনের কর্ম্মফলে পরকালে সুখ পাওয়া যায়; সুতরাং ইহকালের সুখই আমাদের মুখ্য প্রার্থ-নীয় নহে; অনন্ত পরকালের সুখের চেষ্টাই প্রকৃত স্বার্থচেষ্টা। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকায় লোকের ঈশ্বরপ্রীতি জন্মে ও সেই প্রীতির পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবায় মনো-নিবেশ করে; সেই বিমলানন্দের তুলনায় সকলপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; ঈশ্বরের সঙ্গলাভের জন্য সকল স্বার্থই বিসর্জ্জন দেয়। যদি ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিত, তাহা হইলে মুক্তিমাত্রের

থলে এ সকলের কিছুমাত্রই মানব জানিতে পারিত না, সুতরাং এ সকলের পরতন্ত্র হইত না, পশুর ন্যায় প্রকৃতিমাত্রের পরবশ হইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদির পরতন্ত্র হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়েরই দাসত্ব করিয়া বিচরণ করিত। অতএব যদি ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা বলিয়া সকল মানব তাহার অবলম্বন ত্যাগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানব পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন হইবে; পাশবস্বার্থ-সাধনই মানবের মুখ্য কার্য্য হইবে। কর্ত্তব্যাচারী বলিয়া কেহ প্রশংসিত ও অকর্ত্তব্যাচারী বলিয়া কেহ নিন্দিতও হইবে না; যে সকল গৌরবে মানব গৌরবান্বিত, সে সকল গৌরব আর মানবের থাকিবে না। কোন সম্প্রদায়ের কথা, কোন বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের কথা, কোন পণ্ডিতের কথা, কোন গুরুজনের ও পিত্রাদির কথা, কোন প্রণয়াস্পদ বন্ধুর বা স্ত্রী স্বামীর কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। অতএব যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া, মানবীয় গুণসম্পন্ন হওয়া, মানবের আবশ্যক হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক; ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ করিলে কখনই তাহা হইবে না। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস নষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জগতের সমূহ অনিষ্ট করিতেছেন।

সত্য বটে, ধর্ম্মশাস্ত্র কখন কখন সমূহ অনিষ্টের কারণ হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশাস্ত্রে অযথা বিশ্বাস থাকায় লোকে এমন কুসংস্কারসম্পন্ন হয় যে, তাহাতে জগতের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হয়। সেই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সত্য সকলকেও ভ্রান্ত মনে করে ও ভিন্নধর্ম্মপরায়ণ ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মদ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়া পরস্পরের এমন অনিষ্ট করে, এমন পৈশাচিক অত্যাচার করে যে, মনে করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। আধুনিক শিক্ষিতগণ ঐ সকল অনিষ্ট দেখিয়াই যে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাস উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, এ কথাও সত্য। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাসী অজ্ঞ-

জনগণ দ্বারা যে অনিষ্ট হয়, ধর্ম্মহীন সমাজের তুলনায় সে অনিষ্ট অনিষ্টই নহে। কেননা ধর্ম্মদ্বন্দ্ব জন্য অনিষ্ট সকল সময়ে হয় না; সমাজবিশেষের সহিত যখন সমাজবিশেষের সংঘর্ষ হয়, তখনই মাত্র হয়। যখন সমাজবিশেষ কোন কারণে দুর্ব্বল হয়, তখনই প্রবল সমাজ ঐরূপ অত্যাচার করিতে পারে। এরূপ ঘটনা অল্পই হয়; সুতরাং তাহাতে মানবজাতির তত অনিষ্ট হয় না। কালে যখন সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বশ্রেণীর জনগণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েরই পরতন্ত্র হইবে, তখন আর এ সকল অনিষ্ট থাকিবেও না। প্রত্যুত তখন মানব দেবতায় পরিণত হইবে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাস না থাকিলে স্বস্বসমাজের মধ্যেই—নিতান্ত আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই নিয়ত সঙ্ঘর্ষ হইতে থাকে। যে পৈশাচিক ব্যাপার ক্বচিৎ সমাজবিশেষের সহিত হইতেছে, সেই পৈশাচিক ব্যাপার নিয়তই প্রতি ঘরে ঘরে হইতে থাকিবে। কোনও অবস্থায় বা কোনও কালে তাহার শান্তি হইবে না। মানবস্থান পশুভূমি অরণ্যে পরিণত হইবে।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক শিক্ষিতগণ এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির অনুসরণ করিলেই মানব প্রকৃতি বশতই কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে। তাঁহারা বলেন ধর্ম্মশাস্ত্র মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করে না, করিতে পারেও না; প্রত্যুত অন্ধ করে। তাঁহাদের বিশ্বাস ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাস তিরোহিত হইলে জ্ঞানাঞ্জনে মানবের চক্ষু পরিস্ফুট হইবে, তখন সকলে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত মানবীয় কর্ত্তব্য করিবে,—জগতের প্রকৃত উন্নতি হইবে। নানা জনে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এই মতের সমর্থনের চেষ্টা করেন। একে একে সে সকলের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাঁহাদের এ সকল কথা সত্য কি না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন পরস্পরের স্বার্থই পরস্পরকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করে। পশ্বাদি ইতর প্রাণীর স্বার্থ ও মানুষের স্বার্থ একরূপ নহে। মনুষ্য সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ না হইয়া পশ্বাদির ন্যায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিলে মনুষ্য রক্ষিত হয় না; সমাজবদ্ধ হইয়া যত পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিবে, ততই মানব সুখী হইবে। তাই ঈশ্বর মানবহৃদয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিবার উপযোগী পরার্থপরতা দিয়াছেন। সেই প্রাকৃতিক পরার্থপরায়ণবৃত্তিগুলির বশীভূত হইয়া মানব স্বতঃ কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। যে বুদ্ধিপ্রভাবে মানব সর্ব্বজীব-শ্রেষ্ঠ, সেই বুদ্ধিপ্রভাবেই মানব কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়। বুদ্ধি-প্রভাবেই বুঝিতে পারে কখন্ স্বার্থসাধন ও কখন্ পরার্থসাধন করিলে হিত হয়। বুদ্ধিপ্রভাবেই বুঝিতে পারে আপনার হিতসাধন করিতে হইলে অবস্থাবিশেষে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা কমাইতে হয় ও পরের হিতসাধন করিতে হয়। সত্য কথা না বলিলে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস না করিলে কোনও কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না; এই প্রয়োজন জন্যই সদা সত্য কহা উচিত। একজন পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেও তাহার দ্রব্য লইতে পারে, এই অনিষ্ট নিবারণ জন্যই পরদ্রব্য অপহরণ করা উচিত নয়। অনেক লোক পরোপকারীর বশীভূত হয়, অধিক লোক বশীভূত থাকিলে অনেক সময়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়; অনেকের অনিষ্ট করিলে অনেক লোক শত্রু হয়,

সুতরাং নিয়ত শত্রুর ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয়। এইরূপে স্বার্থসাধনের সুবিধার জন্যই মানব পরার্থপর হয়; পরস্পরের কার্য্য সৌকর্য্যার্থেই সত্য, অস্তেয়, অহিংসা, দম প্রভৃতির পরতন্ত্র হয়। যেমন অধিক ভোজন ও অধিক রাত্রিজাগরণ করিলে পীড়া হয় বুঝিতে পারিয়া লোকে অধিক ভোজনাদির সুখ ত্যাগ করে, সেইরূপ পরের অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ও পরের সাহায্য পাইবার আশায় লোকে পরানিষ্ট দ্বারা স্বার্থসাধন ত্যাগ করে। তাহার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সহায়তার কোন প্রয়োজনই হয় না। প্রত্যুত ভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তখন মানব আরও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে।

কার্য্যফল দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না।

সত্য বটে, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ফলে ইহকালীন সুখ ও অকর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ফলে ইহকালীন দুঃখ হয়, এবং তাহা বুঝিতে পারিলে ঈশ্বর ও পরকালাদির ভয় না থাকিলেও ইহকালের দুঃখের ভয়ে ও সুখের আশাতেই মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির অনন্তলীলা বলিয়াই হউক, মনুষ্যশক্তির বৈচিত্র্য বশতই হউক, ঘটনাপরম্পরার ভিন্ন ভাবে সম্মিলন নিমিত্তই হউক বা ঈশ্বরের ইচ্ছা জন্যই হউক, কোনও কার্য্যের ফল সর্ব্বত্র সমান হয় না। বর্ষে বর্ষে শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা হইলেও কোনও বৎসর শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অতিশয় অধিক হয় ও কোন বর্ষে বা নিতান্ত অল্প হয়। কোনও বৎসর ধরিত্রী শস্যভারে জনগণের আনন্দদায়িনী হয়েন, কোনও বৎসর দুর্ভিক্ষপীড়িত মনুষ্য-কঙ্কালমালা পরিধান করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রবল বাত্যা, বন্যা, ভূকম্পাদি মহামারী প্রভৃতিতে কোনও দেশ এককালে উৎসন্ন যায়; স্বর্ণ, হীরক প্রভৃতির খনি উৎপন্ন হইয়া কোনও দেশ প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হয়। এই সকল দেখিয়া কি লোকে মনে করিতে পারে কেবল

মনুষ্যকৃতকার্য্যের ফলেই সমস্ত শুভাশুভ ঘটে? প্রবল পরাক্রান্ত গ্রীস রোমাদির পতন ও ক্ষুদ্র শীর্ণকায় জাপানের উত্থান যে কেবল মানুষেরই কার্য্যদোষে ও কার্য্যগুণে হইয়াছে—দৈবের ইহাতে কোনও হাত নাই এ বিশ্বাস কি সকলের হয়? কথনই না। ঐরূপ যখন দেখা যাইতেছে যাহারা অধিক পানভোজন ও ইন্দ্রিয়াদির অত্যধিক পরিচালনা করে, তাহাদের মধ্যে কেহ ভয়ানক রোগযন্ত্রণা ভোগ করে ও কেহ পরিমিতাচারীদের অপেক্ষাও সুস্থশরীরে থাকে; যাহারা মিতাচারী, তাহাদের মধ্যে অনেকে সুস্থ থাকে আবার অনেকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগও করে; যাহারা মিথ্যা বলে ও পরের অনিষ্টাদি করে, তাহাদের কেহ কেহ অশেষ দুঃখ ভোগ করে, কেহ কেহ বা অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ও জনসাধারণের প্রিয় হইয়া সুখ ভোগ করে; এবং সত্যবাদী ও পরহিতকারিগণের মধ্যেও কেহ কেহ সুখী হয় ও কেহ কেহ অতিশয় দুঃখ ভোগ করে, তথন কিপ্রকারে জনসাধারণের বিশ্বাস হইবে মনুষ্য আত্মকৃত কার্য্যবিশেষের ফলে ঐরূপ সুখী বা দুঃখী হয়, দৈবের উহাতে কোনও হাত নাই? যথন একইপ্রকার কার্য্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে ও একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্নপ্রকার ফল লাভ করে, তথন কোন্ কার্য্যের কোন্ ফল, তাহা বুঝিবে কি প্রকারে?

প্রকৃতিবশতঃ যাঁহার শরীর ভাল, অবস্থা ভাল, তিনি শত অপকর্ম্ম করিয়াও যখন সুস্থ থাকেন, এবং যাঁহার শরীর ও অবস্থাদি সেরূপ নহে, তিনি বিলক্ষণ সংযমী হইয়াও যখন দুঃখ পান, তখন কেন না বুঝিবে সুখদুঃখ মনুষ্যকৃত কার্য্যজন্য নহে, বিধিনির্দ্দিষ্ট অদৃষ্টজন্য বা বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির ক্রিয়াবিশেষের ফল? বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াদির পরবশ হইলে বা পরের অনিষ্ট করিলে নিশ্চয়ই নিজের অনিষ্ট হয়, এবং ইন্দ্রিয়াদির দমন করিলে বা পরের ভাল করিলে নিশ্চয়ই নিজের ভাল হয়, কার্য্যফল দেখিয়া এ বিশ্বাস জন্মিতেই পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্র মানবমনে এই সকল

সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই লোকে মনে করে এই সকল কার্য্যের ফলে স্বার্থহানি ও স্বার্থরক্ষা হয়; যাহার যেমন সংস্কার, সে সেই সংস্কার-অনুরূপ কার্য্যফলে বিশ্বাস করে। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণের অবমাননায় মহানিষ্ট হয়, এই সংস্কার বশতই হিন্দু ব্রাহ্মণের অবমাননার কুফল অনেক সময়েই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; অন্যে কিন্তু বিপরীতই দেখে। ঐরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণই মিথ্যাদি পাপের কুফল প্রত্যক্ষ করেন; নাস্তিক বিপরীত দেখেন। অথচ নাস্তিকগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলেও জন্মপ্রকৃতি ও বাল্যাভ্যাসের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রসংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তথাপি যখন তাঁহারা এরূপ বিশ্বাসহীন হইয়াছেন, তখন এককালে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাস উঠিয়া গেলে ও ধর্ম্মশাস্ত্রজাত সংস্কার মুছিয়া গেলে আর এসকল সংস্কার কিছুমাত্র থাকিবে না। তখন কাহারও মনে হইবে না যে, মিথ্যা বলিয়াছি কি চুরি করিয়াছি বলিয়া আমার এরূপ দুর্গতি হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির পরবশ হইলে বা পরের অনিষ্ট করিলে নিজের মন্দ হইবে এ বিশ্বাসই জন্মিবে না, এ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ অকার্য্য ত্যাগও করিবে না। অলৌকিক বাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে এমন কি উপায় আছে যে, তদবলম্বনে লোকে বুঝিতে পারে, নিজের সুখের জন্য ইন্দ্রিয়রিপুর দমন ও পরার্থসাধনরূপ কর্ত্তব্যবিশেষের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। অলৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন এমন অকাট্য প্রমাণ মানুষ কোথায় পাইবে?

প্রতিশোধভয়ে বা উপকারের আশায় কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না।

আমি একজনের অনিষ্ট করিলে সে যে আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে, একথা ত ঠিক নয়। আমার মত যাহার শক্তি সুযোগ নাই, সে আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে কি প্রকারে? কত ধনবান্ কত দরিদ্রের ধন অপহরণ করিতেছেন, কত লোকের স্ত্রীর সতীত্বনাশ করিতেছেন, কতরূপ অত্যাচার করিতেছেন, কয়জনে তাহার প্রতিশোধ দিতে পারে? যাঁহার

শক্তি সুযোগ আছে, তিনি শত শত লোকের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন। যাহারা সেই অত্যাচারে উৎপীড়িত, তাহাদের কয়জনে তাহার প্রতিশোধ দিতে পারে? তবে কোন্ ভয়ে শক্তি-সুযোগসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন? প্রতিশোধের ভয়ে এইমাত্র হইতে পারে যে, লোকে অবস্থা বুঝিয়া অকার্য্য করিবে;—কেহ দস্যু হইবে, কেহ তস্কর হইবে। হইতেছেও তাই। যাহারা অক্ষম, তাহারা চোর হইতেছে—গোপনে পরানিষ্ট করিতেছে; এবং যাহারা শক্তিসম্পন্ন, তাহারা দস্যু হইতেছে—প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার করিতেছে। তাই বুদ্ধিমান্ অক্ষমের নীতি এই যে "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা", এবং বুদ্ধিমান্ শক্তিশালীর নীতি এই যে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যভাবে শক্তিসম্পন্নের অনিষ্ট চেষ্টা করেন না; যাহার প্রতিশোধ দিবার শক্তি নাই, তাহারই অনিষ্ট করিয়া থাকেন। ভূম্যধিকারী দরিদ্র প্রজার যেরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করেন, সমধিক শক্তিসম্পন্ন আর একজন ভূম্যধিকারীর সেরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করেন না। রুষ তুরস্কের যেরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করেন, ইংরাজের অনিষ্ট করিতে সেরূপ সাহস করেন না। যদি কেহ প্রবলের অনিষ্ট চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা গোপনেই করেন; প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করেন না। অতএব এক জনের অনিষ্ট করিলে সে তাহার প্রতিশোধ দিবে এই ভয়ে কেহ পরের অনিষ্ট করিতে বিরত হয় না; প্রত্যুত যাহাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি এককালে শক্তিশূন্য হয়—প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা না করিতে পারে, তাহারই জন্য উত্তরোত্তর অধিক অত্যাচার করিয়া থাকে। যে রাজা পররাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া অধিবাসিগণকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন, তিনি এমন ভাবে অধীন জাতির শাসন করেন যেন কোন মতেই মস্তকোত্তোলন করিতে না পারে। তাই এমন উন্নত ও সভ্যের অগ্রগণ্য ভারত, গ্রীস, রোম, সহস্র বৎসর অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়াও, স্বাধীনতা-অপহারীদের প্রতি-

শোধ গ্রহণ দূরে থাকুক, আপনাদের স্বাধীনতাই পূর্ণগ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং প্রতিশোধের ভয়ে মানব কর্ত্তব্যরত হয় না।

যে ব্যক্তি কখনও কাহারও অনিষ্ট কি কোনরূপ প্রতারণা করে নাই, তাহার যদি কেহ অনিষ্ট না করিত, তাহা হইলেও ভাবী অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার আশায় লোকে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যাহারা কখনও কাহারও অনিষ্ট করে নাই, কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করে নাই, নিয়তই প্রবলেরা সেই নিরীহ লোকের উপর নানা অত্যাচার করিতেছেন ; এবং যাহারা নিয়তই অন্যায় কার্য্য করিতেছে, কেহ তাহাদের কেশস্পর্শও করেন না। ভারতবাসী কোন্ দেশের অনিষ্ট করিয়াছিল ? কোন্ জাতি ভারতের অনিষ্ট করে নাই ? যাঁহারা বলেন মধ্য-এসিয়া হইতে আসিয়া আর্য্যগণ ভারতে আপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার কোনও প্রমাণ নাই। যদিও সত্য বলিয়া সে কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও ভারতের আদিমবাসিগণ মধ্য-এসিয়াস্থ আর্য্যগণের কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন যে, তাই আদিম-বাসিগণ আর্য্যগণের নিকট দস্যু আখ্যা প্রাপ্ত হইল ও গৃহসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অরণ্যবাসী হইল ? সুতরাং আমি পরের অনিষ্ট না করিলে কেহ আমার অনিষ্ট করিবে না এ আশা করিয়া কেহ কর্ত্তব্যানুরাগী হইবে না।

সমাজভয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় না।

কেহ কেহ বলেন দুর্ব্বল প্রবলের অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে না পারিলেও সমাজ তাঁহার দণ্ড করে। সমাজের ভয়েই মানবকে কর্ত্তব্যানু-রাগী হইতে হইবে। কিন্তু নিয়তই ত পরস্পর পরস্পরের ক্ষতি করিতেছে, সমাজ কয়জন ক্ষতিকারকের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের রক্ষা বিধান করেন ? কতকগুলি লোক যেমন কোনও অন্যায়কারীর বিপক্ষ হয়, সেইরূপ কতকগুলি লোক তাহার পক্ষেও থাকে। অধিকাংশ

লোক কোনও পক্ষই অবলম্বন করে না। তবে কেন অত্যাচারী সমাজকে ভয় করিবে? এখনও ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাস মনুষ্যহৃদয় হইতে এককালে যায় নাই। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ, এমন কি যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহারাও বংশপরম্পরাগত শিক্ষা ও অভ্যাসজাত সংস্কার বশতঃ অজ্ঞাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক বিধি পালন করা কর্ত্তব্য মনে করেন, তথাপি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ সকলে মিলিত হইয়া অন্যায়কারীর দমনের চেষ্টা করেন না, আর যখন ধর্ম্মবিশ্বাস এককালে লোপ পাইবে, যখন ধর্ম্মশাস্ত্রজাত সংস্কার মানবহৃদয় হইতে এককালে মুছিয়া যাইবে, যখন এবংবিধ অন্যায়কারীর প্রতি লোকের অশ্রদ্ধাই থাকিবে না, তখন সমাজ তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবেন এ কথার অর্থ কি? সমাজ ত মনুষ্যেরই সমষ্টি। যে সকল মনুষ্যের সমষ্টিতে সমাজ, তাঁহারা নিজে যখন কর্ত্তব্য বুঝিবেন না, পরার্থপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য ভাবিবেন না, তখন তাঁহারা মিলিত হইয়া তাহার বিপরীত করিবেন এ কথার অর্থ কি? প্রত্যুত মিলিত হইয়া অধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া সমধিক বলেই অক্ষম ও অক্ষমসমাজের প্রতি অধিক অত্যাচারই করিবেন। যে লোকনিন্দাভয়ে এক্ষণে লোকে অনেক সময়ে অকার্য্য ত্যাগ করে, সে লোকনিন্দাভয়ও যে তখন থাকিবে না, তাহার প্রমাণ এখনই পাওয়া যাইতেছে। শাস্ত্রানুসারে যে সকল কার্য্য গর্হিত ও অকর্ত্তব্য, তাহার অনুষ্ঠানে পূর্ব্বে যেরূপ লোকে নিন্দিত ও সমাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইত, এক্ষণে আর তাহা হয় না। এক্ষণে অনেকেই অখাদ্য ভোজন করেন, অগম্যা গমন করেন, অস্পৃশ্য স্পর্শ করেন, সুরাপানে মত্ত হয়েন, পিতা মাতার শ্রাদ্ধ বারব্রত পূজাদিতে বিরত, অতিথি অভ্যাগত ও গুরু-সেবায় নিতান্ত অনিচ্ছুক, এমন কি নিত্য সন্ধ্যাহ্নিকও অনেকে করেন না; কিন্তু তাহার জন্য কয়জন লোক সমাজে নিন্দিত হয়েন? প্রত্যুত যাঁহারা এই সকল করেন, তাঁহারাই মূর্খ, গোঁড়া ও কুসংস্কারসম্পন্ন

বলিয়া ঘৃণিত হয়েন! কেননা এক্ষণে শাস্ত্রবিশ্বাসের শিথিলতা হওয়ায় অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছে এগুলি বাস্তবিকই মানবের কর্ত্তব্য নহে, স্বার্থ-পর শাস্ত্রকারগণের মোহজনক বাক্যমাত্র। এখনও সংস্কার বশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নীতি প্রকরণের প্রতি অনেকেরই বিশ্বাস আছে; তাই এখনও লোকে ইন্দ্রিয়াদির সংযমাদিকে কর্ত্তব্য ও পরানিষ্টকরণাদিকে অকর্ত্তব্য মনে করে। ঐ সংস্কার বশতই নীতির পালনে সুখ ও অপালনে দুঃখ হয় মনে করে। যখন এ সংস্কার থাকিবে না, তখন এ সকলকে অকর্ত্তব্য বলিয়া মানবের জ্ঞানই জন্মিবে না; তাহার করণ জন্য নিন্দিতও হইবে না। বস্তুতঃ ধর্ম্মবিশ্বাস লোপ হইলে, একজন অন্যের অনিষ্ট করিলে সমাজ তাহার বিরোধী হইবে বা লোকনিন্দা হইবে, এ ভয়ের কোনও কারণই থাকিবে না।

কেহ কেহ বলেন সমাজের উন্নতি না হইলে আত্মোন্নতি হয় না, সমাজের উন্নতিতে নিজের উন্নতি; যে সমাজ যত উন্নত, সে সমাজস্থ ব্যক্তি-বর্গের তত উন্নতি হয়, অতএব আত্মোন্নতির জন্য সকলেরই সমাজের উন্নতি-কল্পে আগ্রহ জন্মিবে; এবং পরস্পর নিয়মিত না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না দেখিয়া সকলেই স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবে। কিন্তু আধুনিক সভ্যসমাজের অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহাদের ইতিহাস পড়িয়া বুঝা যাইতেছে যে, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অনিষ্ট করিয়া যত সহজে আত্মোন্নতি হয়, সমাজের উন্নতি করিয়া আত্মোন্নতি করা সেরূপ সহজ নহে; এবং যে সমাজে ঐরূপ অনিষ্ট-কারীর সংখ্যা যত অধিক, সে সমাজ তত উন্নত। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের অনিষ্ট করিয়াই লোকে শক্তি ও ধনসম্পন্ন হয়। দস্যুতস্কর সমাজস্থ ব্যক্তি-বর্গের ধন অপহরণাদি করিয়া ধনী হয়। ভূস্বামী প্রজাবর্গের রক্ত শোষণ করিয়াই ধনী হয়েন। বুদ্ধিমানেরা নির্ব্বোধগণকে প্রতারিত করিয়া উন্নতি সাধন করেন। যিন যে গুণে গুণবান্, তিনি সেই গুণের প্রয়োগে অক্ষম নিঃস্বগণের অর্থ অপহরণ করিয়া আপনার উন্নতি করেন। উকিল,

ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারগণ বিপন্ন অর্থী, প্রত্যর্থী ও রোগীর নিকট হইতে যত অর্থ আকর্ষণ করেন, ততই তাঁহাদের উন্নতি হয়। শিল্পিগণ যত চাকচিক্যশালী বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করেন, ততই দেশের লোকের ধনাপ-হরণ করিয়া ধনী হয়েন। এইরূপে পরের ধন লইয়া যে সমাজে যত অধিক লোক উন্নত হয়, সে সমাজ তত অধিক উন্নত ও শক্তিশালী হয়। তখন ঐ শক্তিশালী সমাজ, যে সমাজ অত্যা-চারপ্রিয় লোকের সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন তত উন্নত নহে, সেই ভিন্ন সমাজের অনিষ্ট করিয়া আপনাদের ধন ও সুখ বৃদ্ধি করিতে থাকে যে সকল জাতি এক্ষণে এত উন্নত হইয়াছেন, যাঁহাদের উন্নতিতে এই বিংশ শতাব্দী জগতের গৌরবের কাল বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা এইরূপে পরপীড়ন করিয়াই উন্নত হইয়াছেন। ইতিহাস পড়িয়া দেখ প্রথমে তাঁহারা স্বসমাজে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াই শক্তি-শালী হইয়াছিলেন, পরে সেই শক্তিপ্রভাবে ভিন্নদেশে আপনা-দের আধিপত্য প্রচার করিয়াছেন। মুসলমানগণ ভারত অধিকার ও ভারতের ধন লুণ্ঠন করিয়াই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; আমেরিকাবাসিগণ তদ্দেশবাসী জনগণের উচ্ছেদ করিয়াই উন্নত হইয়াছেন; গ্রীস ও রোম যতদিন অন্য সমাজের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন উন্নত ছিলেন ও জগতের নানা উন্নতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইংলণ্ড, জর্ম্মাণ, ফ্রান্স ও রুষিয়াবাসিগণ নানাদেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া নানা কৌশলে নানা দেশের ধন অপহরণ করিয়া উন্নতিলাভ করিতেছেন। এইরূপে যে দিকে দৃষ্টি করিবে, দেখিতে পাইবে, যে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ বলপ্রয়োগ ও প্রতারণাকৌশল অবলম্বন করিয়া নরহত্যা ও ধনরত্ন অপহরণ প্রভৃতিরূপ অপকর্ম্ম যত অধিক করিয়াছেন, সে সমাজ তত অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন। যখন এবংবিধ অপকর্ম্মকারীর সমাজ এত উন্নতি লাভ করিয়াছে ও

সেই উন্নতিতে জগতের উন্নতি হইতেছে বলা হইতেছে, তখন মানবের অকার্য্যে অর্থাৎ পরানিষ্টকরণ-চেষ্টায় সমাজের উন্নতির ব্যাঘাত হয় এবং সমাজের উন্নতি না হইলে আত্মোন্নতি হয় না, একথা প্রমাণবিরুদ্ধ। বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যক্তিবর্গের আত্মোন্নতির উপরই সমাজের উন্নতি নির্ভর করে এবং সে আত্মোন্নতি পরের অনিষ্টের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অগ্রে ব্যক্তিগত উন্নতি, পরে সমাজের উন্নতি। সমাজের উন্নতিতে নিজের উন্নতি হয় না। তবে যখন এইরূপে স্বসমাজের উন্নতি হয়, তখন সমাজস্থ অনেক ব্যক্তি শক্তিহীন দুর্ব্বল ভিন্ন-সমাজের অনিষ্ট করিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারে। কিন্তু তাহাতেও সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি হয় না, প্রত্যুত অনেকের দুঃখের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। যে সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজে দারিদ্র্যেরও তত বৃদ্ধি হয়। ইংরাজের সমাজ পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও অধিক সমাজের অধিপতি হইয়াছেন, সেই সুযোগে ইংরাজসমাজের বহুতর লোকে বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির অবলম্বনে বহুদেশের প্রভূত ধন লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধনসম্পন্ন হইয়াছেন, তথাপি তথাকার বহুতর লোক এমন নিঃস্ব যে, প্রপীড়িত সমাজেও সেরূপ নিঃস্ব লোক দেখা যায় না।

এই সকল দেখিয়া কি প্রকারে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে সমাজের উন্নতি হইলেই সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সুখ হয়, ও সেই বিশ্বাসভরে স্বার্থত্যাগ করিয়া সমাজোন্নতির চেষ্টা করিবে? যখন উন্নত সমাজের দরিদ্রগণ বুঝিতে পারিতেছে যাহারা বল, ধন, প্রতারণা, কৌশল ইত্যাদির অবলম্বনে স্বদেশীয় ও বিদেশীয়গণের রক্ত শোষণ করিতেছে, তাহারাই উন্নতি লাভ করিতেছে; যাহারা সেরূপ পারিতেছে না বা করিতেছে না, তাহাদের অবস্থা নিতান্ত হীন; এবং যখন প্রপীড়িত সমাজ বুঝিতেছে যে, পরের প্রতি তাদৃশ অত্যাচার করে নাই বা করিতে পারে নাই

বলিয়াই তাহাদের সমাজ প্রবল সমাজের অযথা অত্যাচার সহ্য করিতেছে, তখন কেননা বিশ্বাস জন্মিবে যে, পরের অনিষ্ট না করিলে উন্নতি হয় না এবং কেনই বা বিশ্বাস না জন্মিবে যে, আত্মোন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না? তবে আর সমাজোন্নতির জন্য পরার্থপর হইবে কেন?

যদিও স্বীকার করা যায় স্বার্থসাধনবাসনায় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ সমাজের উন্নতির জন্য পরার্থপরায়ণতাদি গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহাকে মানবীয় গুণ বলা যায় না; তাহা পাশব স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ ঐ কারণে যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী হয়েন, তাঁহারা অন্যান্য সমাজের প্রভূত অনিষ্ট করেন। যদি শত শত সমাজের অনিষ্ট করিয়া সমাজবিশেষের উন্নতি করিলে পরার্থসাধন করা হয় ও তাহা মানবীয় কর্ত্তব্য হয়, তবে নিজের স্ত্রীপুত্রাদি বা পরিবারের উন্নতিবিধান জন্য শত শত পরিবারের অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে কেন? নিজের সুখসংস্রব আছে বলিয়া যদি স্ত্রীপুত্রাদির সুখের জন্য পরের অনিষ্ট করাকে স্বার্থপরতা বলে, তবে স্বার্থ-সংস্পৃষ্ট সমাজোন্নতি চেষ্টা স্বার্থপরতার কার্য্য নহে কেন? স্ত্রীপুত্রাদির সুখ যেমন নিজের সুখের জন্য আবশ্যক, প্রতিবেশী স্বজাতি ও স্বদেশ-বাসিগণের সুখও যদি সেইরূপ নিজের সুখের জন্যই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অন্য পরিবারের অনিষ্ট করিয়া আপন পরিবারের সুখবৃদ্ধির চেষ্টাও যেরূপ স্বার্থপরতার কার্য্য, অন্য সমাজের অনিষ্ট করিয়া স্বসমাজের সুখবৃদ্ধি করাও সেইরূপ স্বার্থপরতার কার্য্য। যখন আপনার সুখ-বৃদ্ধিই স্বদেশহিতৈষণার মূল উদ্দেশ্য, তখন সে স্বার্থত্যাগ স্বার্থত্যাগই নহে, স্বার্থপরতার পূর্ণ মূর্ত্তি। সেরূপ স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করিলে মানবত্ব সিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ এরূপ স্বার্থপর সমাজোন্নতিকারীরা সমাজের যেরূপ উন্নতিতে নিজের সুখসংস্রব আছে, কেবল সেইরূপ উন্নতির জন্যই কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বার্থ বলি দিবেন; যেরূপ উন্নতিতে স্বার্থের সংস্রব নাই,

যে উন্নতির ফল মৃত্যুর পরে বা বহু বিলম্বে ফলিবার সম্ভব, তাহার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও সুখবিসর্জ্জন করিবেন না। স্বার্থসাধনই যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা মনে করিবেন সেরূপ উন্নতিতে যখন আমাদের নিজের সুখের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার জন্য সুখ বিসর্জ্জন দিব কেন? ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা, এমন কি আমারই পুত্র পৌত্রেরা আমার মৃত্যুর পরে সুখী হইলে আমার লাভ কি? যাহার ফল আমি দেখিব না, যাহাতে আমার সুখের কোনও সম্ভাবনাই নাই, আমার তাহাতে লাভ কি? আমার পরে পৃথিবী থাকিলেই বা কি আর ধ্বংস হইলেই বা কি? তাহাতে যখন আমার লাভালাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ভাবী উন্নতির জন্য, কেবলমাত্র পরের সুখের জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করিব কেন? আমার মৃত্যুর পরে সমাজের কি হইবে, তাহা ভাবিবার আমার এত মাথাব্যথা কেন? এই যে রুষ-জাপান-যুদ্ধে সৈন্য ও সেনাপতিগণ নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়াও জলন্ত গোলা গুলির সম্মুখীন হইয়া প্রাণত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইতেছেন, কোন্ স্বার্থসাধন তাঁহাদের অভিপ্রেত? যদি তাঁহাদেরই মৃত্যু হইল, তবে আর্থার বন্দরের লাভ হইলে তাঁহাদের কি সুখ হইবে? ঈশ্বরে ও পরকালে যদি বিশ্বাস না থাকে, কেবল স্বার্থসাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য এই বিশ্বাস যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে কখনই লোকে এরূপে আত্মনাশ করিয়া সমাজের রক্ষাচেষ্টা করে না। এমন কি, তাহা হইলে নিতান্ত আত্মীয়স্বজনরক্ষার জন্যও কেহ আত্ম-প্রাণ আহুতি দেয় না। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে কেবল নিজের ঐহিক স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে পরের, সমাজের, মানবজাতির, বিশ্বের, কাহারই হিতসাধনে ঐকান্তিক যত্ন হইতে পারে না; স্বার্থসাধন ভিন্ন যে অন্যরূপ কর্ত্তব্য আছে এ বিশ্বাসই জন্মে না।

রাজশাসন মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন রাজা বা রাজ-শক্তিসম্পন্ন সমাজ আইন করিয়া প্রজাগণকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে বাধ্য করিবেন। কিন্তু

তাহাও হইতে পারে না। সত্য বটে, সকল দেশেই রাজা আছেন, আইন করিয়া তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন; একজন আর একজনের অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু রাজশাসনে প্রকৃত প্রস্তাবে মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না। কেননা রাজাও মানুষ, রাজারও স্বার্থ আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে স্বার্থবিরোধী কার্য্য যে কর্ত্তব্য, এ সংস্কার রাজতন্ত্রের রাজার বা প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধির হইতে পারে না। তিনি যে কোন আইন করিবেন, তাহা আপনার সুবিধা দেখিয়াই করিবেন। অন্য মনুষ্য যেমন স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে, তিনিও সেইরূপ করিবেন; এবং সমাজ মধ্যে যে সকল লোকের শক্তি অধিক, যাঁহারা মিলিত হইয়া তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারেন, তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহাদের অনুকূল, কাযে-কাযেই, অন্যের প্রতিকূল আইন করিবেন। ইংলণ্ডে যেমন ম্যানচেষ্টারের ও লর্ড সম্প্রদায়ের প্রাধান্য, সকল সমাজেই ঐরূপ কোন না কোন শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে। রাজা ও রাজ-স্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁহাদের স্বার্থসাধোনোপযোগী কার্য্য করিতে হয়। আবার এ রাজা ধর্ম্মশাস্ত্রের অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন দেবরূপী রাজা নহেন, শক্তি-সহায়-সম্পন্ন মানব রাজা। সুতরাং তাঁহার কৃত দুঃখদায়ক আইন কর্ত্তব্য জ্ঞানে সন্তোষ-সহকারে কেহ মানিতে চাহে না। রাজদণ্ড-ভয়ও সকল সময়ে থাকে না। কারণ অধিকাংশ অপরাধই রাজার গোচর হয় না, যাহা হয় তাহারও অধিকাংশের প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং অর্থসাহায্যে, সুতদ্বিরে ও উকিল বারিষ্টারের বাগ্মিতার গুণে অনেক অপকর্ম্মকারী অব্যাহতি পায়, এবং তদভাবে অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তি দণ্ড প্রাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন রাজা কিছু একা রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। সহস্র কর্ম্মচারী রাজার কর্ম্ম করেন। সেই কর্ম্মচারিবর্গ কেন আপনার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া পরের কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত থাকিবেন? নিজের চাকুরি বজায়

থাকিবার উপযোগী কার্য্য করিলেই কর্ম্মচারিগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সকলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এত দেখিবে বা কেন? দেখিতে পারিবেই বা কেন? আবার রাজা কি সমাজ লোকে সত্যবাদী হয় না কেন, ইন্দ্রিয় দমন করে না কেন, বিনয় ক্ষমাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হয় না কেন, পরের হিত-সাধন-পরায়ণ হয় না কেন ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কোন ব্যবস্থা করেন না; করিলেও তাহা অনিষ্টেরই কারণ হয়; সুতরাং রাজশাসন কিরূপে মানুষকে কর্ত্তব্যপরায়ণ. করিবে? অকর্ত্তব্য না করিলেই কি কর্ত্তব্য করা হয়? এখনও শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, পরকালের ভয় আছে ও এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে রাজ-আইন সকল প্রস্তুত হইতেছে, তথাপি এখনই যখন রাজ-আইনের এই অবস্থা, পরে যখন ধর্ম্ম-শাস্ত্রজাত সংস্কার থাকিবে না, তখন রাজশাসন যে মানবকে কিছুমাত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারিবে না, তাহাতে কি আর কথা আছে?

একজন অতি দরিদ্র, আহার জুটে না, কেহ তাহাকে বলিল যদি তুমি অমুকের প্রাণ বধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিব; সেই দরিদ্র প্রথমে অবশ্য রাজদণ্ডের ভয় করিবে, যদি কেহ জানিতে পারে তাহা হইলে তাহার প্রাণ যাইবে ভাবিবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিবে নিয়তই ত নরহত্যা হইতেছে তাহার মধ্যে কয়জনে ধৃত হয়? যেমন কেহ কেহ ধৃত হইতেছে, তেমনই কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিও নরঘাতি-রূপে প্রতিপন্ন হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। অতএব হত্যা করিয়া ধরা নাও পড়িতে পারি এবং হত্যা না করিয়াও পুলিসের চক্ষে নরঘাতক রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারি। যদি বিশেষ সাবধানতা-সহকারে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত কেহ জানিতে পারিবে না, তখন সহস্র মুদ্রা পাইলে আমি সুখে জীবন অতিবাহিত করিব। যদি একান্তই ধরা পড়ি, না হয় প্রাণ যাইবে, চিরকাল ত বাঁচিব না, একদিন ত মরিতেই হইবে, তবে সে ভয় কিসের? সামান্য বেতনের লোভে কত লোক সৈনিকের

কার্য্য করিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, আর আমি সহস্র মুদ্রার জন্যে প্রাণ দিতে পারিব না? এরূপ কষ্ট পাইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা কি মৃত্যু ভাল নয়? সুখই যদি না পাইলাম তবে বাঁচিয়া ফল কি? ধনাদির লোভে ও ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বিপজ্জনক কার্য্য কে না করে? মৃত্যু-ভয় ত সকল কার্য্যেই আছে। যাহারা সমুদ্রমধ্য হইতে মুক্তা উত্তোলন করে, নিবিড় বনে কাষ্ঠাদি আহরণ করে, দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্র-বক্ষে বাণিজ্য করে, তাহাদেরও ত নিয়ত মৃত্যু ভয় রহিয়াছে; এই সকল বাণি-জ্যাদি বৃত্তিতে মৃত্যুভয় থাকিতেও যখন তাহা অকর্ত্তব্য নয়, তখন বিপজ্জনক বলিয়া নরহত্যা অকর্ত্তব্য কেন? এইরূপ নানা যুক্তি গ্রহণ করিয়া স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। যখন পরকালের কোনও ভয় নাই, স্বার্থসাধন জন্যই যখন কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইতে হয় এবং যখন সাহস না করিলে কাহারও উন্নতি হয় না, তখন এরূপ স্থলে যে নরহত্যা কর্ত্তব্যের মধ্যেই পরিগণিত; না করিলেই বরং অকর্ত্তব্য করা হইবে, ভীরুরই কার্য্য করা হইবে। এইরূপে সকলেই লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া পরস্ত্রী পরধন হরণ প্রভৃতি করিবার সুযোগের চেষ্টা করিবে। কেহ কেহ ধরা পড়িলেও সে ভয়ে সকলে নিবৃত্ত হইবে না। কেননা সকলেই দেখিতেছে বিচারে অনেক সময়ে রামের অপরাধ শ্যামের স্কন্ধে পড়ে, অনেক দস্যু তস্কর মুক্তিলাভ করিয়া চিরজীবন মহাসুখে অতিবাহিত করে এবং অনেক নিরপরাধ দস্যুতস্কররূপে ধৃত ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ হারায় বা চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। সুতরাং এমন বিশ্বাস কাহারও হইবে না যে, কুকার্য্য করিলেই দণ্ডিত হইতে হইবে এবং না করিলে নিশ্চয়ই দণ্ডিত হইতে হইবে না। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে কি ইহকালীন মঙ্গলোদ্দেশে, কি উন্নতির অভিপ্রায়ে, কি সমাজ বা রাজশাসন-ভয়ে কি লোকনিন্দাভয়ে কিছুতেই মানব কর্ত্তব্যানুরাগী হইতে পারে না।

যদি স্বার্থসংস্রব আছে মনে করিয়া লোকে কর্ত্তব্যানুরাগী হইত, তাহা হইলে আজি যে কন্যাদায়ে লোক এত বিপন্ন, তাহা কি হইতে পারিত? কখনই না। যিনি পুত্রের বিবাহ দিবার সময়ে সহস্র সহস্র মুদ্রার দাবি করেন, তিনি কি জানেন না যে, এরূপ করিলে আপন কন্যার বিবাহের সময় তাঁহাকেও বিষম বিপদে পড়িতে হইবে? কিন্তু কৈ, ভবিষ্যৎ দুঃখের ভয়ে কয়জন পাত্রপণের অযথা দাবি ত্যাগ করেন? যত চক্ষু ফুটিতেছে, ততই যে এ অত্যাচারের বৃদ্ধি হইতেছে। সকলেই দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন, এই অত্যাচারের জন্য রমণীকুলের দুঃখের সীমা নাই, সকলেই বুঝিতেছেন, একটু সংযত হইলেই অবলা জাতির এই দারুণ দুঃখের অবসান হয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও কন্যাদায় কমিয়া যায়; ইহার জন্য কত সভা সমিতি হইতেছে, কিন্তু কার্য্যে কি ফল হইতেছে? উত্তরোত্তর পণের বৃদ্ধিই ত হইতেছে। যে শিক্ষিত দলের মজ্জায় মজ্জায় সাম্য-স্বাধীনতাবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাও ভবিষ্যৎ ভাবেন কই? কেহ ভাবেন হয় ত আমার পুত্র অপেক্ষা কন্যা অল্প হইবে; কেহ ভাবেন আমি বুদ্ধিকৌশলে সুবিধা করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারিব; কেহ ভাবেন এক্ষণে পুত্রের বিবাহ দিয়া যে অর্থ পাইতেছি, তাহাতে আমার দুরবস্থা দূর বা অবস্থার উন্নতি হইলে পরে পাত্রপণ দিতে কষ্ট হইবে না; কেহ ভাবেন কন্যার বিবাহকালের পূর্ব্বেই হয় ত আমার মৃত্যু হইবে। এইরূপ নানা জনে নানা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যৎ ভাবেন না। সকল কার্য্যেই ঐরূপ। পরকালের ভয় না থাকিলে, কর্ত্তব্য-জ্ঞান না হইলে কেবল ইহকালের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ চিন্তা করিয়া অতি অল্প লোকেই সংযত হইতে পারে। কিন্তু যদি ধর্ম্মশাস্ত্রমতে এবংবিধ কার্য্য পাপজনক হয় ও তাহাতে সকলের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে এ সকল কুপ্রথা সমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেই পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীতিশাস্ত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না।

কোন সম্প্রদায়ের মত এই যে, নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়াই মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নীতির অবলম্বনে চলিলে সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকই পরস্পর ধর্ম্মবিবাদ ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, স্বার্থসাধনই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বর্গে গমন করিয়া অতুল সুখসম্পত্তি ভোগ করিবেন, অথবা পরজন্মে বহু ধনসম্পত্তি-সম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। অধিক্ কি যাঁহারা মুক্তিকামী, তাঁহারাও সম্পূর্ণ স্বার্থপর; কেননা তাঁহা-দেরও উদ্দেশ্য দুঃখনিবৃত্তি; পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া যাহাতে আর দুঃখ পাইতে না হয়, তাহারই জন্য জপ তপ যোগ আরাধনাদি করেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া তাঁহারা কিছুই করেন না। কিন্তু যাঁহারা নীতি-মার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতা স্বার্থমূলক নহে, তাঁহারা কর্ত্তব্য ভাবিয়াই (Duty ভাবিয়াই) কর্ত্তব্য করেন।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, তাঁহা-দের আবার Duty কি? কিসে তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহাদের স্বার্থ-সাধন ভিন্ন অন্যপ্রকার Duty আছে? কি করিলে Duty করা হয়, তাহাই বা বুঝিবেন কি প্রকারে? নীতিশাস্ত্র কি ঈশ্বরপ্রণীত? তাহা যদি না হয়, তবে মানুষের প্রণীত বলিয়া যখন ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বস-নীয় নয়, তখন সেই মানুষেরই প্রণীত নীতিশাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া কর্ত্তব্য-

জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, তাঁহাদেরই নিঃস্বার্থকর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মিতে পারে; কারণ তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের প্রণীত, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরেরই আজ্ঞা পালন করা হয়; ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিলে নিশ্চয়ই কালে সুফল ফলিবে। সুতরাং আপাততঃ সুফল ফলুক আর নাই ফলুক, সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই একমাত্র কর্ত্তব্য—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে করিতে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা জন্মে ও তখন তাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কেবল কর্ত্তব্যেরই অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্মই তাঁহাদের Duty, কামনাশূন্য হইয়া সেই Dutyরই অনুষ্ঠান করেন, কোনও ফলাকাঙ্ক্ষাই থাকে না। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র মানেন না, তাঁহাদের পক্ষে কি করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয় বা কি করিলে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়, তাহা জানিবার কোনও উপায় না থাকায় তাঁহাদের Dutyর জ্ঞানই জন্মিতে পারে না; Duty ভাবিয়া কোনও কার্য্যও করিতে পারেন না। মানুষের যে স্বার্থসাধন ভিন্ন কোনওরূপ Duty আছে, স্বার্থনাশ করিয়া পরার্থসাধন করিলে যে Duty করা হয়, তাহার কারণই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না; সুতরাং সে পথে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তিই জন্মে না।

সত্য বটে, আজি কালি ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থানে নীতির (Morality) আসন স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে না চলিলে লোকে নিন্দিত ও সমাজচ্যুত হইত, এক্ষণে সেইরূপ Moralityর বিরুদ্ধাচরণ করিলে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়। সত্য বটে, এক্ষণকার বিজ্ঞসম্প্রদায়ের মতে Moralityই মানবের প্রধান অবলম্বন,—নীতিসম্পন্ন কার্য্য করাই মানবের Duty, যিনি নীতিবিরোধী কার্য্য করেন, তিনি মনুষ্যনামের যোগ্য হয়েন না ও তজ্জন্য লোকে নীতিপথের অনুসরণ করাকে

শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। সত্য বটে, এখনও কতকগুলি বিজ্ঞলোক ধর্ম্মশাস্ত্র না মানিয়াও কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়েন ; কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারই এ সকলের প্রধান কারণ, নীতিশাস্ত্র নহে। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ ছিলেন, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত কতকগুলি নীতিবাক্য সংস্কারের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাই সেই পূর্ব্ব-সংস্কার বশতঃ সেই সকলের অনুসরণ করাকে কর্ত্তব্য মনে করেন। কালে এ সংস্কার হৃদয় হইতে বিলীন হইলে, আর কেহ সেই সকল নীতিমার্গের অনুসরণ করিবেন না। এখনই অনেককে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থসাধনের উপযোগী নূতনপ্রকারের নীতিমার্গের অবলম্বী হইতে দেখা যায়, এবং অনেকে কেবল লোকভয়েই নীতিপরায়ণ হয়েন।

নীতির অনুসরণে অনুরাগ জন্মিবার এমন কি স্বাভাবিক কারণ আছে যে, তাহারই পরতন্ত্র হইয়া পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিবে? নীতিপরায়ণ হইলে মানুষের কি কোনও লাভ আছে? ইহকালের কি পরকালের সুখের কোনও আশা আছে? যদি ঐরূপ কোনও সুখের আশা বা দুঃখের ভয় আছে বলিয়া নীতিপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ত দণ্ডভয়ে ও পুরস্কারের লোভেই কার্য্য করা হইল; কর্ত্তব্য ভাবিয়া করা হইল কৈ? তবে আর নীতিশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল কিপ্রকারে? যদি নীতিমান্ না হইলে ইহকালে বা পরকালে দুঃখ পাওয়ার ভয় ও সুখের আশা না থাকে, তবে তৎপরায়ণ হইতে মানব বাধ্য হইবে কেন? কোনও উদ্দেশ্য নাই, কোনও প্রয়োজন নাই, বৃথা কেবল স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ করিয়া কষ্ট পাইতে হয়, মানুষ কি এমন কোনও কার্য্য করে? যে করে, তাহাকে কি লোকে বাতুল বলে না? তাই যাঁহারা আস্তিক, অথচ ধর্ম্মশাস্ত্র মানেন না, তাঁহারা নীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি কল্পিত স্বতঃসিদ্ধের

আশ্রয় লইয়াছেন। সেই সকল ভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধই তাঁহাদের যুক্তির মূল। সে সকল কল্পিত স্বতঃসিদ্ধ যে স্বতঃসিদ্ধই নয়, সম্পূর্ণ প্রমাণ-সাপেক্ষ অথচ একান্ত প্রমাণবিরুদ্ধ, সে কথা তাঁহারা এক বারও ভাবেন না; অধিক কি তাঁহাদের সেই স্বতঃসিদ্ধগুলিই তাঁহাদের নীতির অসারতা প্রতিপাদন করিতেছে। একে একে সে সকলের আলোচনা করা যাইতেছে।

সাম্যবাদ।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর যখন সকল মনুষ্যেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন তিনি অবশ্যই সকলকে সমান শক্তি, সমান অধিকার, সমান স্বাধীনতা দিয়াছেন। তাহা না বলিলে তাঁহাকে পক্ষপাতপরায়ণ বলিতে হয়। ঈশ্বর যে পক্ষপাতপরায়ণ হইতে পারেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব প্রকৃতিপ্রাপ্ত শক্তি, অধিকার ও স্বাধীনতার প্রয়োগে মানব যাহা করে তাহাই কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি তাহাতে বাধা দেয়, সে অন্যায় কার্য্য করে, এই স্বতঃসিদ্ধের অবলম্বনে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বর্ণভেদ প্রভৃতি বহুতর মঙ্গলকর বিধির দোষ কীর্ত্তন করেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরই স্বতঃসিদ্ধ বা প্রমাণসিদ্ধ নহেন, তখন ঈশ্বর পক্ষপাতপরায়ণতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন কি না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? প্রত্যুত এ কথা প্রত্যক্ষের একান্ত বিরুদ্ধ।

এ জগতে সাম্য কোথায়? কে না জানে জগতে সকলে সমান হওয়া দূরে থাকুক, দুইটী মনুষ্যও পরস্পর সমান নয়। সকলের সমান স্বত্ব থাকা দূরে থাকুক, একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজা, আর এক জন নিতান্ত দুর্ব্বল অক্ষম দরিদ্র। একজন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর একজন এমন মূর্খ যে, ডালের আগায় বসিয়া তাহার গোড়া কাটেন। এক জনের সৌন্দর্য্য দেখিলে সকলেই বিমোহিত হয়, আর

একজন এমনই কদাকার ও বিকলাঙ্গ যে, দেখিবামাত্র ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইবার ইচ্ছা হয়। এ সমস্ত কি সাম্যের পরিচায়ক? তুমি কেন বল মানুষের কর্ম্মদোষে এই সমস্ত বৈষম্য ঘটে? এরূপ বলিবার তোমার কি হেতু আছে? জন্মলাভের পূর্ব্বে মানুষ কি কার্য্য করিয়াছিল যে, তাহারই ফলে এরূপ বৈষম্য হইয়াছে? যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র মানেন না, তাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না; সুতরাং পূর্ব্বজন্মের কার্য্যের দোষ তাঁহাদের মতে হইতে পারে না। আর কর্ম্মদোষ ঘটার কারণ কি? ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির অপব্যবহার করিবার শক্তি মানুষের হয় কি প্রকারে? যদি হয় তবে সকলের সমান হয় না কেন? মানুষের কি নিজস্ব কিছু আছে যে, তাহারই বলে মানব ঈশ্বরের বিরোধাচরণ করে? তাহা যদি হয় তবে ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। তুমি ত বলিতেছ সকল মানুষেরই স্বাধীনতা আছে, অর্থাৎ মানব ইচ্ছা করিলে ইচ্ছার অনুরূপ কার্য্য করিতে পারে। এবং পুরুষকারই তোমার মতে কার্য্যসম্পাদনের একমাত্র উপায়। যখন তুমি বলিতেছ সে পুরুষকার সকলেরই সমান, তখন কেন সকলে আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করে না? কেন একজনের কর্ম্মদোষ ঘটে, আর একজনের ঘটে না? যদি বল বুঝিবার দোষে— নিজের ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তবুদ্ধির দোষে মানব অপথে যায়; কিন্তু কাহারও বুঝিবার দোষ হয়, কাহারও বা হয় না কেন? সকলেরই যখন বুদ্ধি প্রভৃতি সমান, এবং সুখী হইবার ইচ্ছাও যখন সকলেরই সমান, তখন এরূপ হইবার কারণ কি? তুমি যে বলিতেছ মানুষের Free will আছে, কিন্তু সেই Free willএর স্বত্ব অনুসারে অপকর্ম্ম করিলে যদি ঈশ্বর দণ্ড দেন তবে তাহাকে Free will বলিব কি প্রকারে? ঈশ্বর কি মানুষকে কষ্ট দিবার জন্যই Free will দিয়াছেন? নচেৎ যে মনুষ্য Free willএর সদ্ব্যবহার করিতে জানে না, ঈশ্বর এমন শক্তি দেন নাই,

যে তাহার বলে নিশ্চয়ই তাহার সদ্ব্যবহার করিবে, সে মনুষ্যকে তিনি Free will দেন কেন? কোন শিশুর হস্তে কিছু মিষ্টান্ন ও কিছু চাক্‌চিক্যশালী বিষ দিয়া যদি বলি তুমি যাহা ইচ্ছা খাও ও সেই কথায় শিশু বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সে মৃত্যুর কারণ সেই শিশু না আমি? যে ঈশ্বর এইরূপে মনুষ্যকে দুঃখ দিতে পারেন, তিনি পক্ষপাতপরায়ণ হইতে পারিবেন না কেন? যতক্ষণ এই সকলের উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পার, ততক্ষণ তুমি মানবের স্কন্ধে দোষ নিক্ষেপ করিতে পার না। যদি বল পিতৃদোষে বৈষম্যের উৎপত্তি হয়; কিন্তু একজনের দোষে আর একজন কষ্ট পাইলে তাহা কি নিজকর্ম্মদোষে বলিতে হইবে? না, একজনের দোষে আর একজনকে কষ্ট দেওয়া ঈশ্বরের পক্ষপাতশূন্য যুক্তিসিদ্ধ বিচার? যদি বল ঘটনাবলীর সংযোগে বৈষম্য ঘটে; কিন্তু সে ঘটনাবলীর উপর কি মনুষ্যের হাত আছে? মনুষ্যের চেষ্টায় কি তাহার অন্যথা হইতে পারিত? যদি বল পারিত, তাহার কি প্রমাণ আছে? যদি বল না, তবে অন্যের দোষে কষ্ট পাওয়া হইল। অতএব কিছুতেই তুমি বলিতে পার না নিজ নিজ কর্ম্মদোষই এরূপ বৈষম্যের কারণ। আবার মানবের স্কন্ধে দোষ দিলেই কি ঈশ্বরের এ পক্ষপাতিত্বদোষ কাটিয়া যায়? কেবল মানুষের মধ্যে সাম্য থাকিলেই কি ঈশ্বর এই দোষ হইতে অব্যাহতি পান? তিনি যে নানাপ্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কীটাণু ও ভিন্নভিন্নপ্রকার উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করিয়া জগৎ বৈষম্যময় করিয়াছেন; তাহাতে কি তাঁহার পক্ষপাতিতার পরিচয় হয় না? মানুষের মধ্যেই ছোট বড় করিলে পক্ষপাত করা হয়, অন্য জীবের মধ্যে করিলে পক্ষপাত করা হয় না, তাহার অর্থ কি? না, ইতর জীবগণও বুঝিবার দোষে ছোট হয়? শৃগাল যে ব্যাঘ্র হয় নাই, ব্যাঘ্র যে মানব হয় নাই, সে কি তাহাদের নিজ নিজ ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তবুদ্ধির দোষে? না, কোনও ব্যাঘ্র যে অধিক বলবান্,

কোনও ব্যাঘ্র নিতান্ত দুর্ব্বল, কোনও গাভী অধিক দুগ্ধ দেয়, কোনও গাভী অল্প দুগ্ধ দেয়, এ সকলও তাহাদের ইচ্ছাকৃত কর্ম্মফলে? পশুদেরও কি (Free will) স্বাধীনতা আছে যে, সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া এরূপ হইয়াছে? বস্তুতঃ সকলকে সমান না করিলে ঈশ্বরের যে পক্ষপাত করা হয়, এ কথা কে বলিল? কাহার কৃত আইন অনুসারে ঈশ্বরের দোষা-দোষের বিচার করা হয়? বৈষম্য যদি বাস্তবিক দোষের হয়, তাহা হইলে যে সৃষ্টিই হয় না। সকলকে সমান করিলে ত ভিন্ন ভিন্ন জীব হইতেই পারে না। সমান করিতে হইলে যে, একই প্রকারের শক্তিসম্পন্ন একই প্রকারের জীবে জগৎ পূর্ণ করিতে হয়। যদি কেবল সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানবেই বিশ্ব পূর্ণ করিতে হয়, তাহা হইলে দয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানবীয় গুণ সমুদায় ত সে মানবজাতিতে থাকিতে পারে না। সকলেই যখন সমান, তখন কে কাহাকে দয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে? কে কাহার উপকার করিবে? উন্নতিই বা হইবে কি প্রকারে? একের উন্নতি হইলেই যে বৈষম্য হইল। অতএব সাম্যবাদ একান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ।

স্বাধীনতাবাদও ঐ রূপ। ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা বা অধিকার কাহারই নাই। যখন সকলের শক্তি সুযোগ সমান নয়, তখন সকলের স্বাধীনতা রক্ষা হইবে কি প্রকারে? অনেক সময়েই যে একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। যাহার উপযোগী শক্তি সুযোগ নাই, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কিপ্রকারে? যদি বল অসদিচ্ছা পূরণের নাম স্বাধীনতা নহে, সদিচ্ছা পূরণের নামই স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতার বিরোধী হয় না, তাহার বাধাও কেহ দেয় না। কিন্তু বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি সকলের সমান নহে; একজন যাহাকে সদিচ্ছা বলেন, আর একজনের মতে তাহাই যে অসদিচ্ছা, তখন কেন তাহা অন্যের ইচ্ছার বিরোধী হইবে না? আবার কেবল যে অন্যের বাধাতেই ইচ্ছাপূরণের ব্যাঘাত হয়, তাহা নহে; প্রাকৃতিক নিয়মা-

বলী ও ঘটনাবিশেষের সমাবেশ হেতু অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে। দৈববিঘ্ন বশতঃ নিয়তই লোকের ইচ্ছাপূরণের ব্যাঘাত হইতেছে; তদ্ভিন্ন নিজে নিজেও মানব স্বাধীন নহে। মানবহৃদয় পরস্পরবিরোধী বৃত্তিনিচয়ের সমষ্টি; অনেক সময়েই বৃত্তিবিশেষের অধীন হইয়া বৃত্তিবিশেষের বিরোধী কার্য্য করিতে হয়, উত্তেজিত বৃত্তির তাড়নায় অনেক সময়েই বিরোধী বৃত্তির স্বাধীনতা নষ্ট হয়, কখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া ক্ষমার বিরোধাচরণ করিতে হয়, লোভের বশীভূত হইয়া দয়ার বিরোধাচরণ করিতে হয়। সুতরাং কোনও মনুষ্যই কোনও অবস্থাতেই স্বাধীন নহে। যতই সদিচ্ছাপরায়ণ হউন, কেহই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। এ সকল বিষয় "মানবতত্ত্বে" দেখিতে অনুরোধ করি।

যদিও তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় ঈশ্বর কাহাকেও ছোট বড় করেন নাই, অধিকার সকলেরই সমান, মানুষ আপন দোষে এই বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যদি মানব এক্ষণে আপন স্বত্ব উদ্ধারের চেষ্টা পায়, তাহা হইলে মানবের নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে না। ঈশ্বর যখন সকলকে সমান অধিকার দিয়াছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে এই পৃথিবীর সমস্ত ভূমি, শস্য, ফল, জল, ধন, রত্ন, জীব, জন্তু সমস্তই সকলে সমান সমান পাইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে কেহ লক্ষ বিঘা ভূমির অধিপতি, কেহ বাস করিবার জন্য এক কাঠা ভূমিও পায় না; কেহ অতুল ধনের অধিকারী, কেহ এক মুষ্টি অন্নও পায় না; কেহ প্রভু হইয়া নিয়ত আজ্ঞা প্রচার করেন, কেহ ভৃত্যভাবে অবনত মস্তকে আজ্ঞা পালন করেন। যখন ঈশ্বর সকলকেই সমান করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে মনুষ্যের নিজের দোষে এই বৈষম্যের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা অধিক লইয়াছেন ও প্রভু হইয়াছেন, তাঁহারা যেমন দুর্নীতিপরায়ণ, যাঁহারা অল্প লইয়াছেন ও ভৃত্য হইয়াছেন, তাঁহারাও সেইরূপ দুর্নীতিপরায়ণ।

তাহা যদি হইল, তবে যিনি সাম্যবিধানের চেষ্টা করেন, স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা করেন, তিনি অবশ্য ঈশ্বরানুমোদিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন বলিতে হইবে—তাঁহাকে নীতিপরায়ণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহা হইলে যে ব্যক্তি ধনীর অর্থ অপহরণ করে ও প্রভুর বিদ্রোহী হয়, সে যে নীতিবিগর্হিত কার্য্য করে, তাহা বলিব কি প্রকারে? ধনী ঈশ্বর-আজ্ঞার বিরুদ্ধ নীতিবিরোধী কার্য্য করিয়া বহু লোকের প্রাপ্য অংশ অপহরণ করিয়াছেন, আমি সেই ধন চুরি করিয়াই হউক, ডাকাতি করিয়াই হউক আর প্রতারণা করিয়াই হউক, যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে কেন? বরং আমি ত নীতিপথেই চলিতেছি বলিতে হইবে। আমি ত আমার প্রাপ্য অংশ লইবার জন্য এ কার্য্য করিতেছি অথবা যিনি অন্যের অংশ লইয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার সেই অন্যায় কার্য্যের সংশোধন করিতেছি।

যদি বল ধনী ন্যায়পথে থাকিয়া শ্রম ও অধ্যবসায়-সহকারে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারই অধিকার, তোমার তাহা লইবার অধিকার নাই; তুমিও ঐরূপে উপার্জ্জন কর, অধিক পাইবে, অন্যের ন্যায়ার্জ্জিত ধন লইবার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু যাহা অপরের, তাহা তুমি ন্যায়পথে লইবে কি প্রকারে? তুমি তাহা যে উপায়েই লও, তাহাকে কখনও ন্যায়ার্জ্জিত বলা যাইতে পারে না। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি বলপূর্ব্বকই লও আর মিষ্ট কথায় ভুলাইয়াই লও, তাহা তোমার অন্যায় ভিন্ন নহে। যদি তোমার সে উপায়কে ন্যায্য বল, তবে আমার এ উপায়কে ন্যায্য বলিবে না কেন? যখন তুমি বলিতেছ পুরুষকারই আপন আপন স্বত্বরক্ষার একমাত্র উপায়, যখন বলিতেছ আমরা যে দুঃখ পাই, স্বত্ব হারাই, সে কেবল আমাদের সমুচিত চেষ্টা না হওয়ারই জন্য, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে প্রাপ্য স্বত্বস্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে

হইবে—যথাসাধ্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হইবে। পুরুষকার বলিতে ত প্রাপ্ত মানবীয় শক্তির প্রয়োগকেই বুঝায়—যাহার যে শক্তি আছে, তাহারই প্রয়োগকে বুঝায়! দেখা যাইতেছে সকলের শক্তি সকল বিষয়ে সমান নহে। কেহ বলবান্, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ রূপবান্, কেহ কলকণ্ঠ, কেহ সাহসী, কেহ চিত্রনিপুণ, কেহ শিল্পপটু, কেহ চৌর্য্য ও প্রতারণাপটু। ইহাও দেখা যায় যাহার এক শক্তি অধিক, তাহার অন্য শক্তি অল্প। যখন তুমি বলিতেছ ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি দিয়াছেন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, যাহাকে এক শক্তি অধিক দিয়াছেন, তাহাকে অন্য শক্তি অল্প দিয়াই সাম্য বিধান করিয়াছেন, অর্থাৎ যে বলবান্, সে হয় ত প্রতারণাপটু নয়; যে দুর্ব্বল, সে হয় ত বিলক্ষণ প্রতারণাপটু; এইরূপেই ঈশ্বর সকলকে সমান করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে প্রত্যেক্ষের একান্ত বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে সকলের সমান শক্তি আছে এ কথা বলাই যায় না। সুতরাং অবশ্যই বলিতে হইবে যাহার যে শক্তি আছে, তাহারই প্রয়োগে আপন স্বত্ব রক্ষা করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তোমার বল আছে, সেই বল দ্বারা আমার প্রাপ্য অংশ হরণ করিয়াছ; আমার বল নাই, চতুরতা আছে, তদবলম্বনে আমি আপন স্বত্ব রক্ষা করিতেছি। তুমি সুল-লিত সঙ্গীতে লোককে বিমুগ্ধ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ, আমি প্রতা-রণায় লোককে মোহিত করিয়া অর্থ লইতেছি। ইহাতে দোষ কি? ঈশ্বরানুমোদিত পুরুষকার অবলম্বনেই ত নিজের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতেছি, অন্যের ত কিছু লইতেছি না। যদি আমার প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অধিক লই, তাহা হইলে অন্যায় বলিতে পার বটে; কিন্তু তাহা হইলেও প্রভূত ধনসম্পত্তিশালীদিগের অপেক্ষা আমাকে অধিক অন্যায়কারী বলিতে পার না। কেননা তাঁহারা বহুতর লোকের প্রাপ্য হরণ করিয়াছেন। আর যদি আমি চৌর্য্য-দস্যুতা-প্রভৃতি-লব্ধ

ধন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া আমার নিজাংশমাত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে বলিতে হইবে আমার তুল্য নীতিপরায়ণ ঈশ্বরাজ্ঞাপালক আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং তোমাদের যুক্তি অনুসারে চৌর্য্য, দস্যুতা, প্রতারণা, নরহত্যা, পরদারহরণ কিছুই নীতি-বিরুদ্ধ নহে।

এখনই নীতিপরায়ণগণের মধ্যে অনেকে ঐ সকল কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজী অনেক নভেলে এমন বহুতর দস্যু-চরিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে যে, তাহারা না করে এমন অকার্য্যই নাই। কিন্তু সেই সকল দস্যু ঐরূপে লব্ধ ধন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করে বলিয়া, সে সকল নায়কের প্রশংসা যুধিষ্ঠির অপেক্ষাও অধিক। ঐ সকল নভেলের অনুকরণে আমাদের বঙ্কিম বাবুর দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠ। দেবীচৌধুরাণী ভবানীঠাকুরের নিকট নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা করিলেন; করিয়া গুরু শিষ্যা কি করিলেন? নিয়ত ধনীদিগের অর্থ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন ও তাহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। দস্যুতা তাঁহাদের গুণের পরিচায়ক হইল। বিলাতে শুধু এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়াই নিহিলিষ্ট প্রভৃতি কত গুপ্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সাম্যবিধানই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা না করে এমন অকার্য্যই নাই। অথচ তাহারা সমাজসংস্কারক ও মানব জাতির হিতচিকীর্ষু বলিয়া অভিমান করে, অনেক বিজ্ঞ লোকের নিকট সম্মান ও আদরও যথেষ্ট পায়।

আজি কালি একদল সাম্যবাদী বলেন বিবাহপ্রথা থাকা ভাল নয়; কেননা সকল রমণী সমান সুন্দরী নহেন; কেহ কুরূপা ও কেহ সুরূপাকে লইয়াই চিরকাল থাকিবে কেন? ভাল মন্দ সকলেরই সমান প্রাপ্য। বিবাহপ্রথা না থাকিলে সকলেই এক দিন না এক দিন সুরূপার সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে পারে। এইরূপ কত অদ্ভুত নীতিকথাই আজি সাম্য, স্বাধীনতা ও পুরুষকারবাদীরা বলিতেছেন! অক্ষমের স্থান

পৃথিবীতে নাই ইত্যাদি কত ভয়ানক কথাই নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত হইতেছে। 'ঈশ্বরসৃষ্ট সকল মানুষের সমান অধিকার আছে, অতএব কাহারও কোনও বিষয়ে অধিকার লোপ করা উচিত নয়, সকলেরই স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত' ইত্যাদি উদার কথা তাঁহারা মুখে বলেন বটে, কিন্তু সেই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া যাঁহারা দুঃখ পান, তাঁহাদিগকে তাঁহারা দয়া করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন তাহারা ঈশ্বরদত্ত শক্তি-স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া পাপী হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে দয়া করা উচিত নয়; প্রত্যুত তাহাদের বিনাশেই জগতের মঙ্গল। এই সকল যদি নীতি হয়, তবে আর স্বেচ্ছাচার কাহাকে বলে? নীতি ও স্বেচ্ছাচারে প্রভেদ কি? কর্ত্তব্যপরায়ণে আর স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপরে প্রভেদ কি?

সাম্যবাদীরা এই সাম্য-স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া বিষম বৈষম্য ও অধীনতারই স্রোত বৃদ্ধি করিতেছেন। সাম্য-স্বাধীনতা-বিরোধী বলিয়া তাঁহারা রাজতন্ত্র, আভিজাত্যগৌরব, জাতিভেদপ্রথা, গুরুজনে ভক্তি প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র, শক্তিতন্ত্র ও একাকারের প্রবর্ত্তন করিয়া বিষম বৈষম্যেরই উৎপত্তি করিয়াছেন। রাজতন্ত্রে এক রাজারই মতের অনুবর্ত্তন করিতে হয়, প্রজাতন্ত্রে শত শত লোকের শতশতপ্রকার পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন মতের অনুবর্ত্তন করিতে হয়। সমস্ত প্রজার মতে কিছু রাজকার্য্য চলিতে পারে না। কতকগুলি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভোটের বলে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন। যাঁহারা ভোট দেন, তাঁহারা অনেক সময়ে ভোটগ্রহীতার ভয়ে বা কৌশলজালে প্রতারিত হইয়া ভোট দেন। এই ভোটের আদান প্রদানে যে কত লোকের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কত কার্য্য হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রায়ই প্রজা ও সভ্যগণের মধ্যে মতভেদজনিত বিবাদ হয়। ভোটে যে দলের পরাজয় হয়, তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে না। জাতিভেদপ্রথা থাকায় সকলের সকল বিষয়ে

সমান অধিকার না থাকিলেও সাম্যভাবজনিত অসম্ভব ইচ্ছার অপূরণ ও নিয়ত অবস্থাপরিবর্ত্তন জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। গুরুজননিষ্ঠায় কখন কখন মন্দ গুরুজনের দ্বারা কিছু কিছু অনিষ্ট হইলেও সচরাচর সুফল ফলে; অসংযত মূর্খ ও অল্পবয়স্কগণ গুরুজনের নিদেশ-বর্ত্তি-গুনসম্পন্ন হইয়া সুখী হয়। এক্ষণে গুরুজনের আজ্ঞা অবহেলা করিয়া যে কত লোক উৎসন্নের পথে যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে সাম্য-স্বাধীনতার দোহাই দিয়া শক্তিসুযোগ-সম্পন্নেরা কোটী কোটী লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য বৃদ্ধি করেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শতশত রথচাইল্ডের ন্যায় ধনী লোক স্বর্ণ মুক্তা হীরকাদি পদে দলন করিতেছেন, এবং লক্ষ লক্ষ লোক একখানি কুটীর জন্য কাতর নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে ও নিয়ত পুলিশের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতেছে। ইহাই কি সাম্য-স্বাধীনতাবাদের সমতা? করুণ নেত্রে দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে না হয়, ইহা কি তাহারই একটা কৌশল নহে?

অন্তঃসংজ্ঞাবাদ।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর কর্ত্তব্যবোধের জন্য মানবের হৃদয়ে সদসৎ বুঝিবার জন্য বৃত্তিবিশেষ দিয়াছেন। কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সেই বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের মনে তাপ ও আত্মগ্লানি জন্মে ও সৎকার্য্য করিলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়; তাহাতেই মানব সদসৎ বুঝিতে পারে ও সেই বৃত্তিরই প্ররোচনায় মানব কর্ত্তব্যরত হয়। ঐ বৃত্তিই মানুষের কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগের হেতু। এই ভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা বলেন যদি স্বাধীনভাবে মানুষ কার্য্য করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র এই স্বাধীনতা লোপ করিয়াই মানবকে কুক্রিয়াশীল করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি এ কথা সত্য? যদি ঈশ্বর এমন বৃত্তি আমাদিগকে দিয়া থাকেন, তবে কেন সে বৃত্তি মানবকে

নিয়মিত করে না? যাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মানবের দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছেন, তাঁহাদেরও ত সে বৃত্তি ছিল, কেন সে বৃত্তি তাঁহাদিগকে এরূপ অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিল না? যে শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তাহাদের হৃদয়ে সেরূপ বৃত্তি থাকার পরিচয় পাওয়া যায় কৈ? তবে কিসে বুঝিলে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে এরূপ বৃত্তিবিশেষ দিয়াছেন? বাস্তবিক যদি এমন বৃত্তিবিশেষ মানব-হৃদয়ে থাকিত যে, তাহার প্রভাবে কোন্‌টী কর্ত্তব্য ও কোন্‌টী অকর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারা যায়, বা তাহার করণজন্য দুঃখ বা সুখ বোধ হয়, তাহা হইলে কখনই মানুষ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিত না। তাহা হইলে সকল মানুষই সেই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া একইপ্রকার কার্য্য করিত। সকল ব্যাঘ্রই যেমন ব্যাঘ্রবৃত্তি অবলম্বন করে, একটীও মেষবৃত্তি অবলম্বন করে না; সকল মেষই যেমন মেষবৃত্তি অবলম্বন করে, একটীও ব্যাঘ্রবৃত্তি অবলম্বন করে না; সকল প্রকার ইতর জন্তুই যেমন ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতি Instinct) অনুসারে স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্য করে; সকল মানবই সেইরূপ ঈশ্বরদত্ত সেই বৃত্তিবিশেষের পরতন্ত্র হইয়া মানবীয় কর্ত্তব্যপরায়ণ হইত, কেহই অমানুষোচিত কার্য্য করিত না। কিন্তু তাহা কি হয়? মানুষের মধ্যে যে একজন দেবতা ও একজন পিশাচ! অপরের কণামাত্র দুঃখ দেখিলে কাহারও হৃদয় উদ্বেলিত হয় ও প্রাণপণে তাহার দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করেন, কেহ বিনা প্রয়োজনে নিরপরাধে জনগণের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করেন যে, ব্যাঘ্রও সেরূপ করে না। বৃত্তি-বিশেষ আমাদের পথপ্রদর্শক ও নিয়ামক থাকিতে এরূপ আকাশ পাতাল ভেদ হইবার কারণ কি? কিপ্রকারে মানুষ ঈশ্বরদত্ত শক্তি নিস্তেজ করে? যখন সকল মনুষ্য সর্ব্ববিষয়ে সমান, তখন পরস্পর এত ভিন্নরূপই বা হয় কি প্রকারে? কয়জনের মনে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে আত্মগ্লানি জন্মে? অধিকাংশ লোকই ত প্রতিদিন শতবার

মিথ্যা বলিতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জনের মনে আত্মগ্লানি জন্মে? অনেকে নিয়ত দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা, পরদারহরণ প্রভৃতি শতশত অন্যায় কার্য্য করিতেছে, কয়জনের মনে তজ্জন্য আত্মগ্লানি জন্মে? ও তজ্জন্য কয়জনে সেই সকল অপকর্ম্ম করা বন্ধ করে?

সত্য বটে, কার্য্যবিশেষের অনুষ্ঠানে কখন কখন আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদ জন্মে; কিন্তু একরূপ কার্য্যে সকলেরই আত্মগ্লানি বা আত্মপ্রসাদ জন্মে না। যাহার যেমন সংস্কার, যেমন জ্ঞান, যেমন অভ্যাস, তাহার সেইরূপ কার্য্যে আত্মগ্লানি বা আত্মপ্রসাদ জন্মিয়া থাকে। মদ্যপানে ও গোমাংসাদি ভক্ষণে হিন্দুর আত্মগ্লানি জন্মে, খৃষ্টানের তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ঐরূপ অনভ্যস্তের নরহত্যায় আত্মগ্লানি জন্মিলেও দস্যুর তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণবধ করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিলে কি রাজার আত্মগ্লানি জন্মে? না, আত্মপ্রসাদ লাভ হয়? বস্তুতঃ অভ্যাস ও সংস্কারই আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রসাদের কারণ। যাহাদের কোনরূপ শিক্ষা হয় নাই, তাহাদের মনে কিছুমাত্র আত্মগ্লানির উদয় হয় না, তাই শিশুগণ কোনও অপকর্ম্ম করিয়াই অনুতপ্ত হয় না, পিত্রাদির শাসনে ভীত হয় মাত্র। যে সকল নিরেট মূর্খ ও নিতান্ত অসভ্য জনগণ শাস্ত্রশিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদেরও ঐরূপ আত্মগ্লানি জন্মে না। যাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র-জাত সংস্কার বদ্ধমূল আছে, তাহাদেরই সেই সংস্কারের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, সেই শিক্ষা ও সংস্কারপ্রভাবে আত্মগ্লানি জন্মে। যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা শাস্ত্র মানেন না, Conscienceএর আদেশানুসারে সৎকার্য্য করেন, তাঁহারা ভুল বুঝেন। বাস্তবিক তাঁহারা শাস্ত্র না মানিলেও তাঁহাদের হৃদয় শাস্ত্রীয় সংস্কারে পূর্ণ। সেই সংস্কারবিরোধী কার্য্য করাতেই আত্মগ্লানির উদয় হয়, Conscienceএর নির্দেশে নহে। কালে যখন ধর্ম্মশাস্ত্রজাত বা অন্য কোনরূপ সংস্কার থাকিবে না, তখন Conscienceএর অস্তিত্বই আর বুঝা যাইবে না।

সত্য বটে, আমাদের হৃদয়ে যে বিবেকশক্তি আছে, সেই শক্তি-প্রভাবে আমরা অনেক সময়ে বিচার বিতর্ক করিয়া কর্ত্তব্যের অবধারণ করি। কিন্তু তাহা শিক্ষা ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। যে সকল বিষয়ের অবলম্বনে বিচারবিতর্ক করি, অগ্রে তাহার গুণাদি জানা আবশ্যক। অপরিজ্ঞাত বিষয় লইয়া কোন মীমাংসা করা বিবেকের সাধ্য নহে। যে ব্যক্তি আম্র ও মাখাল ফল খাইয়াছে, সেই ব্যক্তির বিবেকই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারে মাখাল ফল খাওয়া উচিত নহে, আম্র খাওয়া উচিত। যে কখনই তাহা খায় নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহার বিবেক কখনই তাহা বলিয়া দিতে পারে না। বাস্তবিক বিবেক বা Conscienceএর যদি সেরূপ শক্তি থাকিত, যে, বিনাশিক্ষায় বিনাপরীক্ষায়, কেবল ঐ শক্তিরই প্রভাবে মানব হিত কি অহিত স্থির করিতে পারে, তাহা হইলে পশুপক্ষ্যাদি যেমন অখাদ্য ও অনিষ্টকর দ্রব্য দেখিলে চিনিতে পারে, মনুষ্যও সেইরূপ পারিত, এবং তাহা হইলে পশুপক্ষ্যাদির কর্ত্তব্যসাধন জন্য যেরূপ কোন শাস্ত্রেরই সহায়তা আবশ্যক হয় না, মানুষেরও সেইরূপ হইত না। কেবল যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হইত না তাহা নহে; নীতিশাস্ত্র, সমাজশাসন ও রাজবিধি, কিছুরই প্রয়োজন হইত না।

যদিও তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যায় যে, ঐরূপ বৃত্তিবিশেষ মানবহৃদয়ে আছে, তাহা হইলেও মানব যে, তাহারই অনুশাসনে চলিবে তাহার অর্থ কি? পরমেশ্বর মানবহৃদয়ে কেবলমাত্র এই বৃত্তিটি ত দেন নাই; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানাবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; তবে কি প্রকারে মানব Conscienceমাত্রেরই পরায়ণ হইবে?—অন্য সমস্ত বৃত্তির মত অগ্রাহ্য করিয়া কেবল Conscienceএর মতেই কার্য্য করিবে? অন্যগুলিও ত ঈশ্বরের দেওয়া। আবার সেগুলির প্রভাবই অধিক; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

সকলই প্রবল। প্রবল বৃত্তি সকল যে নিয়তই মানবকে স্বস্ব পথে আকর্ষণ করিতেছে। সেই আকর্ষণবলে সেই সকল বৃত্তির প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যে মানব তাহাদেরই নিদেশবর্ত্তী হইবে। কি প্রকারে দুর্ব্বল Conscience সেই সকল প্রবল প্রবৃত্তির গতিরোধ করিবে? Conscience যখন দুর্ব্বল, তখন কি প্রকারে সে প্রবলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে? প্রবল বৃত্তিরই ত প্রবল হইবার কথা; সুতরাং দুর্ব্বল Conscienceকেই অন্যান্য বৃত্তি সকলের অধীন হইতে হইবে—প্রবল কাম-ক্রোধাদির উত্তেজনায় Cons-cienceএর অস্তিত্বই যে অনুভব হইবে না। তাহা যদি হইল, তবে Cons-cience না থাকিলে যে ফল, থাকিলেও সেই ফল। Conscience যখন দুর্ব্বল, তখন তাহার সাহায্যে কি প্রকারে প্রবল বৃত্তি সকলের দমন হইবে? এরূপ করিতে হইলে যাহাতে অন্যান্য বৃত্তির উপর Conscienceএর প্রাধান্য জন্মে —Conscienceএর এমন বল বৃদ্ধি হয় যে, উদ্দাম কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গ তাহার আজ্ঞাবর্ত্তী হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। কি উপায়ে তাহা হইবে? নীতির অনুসরণে ত তাহা হইতে পারে না। কারণ তুমি বলিতেছ, Conscienceই নীতির প্রসবিতা। নীতির যখন জন্ম হয় নাই, তখন নীতিশাস্ত্র কি প্রকারে Conscienceএর বল বৃদ্ধি করিবে? দুর্ব্বল Conscienceএর মতে যদি নীতিশাস্ত্র হয়, তাহা হইলে সে নীতিশাস্ত্র ত কামক্রোধাদি প্রবল বৃত্তিরই অনুমোদিত হইবে। অতএব Conscience থাকিলেও, সে Conscienceকে বলবান্ করিবার জন্য উপায়ান্তরের প্রয়োজন। যদি ধর্ম্মশাস্ত্রকে সে উপায়স্বরূপ গণ্য না করা যায়, তবে কিসের দ্বারা Conscienceএর শক্তি বৃদ্ধি হইবে? উদ্দাম কামক্রোধাদিকে কি প্রকারে Conscience স্ববশে আনিবে?

বস্তুতঃ Conscience-বাদ কেবল স্বেচ্ছাচারের ছলনামাত্র—স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়াও কর্ত্তব্যপরায়ণ নামে অভিহিত হইবার একটা

কৌশলমাত্র। যিনি যতই অধর্ম্মাচরণ করুন, যতই সমাজবিরোধী কার্য্য করুন, তিনি যদি বলেন তিনি বিশ্বাসানুরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য করিতেছেন—Conscienceএর মতে কার্য্য করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি আর নিন্দিত হয়েন না, প্রত্যুত তাঁহার প্রশংসায় দিগন্ত ফাটিয়া যায়। যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নশীল, তাঁহারা গোঁড়া ও মূর্খ বলিয়া নিন্দিত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা Conscienceএর দোহাই দিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন; তাঁহারা একান্ত কর্ত্তব্যানুরাগী বলিয়া প্রশংসিত হয়েন। শত অন্যায় করিয়াও যদি কেহ বলেন আমার Conscience যেরূপ বলে, তাহার বিরুদ্ধ কার্য্য আমি করিতে পারি না, তাহা হইলে তাঁহার শত খুন মাপ হইবে। স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইবার এরূপ সুযোগ আর কি হইতে পারে? এই Conscienceএর ধুয়া ধরিয়াই আজি কালি শিক্ষিত দল শাস্ত্রের, দেশাচারের, কুলাচারের এত বিরোধাচরণ ও যথেচ্ছাচার করিয়াও এত সম্ভ্রম লাভ করেন।

সমাজবাদ।

কেহ কেহ বলেন সমাজ মানবের উপাস্য দেবতা। সমাজরূপ বিরাট্‌পুরুষের উন্নতি ও স্থিতির জন্য মানবের সকল স্বার্থই বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। যেরূপ কার্য্য করিলে সমাজরূপ বিরাট্‌পুরুষের অনিষ্ট হয়, তাহাতে নিজের মহান্ উপকার সাধিত হইলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে, এবং যে কার্য্য করিলে সমাজের মঙ্গল হয়, তাহাতে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধন হইলেও কর্ত্তব্য। এই বিরাট্‌পুরুষের উপাসনা করিবার জন্য মানব স্বার্থত্যাগী ও কর্ত্তব্যানুরাগী হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রত্যেক সমাজই এক এক স্বতন্ত্র বিরাট্ পুরুষ? না, সমগ্র মানবমণ্ডলীর সমষ্টি বিরাট্‌পুরুষ? যদি আপন আপন সীমা-বিশিষ্ট সমাজই বিরাট্‌পুরুষ হয়, তবে তাহার কারণ কি, ও তাহার

সীমা কত দূর? কিরূপে সে সীমানিরূপণ হইবে? ভূমিবিশেষের সহিত সমাজের সম্বন্ধ? না, অবস্থাবিশেষের সহিত সমাজের সম্বন্ধ? এমন কি যুক্তি আছে যে, তাহার অবলম্বনে মানব তাহা বুঝিতে পারে? যখন তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই, তখন নির্দ্দিষ্ট সমাজের উন্নতিই যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও মানবের কর্ত্তব্য, তাহা কি প্রকারে বুঝা যায়? যদি সমগ্র মানবসমাজের সমষ্টি বিরাট্ পুরুষ হয়, তবে (patriotism) স্বদেশহিতৈষণা প্রধান নীতির মধ্যে পরিগণিত কেন? যাঁহাদের স্বদেশহিতৈষণা নাই, আধুনিক নীতিবিদেরা যে তাঁহাদিগকে মানুষের মধ্যেই পরিগণিত করেন না। যদি বল আত্মরক্ষার ন্যায় সমাজের রক্ষার অধিকার সকলেরই আছে, তাই স্বদেশহিতৈষণা প্রশংসনীয়। কিন্তু আত্মরক্ষা ও স্বার্থপরতা যেমন এক নহে, স্বদেশরক্ষা ও আধুনিক স্বদেশহিতৈষণাও সেইরূপ এক নহে। অন্যকৃত অযথা অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার নাম যেমন আত্মরক্ষা, সেইরূপ অন্যসমাজকৃত অযথা অত্যাচার হইতে স্বসমাজকে রক্ষা করার নাম সমাজরক্ষা। এক্ষণকার স্বদেশহিতৈষণা কি সেইরূপ? অন্যের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনার অযথা উন্নতির নাম যেমন স্বার্থপরতা, সেইরূপ অন্যসমাজের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া স্বসমাজের উন্নতি করাকেই কি স্বদেশহিতৈষণা কহে না? স্বদেশহিতৈষীরা কি অন্য দেশের হিতের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন? কোন্ স্বদেশহিতৈষী সমাজ স্বসমাজের উন্নতির জন্য অন্য সমাজের ধন অপহরণ ও বহুতর প্রাণীর প্রাণনাশ না করেন? য়ুরোপীয় সমাজ যে এত কল-কারখানা করিয়া স্বসমাজের উন্নতি করিতেছেন, তাঁহারা কি ভাবিতেছেন যে, তাঁহাদের এই কার্য্যের ফলে কত দেশের জনগণ জীবনবৃত্তির অভাবে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে? যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়া যদি তাঁহারা সমগ্র খণ্ডসমাজের জনগণকে শিখাইবার

চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরাট্ পুরুষের উন্নতি করা হইত। তাহা না করিয়া যখন কেবল নিজের ও নিজের সমাজের উন্নতির জন্য সে সকলের ব্যবহার হইতেছে, ও যাহাতে অন্য সমাজ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারে কায়মনো বাক্যে তাহার চেষ্টা হইতেছে, তখন তাহাকে স্বার্থপরতা ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ স্বদেশহিতৈষণাই যখন প্রধান নীতি, তখন আর সমগ্র মানবসমাজরূপ বিরাট্ পুরুষের উন্নতি আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবার কি হেতু আছে যে, তাই মানব সমাজের জন্য স্বার্থ নাশ করিবে? বস্তুতঃ ইহার অবলম্বনে মানব স্বার্থত্যাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না; সাধারণ জনগণের মনে এ ভাবের উদয়ই হইতে পারে না। ইহা শক্তিসম্পন্নগণের অযথা উন্নতিলাভের একটি ছলনা মাত্র। এই ধুয়া ধরিয়া সভ্য করিবার অছিলায়, ধার্ম্মিক করিবার অছিলায়, স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিবার অছিলায়, অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার অছিলায় প্রবল সমাজ দুর্ব্বল সমাজকে আপনাদের পদানত করেন ও পরিশেষে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া স্বসমাজের দলবদ্ধ শক্তিশালিগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধি করেন। ঐ সম্প্রদায়ের জনগণ 'জগতের উন্নতির ভার ঈশ্বর মানবের উপর দিয়াছেন' এই কথা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রচার করিয়া স্বার্থসাধনের পথ প্রশস্ত করেন। যদি ঈশ্বর সত্য সত্যই মানবের উপর জগৎ রক্ষার ভার দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাতে সকল মানবেরই তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা তিনি অবশ্যই করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া দিয়াই সে উপায় করিয়া দিয়াছেন। নচেৎ সেরূপ প্রবৃত্তি জন্মিবার ত আর কোন উপায় দেখা যায় না। অতএব যদি ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত নয় বল, তাহা হইলে তোমার ও স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃসিদ্ধই নহে; সম্পূর্ণ প্রমাণ বিরুদ্ধ। সুতরাং ইহার উপর স্থাপিত নীতি নীতিই নহে, কর্ত্তব্যও নহে।

হিতবাদ।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর মানবকে যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন, তৎসমস্তই যে প্রয়োজন সাধন জন্য দিয়াছেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লইতে হয়। সুতরাং যাহাতে সকল বৃত্তির পরিচালন হয়, তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। এমন করিয়া বৃত্তি সকলের পরিচালন করিতে হইবে, যেন কোনও বৃত্তি প্রবল ও অযথা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অন্য বৃত্তির শক্তি লোপ না করে। সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিলেই কর্ত্তব্য করা হইবে। অতএব যখন আমাদের স্বার্থপর ও পরার্থপর উভয়প্রকার বৃত্তি আছে, তখন যাহাতে স্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই সংরক্ষিত হয়, তাহাই মানবের কর্ত্তব্য; যে স্থলে স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলে পরার্থ রক্ষিত হয় না, বা পরার্থ রক্ষা করিতে গেলে স্বার্থ রক্ষিত হয় না, সেখানে যে কার্য্য করিলে অধিকাংশ লোকের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, তাহাই নীতিসম্মত কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? কোন্ যুক্তিবলে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ লোকের হিতের জন্য নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে? কিসে বুঝিব যে, ঈশ্বরের ঐরূপ অভিপ্রায়? যখন মানুষের প্রণীত বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বসনীয় নয়, তখন কোন মানুষের কথা বিশ্বাস করিয়া এ কথা সত্য মনে করিতে পারা যায়। যুক্তি অনুসারে চলিলে বিপরীতই সপ্রমাণ হয়—যুক্তি অনুসারে স্বার্থসাধনই মুখ্য কর্ত্তব্য বোধ হয়। কেননা যখন ঈশ্বর মানবহৃদয়ে পরার্থপর বৃত্তিগুলির অপেক্ষা স্বার্থপর বৃত্তিগুলি প্রবল করিয়াছেন, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে, যেখানে পরার্থ রক্ষা করিলে স্বার্থের হানি না হয়, কেবল সেইখানেই পরার্থ রক্ষা তাঁহার অভিপ্রেত; যেখানে স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ হইবে, সেখানে স্বার্থসংরক্ষণই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে স্থলে বৃত্তি-

গণের মধ্যে কোন বিরোধ জন্মে না, যে স্থলে স্বার্থপর বৃত্তি যেমন স্বার্থ সংরক্ষণ করে, পরার্থপর বৃত্তিও সেইরূপ পরার্থ সংরক্ষণ করে, সেই স্থলেই পরার্থসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত; যে স্থলে বিরোধ ঘটিবে, সে স্থলে প্রবল স্বার্থপর বৃত্তিরই পরতন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ স্বার্থসাধনী বৃত্তিগুলিকে প্রবল করিবার উদ্দেশ্য কি? অবশ্যই বলিতে হইবে নিজের অনিষ্টে বাধা দিবার জন্যই ঈশ্বর সে সকলকে প্রবল করিয়াছেন। সুতরাং পাশ্চাত্য হিতবাদ দর্শনের যুক্তি অনুসারে স্বার্থবিরোধী কার্য্য কর্ত্তব্যই নহে। হইলেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ বৃত্তিসামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিলে সকলের দ্বারা সমানরূপ কার্য্য হয় না। কেননা সকলের সকল বৃত্তি সমান নহে; ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে বৃত্তিবিশেষ অতিশয় প্রবল ও বৃত্তি বিশেষ অতিশয় দুর্ব্বল, এবং কাহারও হৃদয়ে কোনও বৃত্তিই সেরূপ প্রবল নহে। সুতরাং সকলের কৃত সামঞ্জস্য সমানরূপ হইতে পারে না, কর্ত্তব্যও সকলের একরূপ হইতে পারে না। যাঁহার ক্রোধ দশ, ক্ষমা এক, তাঁহার সামঞ্জস্যে ক্ষমার মাত্রা অল্প বাড়িবে, এবং ক্রোধের মাত্রা অল্প কমিবে, কাযেই তাঁহার পক্ষে ক্রোধপরায়ণ হওয়াই কর্ত্তব্য। ঐরূপ যাঁহার ক্ষমা দশ, ক্রোধ এক, তাঁহার পক্ষে ক্ষমাপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্নরূপ কর্ত্তব্য হইবে। সুতরাং সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নীতিশাস্ত্র হইতে পারে না; লোকে নীতিমার্গের অনুসরণে চলিতেছে কি না, তাহাও লোকে বুঝিতে পারিবে না। যদি বল এরূপ সামঞ্জস্য হইবে না, সকলকেই সমান-রূপ গুণবিশিষ্ট হইতে হইবে, তাহা অসম্ভব। এরূপ সামঞ্জস্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এবং তাহা হইলে কেহই উচ্চ গুণশালী হইতে পারিবে না,—কেহই বীরাগ্রগণ্য, দানশৌণ্ড, ক্ষমাপর প্রভৃতি হইতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের এরূপ অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে কখনই তিনি

মানবগণকে ভিন্ন ভিন্নরূপ গুণশালী করিতেন না। সকলকেই সমান গুণ সম্পন্ন করিতেন।

এ জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই, যাহা দ্বারা কখনও হিত সাধিত হয় না। অনেক সময়ে সত্য অপেক্ষা মিথ্যার প্রয়োগে সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়। বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বিনয় দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, শান্তি, সমদৃষ্টি, পরার্থপরতা প্রভৃতি গুণের অবলম্বনে সমাজের ও জগতের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হয়; এবং অনেক সময়ে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরপীড়ন, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নীতিবিরুদ্ধ গুণ সকল সমাজের বিলক্ষণ হিতকারক হয়। এই জন্য এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস, নীতিমার্গের অযথা অনু-সরণই ভারতের ঈদৃশ অবনতির কারণ। ভারতবাসী অল্পে সন্তুষ্ট, ভারতবাসীর তেজ নাই, প্রতিশোধস্পৃহা নাই, ভারতবাসী ক্ষমা ও ধৈর্য্যশালী, দানধ্যানে সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন ইত্যাদি কারণে যে ভারতের অবনতি হইয়াছে, এ বিশ্বাস এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং সেই জন্য অনেকে মদ্য মাংসাদি ভোজন দ্বারা ভারত-বাসীর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার পরামর্শ দিতেছেন। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহারও প্রধান কারণ ঐ। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, অমুক অমুক গুণের পরিচালনা করিলেই নীতিসম্মত কার্য্য করা হইবে। যখন মিথ্যা, চৌর্য্য, প্রতারণা, নরহত্যা, সকল উপায়েই বহুতর লোকের হিত সাধিত হয়, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে কোনও কর্ম্মই এককালে অকর্ত্তব্য নয়। সুতরাং কখনও মিথ্যা বলিবে না, কখনও পরানিষ্ট করিবে না প্রভৃতি বাঁধাবাঁধি হইতে নীতি পারে না। তাহা হইলে নীতিশাস্ত্রের মূল কথা এই হইবে যে, এমন বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইবে, যাহাতে হিতের ভাগ অধিক হয়—যে স্থলে অল্প লোকের অনিষ্ট করিলে অধিক লোকের

হিত হয় তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে কি প্রকারে নিজে নিজে এরূপে হিতাহিতের তৌল করিবে? কতলোকের হিত হইবে, কতলোকের অহিত হইবে, তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? সাধারণ লোক দূরে থাকুক, অতি বুদ্ধিমান্ সুপণ্ডিত ব্যক্তিও এরূপে তৌল করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে পারেন না। অতএব তাহা হইলে অন্ততঃ তৌল করিবার একটা উপায় চাই, একটা মাপকাটী থাকা চাই। যদি ধর্ম্মশাস্ত্রকৃত মাপকাটী বিশ্বসনীয় না হয় তবে এ মাপকাটী কে বাঁধিয়া দিবে? তোমার মাপকাটী আমি গ্রহণ করিব কেন? তুমিও ত আমাদেরই একজন মানুষ; কিসে বুঝিব তুমি যে মাপকাটী করিয়াছ, তাহাই ঠিক। সুতরাং হিতবাদ দর্শনের মতেও মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না। এই মতের ধুয়া ধরিয়া শক্তিসম্পন্নগণ শক্তিশূন্যগণকে তাঁহাদের হিতজনক কার্য্যে প্রবৃত্তি দেন মাত্র।

এইরূপে দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নীতিশাস্ত্রের যৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা প্রদর্শন করেন, তৎসমস্তই ভ্রান্তিসঙ্কুল। নীতিপথের অনুসরণ করা যে মানবের duty (কর্ত্তব্য), কোনও যুক্তিই তাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। নীতিপথের অনুসরণ করিলে পরকালের মঙ্গল হয়, এ কথা সপ্রমাণ ত হয়ই না; ইহকালের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে, তাহাও সপ্রমাণ হয় না। কারণ অনেক সময়েই দেখা যায়, কত লোক নীতিসম্মত কার্য্য করিয়া দুঃখ পায় এবং কত লোক নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া সুখী হয়। একজন ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া সেই ধন লুক্কায়িত রাখিয়া ইনসল্‌ভেণ্ট আইনের সাহায্য লইয়া সমস্ত মহাজনকে ফাঁকি দিলেন ও শেষে সেই লুক্কায়িত ধন বাহির করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিলেন, পরে সমাজেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। সেই ধন দ্বারা দেশেরও প্রভূত উপকার হইল। আর একজন প্রকৃত

প্রস্তাবে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মহাজনের দেনা পরিশোধের জন্য গৃহ সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিলেন ও ধনাভাবে চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, পুত্রকন্যাগণকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিলেন। দরিদ্র বলিয়া সমাজে শেষে তিনি এত ঘৃণিত হইলেন যে, সকলেই তাঁহার নামে মুখ-বিকৃতি করে! হয় ত অভাবে পড়িয়া শেষে দস্যু তস্কর হইলেন। একজন নানা মিথ্যাদির অবলম্বনে মোকর্দ্দমা করিয়া নরহত্যাকারী পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন ও কালে সেই পুত্র বহু উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে সুখী করিল এবং সমাজের যথেষ্ট মঙ্গল তাহার দ্বারা হইল। আর একজন মিথ্যা বলার ভয়ে নির্দ্দোষ গুণবান্ পুত্রের বিরুদ্ধে এমন সাক্ষ্য দিলেন যে, তাহা নরহত্যা প্রমাণের পোষকস্বরূপ হইয়া পুত্রের প্রাণনাশের কারণ হইল। সেই সাধু উপার্জ্জনকারী পুত্রের মৃত্যুতে তিনি একেবারে অধঃপাতে গেলেন, সমাজেরও সমূহ ক্ষতি হইল। এইরূপে শত শত ব্যক্তি নীতিপরায়ণ হইয়া দুঃখ পাইতেছে এবং কতলোক দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া সুখী হইতেছে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে নীতিপরায়ণ হইবার জন্য আগ্রহ জন্মিবার যখন কোন কারণই দেখা যায় না, তখন নীতি-শাস্ত্রের ধর্ম্মশাস্ত্রত্যাগীদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার সম্ভাবনা কোথায়?

স্বার্থসাধনই নীতিপরায়ণতার উদ্দেশ্য।

তবে কি নীতিপরায়ণ হইলে কোনও ফল নাই? অবশ্যই আছে। উহা একপ্রকার বিদ্যা-বিশেষ। যাঁহার যেমন শক্তি, যেমন সুযোগ, ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার সেইরূপ কার্য্যসুবিধা হয়। ইহার অপর নাম Policy। নীতিশাস্ত্রের মতে যে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়, তাহার কারণ এই যে, যে সত্য বলে, তাহার কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হয়। উপার্জ্জন করিতে হইলে—উন্নতি লাভ করিতে হইলে বিশেষরূপ সতর্ক হইতে হয়। কেননা পরের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করার নামই উন্নতি বা উপার্জ্জন।

মানুষ পরের লইয়াই ধনী, পরসমাজকে দলিত করিয়াই স্বসমাজের উন্নতি। একটী গল্প প্রচলিত আছে—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ভক্তি-সহকারে গঙ্গাতীরে বসিয়া শিবপূজা করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ পূজা করি-তেছেন, এমন সময়ে শিবদুর্গা সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে দুর্গা শিবকে কহিলেন, তোমার এই ভক্ত বড় দরিদ্র, ইহাকে কিছু ধন দাওনা কেন? শিব 'আচ্ছা দিব' বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই ঘাটে প্রভূত-ধনশালী এক বণিক্ স্নান করিতেছিলেন, তিনি শিবদুর্গার এই কথোপকথন শুনিয়া 'শিব যখন ধনদান করিবেন, তখন অবশ্যই সে ধন প্রচুর হইবে অতএব কৌশলে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহার অংশ লওয়া আবশ্যক' বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন—তুমি যে ধন পাইবে, তাহার অর্দ্ধেক যদি আমাকে দিতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমার ধনের অর্দ্ধেক এখনই তোমাকে দিব। ব্রাহ্মণ সেই কথায় সম্মতি প্রদান করিলে বণিক্ তাঁহার সমস্ত ধনের অর্দ্ধাংশ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিল। তাহার কিছুদিন পরে পার্ব্বতী শিবকে কহিলেন, তুমি যে ব্রাহ্মণকে ধন দিবে কহিয়াছিলে তাহা দিলে কৈ? শিব কহিলেন—কেন সেই দিনই ত দিয়াছি। অমুক বণিক্ তাহার অর্দ্ধেক ধন ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়াছে। পার্ব্বতী কহিলেন—সে ধন ত সেই বণিক্ দিয়াছে, তুমি দিলে কৈ? শিব কহিলেন—আমার আবার ধন কোথায়? আমি রামের ধন শ্যামকে দিই, আবার শ্যামের ধন রামকে দিই। বস্তুতঃ কথাই তাই; একজনের ধন আর একজনে লইয়া ধনী হয় অথবা দশ জনের কিছুকিছু লইয়া লোকে ধনী হয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চাকরী, ডাক্তারী, ওকালতী প্রভৃতি যে কোন উপায়ে লোকে অর্থ সঞ্চয় করে, সমস্তই পরের লইয়া। এক জনের জমীদারী বিক্রয় হইলে আর একজন তাহা লইয়া জমীদার হয়, এক জনের চাকরী গেলে আর একজন সেই চাকরী পায়। কৃষি শিল্প বাণিজ্যে যে অধিক লাভ করে, সে দশজনের অর্থ গ্রহণ করে। অধিক কি,

খনি আদি হইতে নূতন অর্থ উৎপন্ন করিয়া যিনি ধনী হয়েন, তিনিও দশ জনকে বঞ্চিত করেন। এই বঞ্চনা করিবার কৌশলের নামই নীতি। এমন কৌশলে কার্য্য করিতে হইবে যে, যে সকল লোককে বঞ্চনা করিতে হইবে, তাহারা স্বার্থপর মনে করিয়া অবিশ্বাস না করে; প্রত্যুত পরহিতৈষী জ্ঞানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। সেই Policyর নামই নীতি।

গরু যখন কাহারও ক্ষেত্রে শস্য ভক্ষণ করিতে যায়, সে এমন ভাবে যায়, যেন শস্যস্বামী জানিতে না পারে। জানিতে পারিলে খাইতে পাইবে না, অধিকন্তু প্রহারবেদনা সহ্য করিতে হইবে, ইহা যেমন গরুর নৈতিক জ্ঞান; বিড়াল যেমন পাতের কাছে বসিয়া নীতি-মার্গের অনুসরণ করিয়া খাদ্য অপহরণের সুযোগ অন্বেষণ করে, বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করে না; মনুষ্যও সেইরূপ নীতিপরায়ণ হইয়া স্বার্থ-সাধনের সুযোগ দেখেন। পূর্ব্বে দোকানদারেরা যে দ্রব্যের মূল্য ১৲ টাকা, তাহার পাঁচ টাকা মূল্য বলিত, এবং এত দিয়া কিনি-য়াছি, সামান্য দুই চারি আনা মাত্র লাভ করিতেছি ইত্যাদি নানা মিথ্যা কথা বলিয়া ক্রেতৃগণের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টা করিত; কিন্তু এইরূপ করিতে করিতে সকলে জানিল দোকানদারেরা মিথ্যা কথা বলে; সুতরাং ক্রেতৃগণ আসল মূল্য অপেক্ষাও কম মূল্য বলিতে আরম্ভ করিল। তখন পরস্পর দর কসাকসি হইতে লাগিল। কাজেই আর দোকানদারের সুবিধা হইত না। কখন কখন কিছু অধিক লাভ হইলেও অনেক সময়েই ক্ষতি হইত। কিন্তু সাহেব-দের দোকানে সেরূপ দর কসাকসি হয় না, তাঁহারা একদরে বিক্রয় করেন; তাহাতে তাঁহাদের নীতিপরায়ণতার প্রশংসা ধরে না, লাভও যথেষ্ট হয়। নীতিবর্জ্জিত দোকানদারের ভাগ্যে টাকায় দুই আনা লাভ ঘটে কি না সন্দেহ; কিন্তু নীতিমান্ সাহেব দোকানদারেরা অনেকে

টাকায় টাকা লাভ করেন; বেশী ভিন্ন কম নয়। কাজেই তাঁহা-দের দেখাদেখি এক্ষণে আমাদের দেশীয়গণও নীতিপরায়ণ হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ডাক্তারগণ নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া ফি আদায় করিতেন বলিয়া বড়ই নিন্দনীয় ছিলেন। এক্ষণে অনেক ডাক্তারই দয়ার সাগর হইয়াছেন। অনেকেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যে সকল রোগী তাঁহাদের বাটীতে আসিবেন, তাঁহাদের নিকট ফি লইবেন না। তদনুসারে শত শত রোগী তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া ব্যবস্থা ও তাঁহার ঔষধালয় হইতে ঔষধ লয়। ঐ ঔষধ বিক্রয় করিয়া ডাক্তারের যে লাভ হয়, সমস্ত দিন ঘুরিলেও তাহা হয় না। পাছে রোগী অন্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ লয়, বা ঘরে ঔষধ তৈয়ারি করে, সেই ভয়ে কোন কোন ডাক্তার নিজ বাটীতে একটী ঘরে ঔষধ রাখিয়া দেন, ব্যবস্থা-পত্রগুলি তাঁহার কর্ম্ম-চারীর হাতেই দেন, রোগীর হাতে দেন না। কেহ বা এমন সঙ্কেতে ব্যবস্থা লেখেন যে, অন্য কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। এইরূপ নীতিপরায়ণ হইয়া তাঁহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন, সুনামও যথেষ্ট হয় এবং অনেক রোগীর চিকিৎসার সুযোগ পাইয়া কালে সুচিকিৎসক রূপে সাধারণের পরিচিত হয়েন; তখন তাঁহাদের আদরও বাড়িয়া যায়।

তুমি একটি টাকা ভুল ক্রমে আমার বাটীতে ফেলিয়া গেলে, আমি তাহা তোমাকে ডাকিয়া দিলাম; আমার পুত্র তোমার বৃক্ষ হইতে গোপনে আম্র পাড়িয়া আনিয়াছে, আমি তাহা তাহার নিকট হইতে লইয়া তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম; তোমার পুত্র আমার বাড়ী আসিয়া আমার বিস্তর ক্ষতি করিলেও তজ্জন্য তাহাকে কিছু বলা দূরে থাকুক, ঘর হইতে তাহাকে কিছু খাইতে দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম। তোমাকে তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলিলাম না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে তুমি জানিতে পার এমন কৌশল করিলাম। আমার উপর তোমার বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিল। আমি যে পরম সাধু, বিলক্ষণ ক্ষমাপর, সত্যবাদী, সম্পূর্ণ

আমি সুযোগ পাইয়া তোমায় সর্ব্বস্বান্ত করিলাম। নীতির অনুসরণে এইরূপে আপন আপন কার্য্যের সুবিধার জন্য লোকে সত্য-বাদী, পরোপকারী প্রভৃতি হইয়া থাকে। পাছে আমার উদাহরণ দেখিয়া আমার পুত্র আমাকে খাইতে না দেয় অথবা লোকসমাজে নিন্দা হয়, সেই ভয়ে আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণে যত্ন করিতে পারি; কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি করিতে পারি না। পিতা যদি বিলক্ষণ পণ্ডিত ও গুণসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে সেই গুণাদির জন্য লোকে অন্যকে যেমন ভক্তি করে, পিতাকে সেরূপ ভক্তি করিতে পারে বটে; কিন্তু কোন নীতিপরায়ণ পুত্র কর্ত্তব্য ভাবিয়া গুণহীন পিতাকে ভক্তি করিতে পারেন না, প্রত্যুত অনেক কৃতী পুত্র পিতারই ভক্তিভাজন হইতে ইচ্ছা করেন। ঐরূপ স্বার্থসাধনো-দ্দেশে ভ্রাতৃস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি জন্মিতে পারিলেও গুণ-হীন সহোদর ও গুণহীনা পত্নী প্রভৃতিকে কর্ত্তব্য ভাবিয়া কেহ ভালবাসিতে পারেন না। স্বার্থের অনুরোধে প্রতিবেশী, স্বজন ও স্বদেশবাসীর হিত সাধন করিতে পারেন বটে; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনু-রোধে পরের বা মানবসাধারণের হিত করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। মৃত্যুকালে একজন তাঁহার বিদেশস্থিত পুত্রের জন্য কোন বন্ধুর নিকট বহুতর ধন রাখিয়া গেলেন, কোন ব্যক্তিই তাহা জানে না। বন্ধুর অবস্থা ভাল নয়, ঐ ধন পাইলে তাঁহার অনেক অভাব দূর হয়। সে বন্ধু নীতিশাস্ত্রের কোন্ যুক্তি অনুসারে বুঝিবেন যে, সেই ধন দ্বারা আপনার দুঃখ নিবারণ না করিয়া মৃত ব্যক্তির পুত্রকে দেওয়া কর্ত্তব্য? না দিলে নীতিশাস্ত্রের মতে তাঁহার এমন কি অনিষ্টের সম্ভাবনা যে, সেই ভয়ে আপনার এমন সুবিধা ত্যাগ করিবেন? বস্তুতঃ নীতিশাস্ত্রমাত্রপরায়ণ হইয়া দান, ধ্যান, পরোপকার প্রভৃতি যতই হিতকর কার্য্য করা হউক, স্বার্থসাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। পরদার-

হরণ করিলে ও বেশ্যাপরায়ণ হইলে নানা অনিষ্টসম্ভাবনা আছে বলিয়া অকর্ত্তব্য হইতে পারে; কিন্তু যে পরনারী সম্মত হইয়া ব্যভিচার করিতে প্রস্তুত, সে রমণীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিলে কি দোষ, তাহা হিতবাদী, উন্নতিবাদী বা সাম্যবাদী বুঝিবেন কি প্রকারে? পরের অনিষ্ট করিলে অনেক সময়ে অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া উহা অকর্ত্তব্য হইতে পারে; কিন্তু পরের উপকার না করিলে নীতিবাদীর মতে কি দোষ হয়? মিথ্যা বলিয়া পরের অনিষ্ট করা অকর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু সত্যের অনুরোধে নিজের অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য কোন্ যুক্তির অনুমোদিত? পরের ধন অপহরণ করিয়া আমোদ করা অকর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি নিজের অতুল সম্পত্তি কেবল নিজেরই ভোগসুখে ব্যয় করি, পরের জন্য কিছুই ব্যয় না করি, তাহা হইলে নীতিবাদীর মতে আমার অকর্ত্তব্য করা হইবে কেন? নীতিবাদীরা এ সকলের কারণ ত কিছুই দেখাইতে পারেন না। সুতরাং যদি বাস্তবিকই লোকে নীতিপথের অনুসরণ করাকে কর্ত্তব্য মনে করে, তাহা হইলে বড় জোর এই হইতে পারে যে, লোকে পরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে না। যে সকল মিথ্যাদির প্রয়োগে পরের অনিষ্ট হয় তাহাই করিবে না। পরের উপকারের জন্য আপনার সুখের অল্পতা করিবে কেন? যে অর্থব্যয়ে রাজা রায়বাহাদুর প্রভৃতি খ্যাতিলাভ করিয়া সম্মানিত হওয়া যায়, সে অর্থ পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি পরহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবে কেন? যে অর্থ ব্যয় করিলে উত্তম অট্টালিকায় বাস, সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান, রসনা তৃপ্তিকর বিবিধ ভোজ্য ভোজন, রূপযৌবনসম্পন্না বিলাসিনী কামিনীগণে বেষ্টিত হইয়া নূতন নূতন আমোদ উপভোগ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল থাকা যায়, সে অর্থ দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যয় করিবেন কেন?

নীতিবাদিগণের মতে কি প্রকৃত মনুষ্য হইতে হইতে হইলে পরদুঃখ

নিবারণ জন্য স্বার্থত্যাগ আবশ্যক নহে? কেবল অপকর্ম্ম ত্যাগ করিলেই কর্ত্তব্য করা হয়, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না? ঈশ্বরের ভক্ত হওয়া আবশ্যক নহে? ঐহিক ও সামাজিক উন্নতি করিতে পারিলেই মানবীয় কর্ত্তব্য করা হইল? আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন নাই? তাহা যদি না হয় তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর তাঁহাদের এরূপ বিষদৃষ্টি কেন? যে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস থাকায় কি ইতর, কি ভদ্র, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই কর্ত্তব্যসাধন জন্য শত শত স্বার্থ বলি দিতেছে—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে, তাহার প্রতি এত অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে কেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল কি নীতির বিরোধী? ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে মানব যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে, সে সকল দ্বারা কি লোকের ও মানবসমাজের ঐহিক মঙ্গল সাধিত হয় না? ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি পালন করিলে, সাম্য-স্বাধীনতাবাদীরা যে যে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান উচিত বলেন, সামাজিক উন্নতিবাদীরা যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য বোধ করেন, হিতবাদদর্শনপরায়ণেরা যে যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলেন, অন্তঃসংজ্ঞাবাদীরা যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলেন, অধিক কি আত্মোন্নতি-বাদীরা যে সকলকে কর্ত্তব্য বলেন, সে সকল কার্য্য কি সম্পন্ন হয় না? নীতিশাস্ত্র কি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত নহে? যদি হয়, তবে কর্ত্তব্যপালনই যে নীতিবিদ্‌গণের মতে মানবের মানবত্বসম্পাদনের হেতু, কেন সেই নীতিপরায়ণগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উৎপাদনের এত চেষ্টা করিতেছেন? কেন তাঁহাদের মতে ধর্ম্মশাস্ত্র মানবের অবলম্বনীয় নয়? যে বিশ্বাসের আশ্রয় ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যানুরাগ জন্মে না, প্রাকৃতিক পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনা কমাইতে পারা যায় না, কেন সে বিশ্বাসের ধ্বংস করিতেছেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা নহে।

নীতিবাদীরা হয় ত বলিবেন ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিবিরুদ্ধ না হইলেও—ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দ্বারা অশেষ উপকার সাধিত হইলেও উহা মিথ্যাবাক্যে পরিপূর্ণ। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে ধর্ম্মশাস্ত্র অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরপ্রণীত। কিন্তু বস্তুতঃ ঈশ্বর কখনই কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। অমুক কর্ম্ম করিলে এতকাল স্বর্গে বাস হইবে, অমুক্ কর্ম্ম করিলে এতকাল নরকে বাস হইবে ইত্যাদি যে সকল ফলশ্রুতি ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, তৎসমস্তও মিথ্যা—স্বর্গ নরকই মিথ্যা। ধর্ম্মশাস্ত্র শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতিকে যে ঈশ্বর বলিতেছেন, তাহাও মিথ্যা, তাঁহারা বাস্তবিক ঈশ্বর নহেন। এইরূপ শত শত মিথ্যাবাক্যে ধর্ম্ম-শাস্ত্র পরিপূর্ণ। এই সকল মিথ্যার প্রশ্রয় দিলে কি মিথ্যারই গৌরব বাড়িয়া যাইবে না? ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে সত্য সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ "ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ"। অতএব যে ধর্ম্মশাস্ত্র সনাতন সত্যের বিরোধী, তাহা শতপ্রকার ফলপ্রসূ হইলেও অবলম্বনীয় নহে।

নীতিবাদীদিগের এই সকল কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত, সত্য নির্ণয়ের শক্তি আমাদের কতটুকু। এ বিশ্বের কোন্ সত্য আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়? আমরা যাহাকে সত্য বলি, তাহার কোন্‌টী প্রকৃত সত্য? বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা যে সকল সত্য নিরূপিত হয়, তাহার কয়টী প্রকৃত সত্য? যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই ত বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকেরা যে সকলকে সত্য বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলেন, তাহার অনেক কথা এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

ঐরূপ এক্ষণে যাহা সত্য বলিয়া স্থির হইতেছে, তাহাও কালে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন হইবে। বস্তুতঃ সত্য মানুষের গোচরীভূত নহে। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে, ঈশ্বর ভিন্ন সত্যজ্ঞানের শক্তিও আর কাহারও নাই। সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরই যখন আমাদের গোচরীভূত নহেন, তখন আমাদের সত্যজ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? এই জগৎই যে সত্য, আমি আছি ইহাই যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? অনেক দর্শনেরই মতে যে জগৎ মিথ্যা, আমরা ছায়াবাজির পুতুলমাত্র। যখন জগৎই মিথ্যা, আমরাই মিথ্যা, তখন আমরা সত্যের আশ্রয় কি প্রকারে গ্রহণ করিব? মিথ্যা জগতে সমস্তই ত মিথ্যা, তবে আর কি প্রকারে বলি আমরা মিথ্যার আশ্রয় আদৌ গ্রহণ করিব না? বস্তুতঃ প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের শক্তি মানবের নাই বলিলেই হয়। আমরা যাহা অনুভব করি, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা বা আপেক্ষিক সত্য।

যাউক এ গুরুতর কথা। সত্য নির্ণয়ের শক্তি আমাদের না থাকিলেও যখন আমরা সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করি, এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করি, তখন সে তর্কের আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর যে নিশ্চয়ই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই, এবং নিশ্চয়ই যে স্বর্গ নরক নাই, তাহা তুমি জানিলে কি প্রকারে? কিসে তুমি বুঝিলে কোন মিথ্যাবাদী স্বার্থপর ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া স্বার্থসাধনোদ্দেশে উহাকে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? কেহ কি উহার সাক্ষী আছেন? না, কেহ এমন কোন অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন যে, তদ্দ্বারা নিশ্চয় বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বরের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করা একান্ত অসম্ভব? ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবার শক্তি ঈশ্বরের থাকা অসম্ভব? না, সুখ, দুঃখ, দণ্ড ও পুরস্কারাদি দেওয়া, দয়া নিগ্রহাদি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব? কি প্রকারে তুমি জানিলে কালী দুর্গা প্রভৃতির ন্যায় রূপ ঈশ্বরের হইতে পারে না? যখন এ সকল বিষয় কোনও কালে কাহারও

প্রত্যক্ষ হইবার নহে, তখন তুমি কি প্রকারে বল ঐ সকল নিশ্চয়ই মিথ্যা? যদি বল যাঁহারা এই সকল কথা বলেন, তাঁহারা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন না, ঈশ্বরকে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে দেখিয়াছেন এমন কথা যখন কেহ বলিতে পারেন না, এবং যখন কেহ এমন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন না, যাহার বলে ঐ সকলকে নিশ্চয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তখন তাহাকে সত্য বলিব কি প্রকারে?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রমাণ বুঝিবার শক্তি তোমার আমার কতদূর আছে? কোন্ প্রমাণ গ্রহণীয়, কোন্ প্রমাণের বল কত, তাহা তুমি আমি কতটুকু বুঝিতে পারি? বুঝিবার সে শক্তি যদি না থাকে, তবে প্রমাণ আছে কি না তাহা তুমি বুঝিলে কি প্রকারে? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবেই বা কে? ঈশ্বরের কৃত কার্য্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানুষে দিবে কি প্রকারে? মনে কর, ঈশ্বর যে সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়াছিলেন, তখন হয় ত মানুষের সৃষ্টিই হয় নাই, অথবা মানুষে দেখিতে না পায় এই প্রকারে তিনি তাহা লিখিয়া থাকেন; মানুষ তাহার সাক্ষ্য দিবে কি প্রকারে? মানুষ স্বয়ং দেখে নাই বলিয়া যদি ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত নয় বলিতে হয়, তবে এই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি যে ঈশ্বরের কৃত, তাহা মানুষ বলে কেন? কেহ কি ঈশ্বরকে বিশ্বরচনা করিতে দেখিয়াছেন? যাহা দেখি নাই ও যাহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে বিশ্ব ঈশ্বরের কৃত এ কথা বলিলেও মিথ্যা কথা বলা হয়, ঈশ্বর আছেন বলিলেই মিথ্যা বলা হয়। এবং তাহা হইলে কোনও পুত্রই তাঁহার পিতাকে পিতা বলিতে পারেন না। পিতার নাম যিনিই বলেন, তিনিই মিথ্যা বলেন।

এ গুরুতর কথারও আলোচনা করিতে চাহি না। ঈশ্বর আছেন, পাপপুণ্য আছে ইত্যাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানুষ দিতে পারে কি না তাহার আলোচনা করিতে চাহি না। যাঁহারা ঈশ্বরকে কখনও দেখেন

নাই বলিয়া ঈশ্বর মিথ্যা বলেন, পরকাল দেখেন নাই বলিয়া পরকাল মিথ্যা বলেন, সেই নাস্তিকগণ ধর্ম্মশাস্ত্রকে মিথ্যা বলেন, বলুন; তাঁহাদের সহিত তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত নাস্তিকই মানবসমাজে নাই। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে না দেখিয়াও ঈশ্বর স্বীকার করেন, যাঁহারা পাপপুণ্যের ফল প্রত্যক্ষ না করিয়াও পাপপুণ্যের অস্তিত্ব ও তাহার অনুরূপ দণ্ডপুরস্কারের কথা স্বীকার করেন, যাঁহারা পরকালের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ না করিয়াও পরকাল স্বীকার করেন ও ইহকালের কৃতকার্য্যের ফল পরকালে পাইতে হয় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে প্রত্যক্ষ করেন নাই বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্বর্গনরকাদি মিথ্যা বলিবেন? ভাল কার্য্য করিলে যদি পরকালে সুখ ও মন্দ কার্য্য করিলে যদি পরকালে যন্ত্রণা পাইতে হয় স্বীকার করা যায়, তবে স্বর্গ নরক স্বীকার করার বাধা কি? যখন সুখভোগের স্থানের নামই স্বর্গ ও দুঃখভোগের স্থানের নামই নরক, তখন তাহা মিথ্যা হইবার হেতু কি? বস্তুতঃ স্বর্গ, নরক ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি মিথ্যা, এ কথা নাস্তিক ভিন্ন কোন মনুষ্যেরই বলিবার অধিকার নাই।

ঐরূপ, ঈশ্বরের রূপ যে শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী প্রভৃতির ন্যায় হইতে পারে না, এ কথাও নাস্তিক ভিন্ন আর কাহারও বলিবার অধিকার নাই। কেহ যখন ঈশ্বরকে দেখেন নাই, তখন তাঁহার আকার কিরূপ তাহা জানিবেন কি প্রকারে যে, বলিবেন ওরূপ আকৃতি তাঁহার নয়। যিনি রামকে দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট যদি হরি রামনামে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি বলিতে পারেন ইনি রাম নহেন। কিন্তু যিনি কখন রামকে ও হরিকে দেখেন নাই, তিনি কি প্রকারে বলিবেন ইনি রাম বা হরি নহেন? তিনি ইহাই বলিতে পারেন আমি ইঁহাকে রাম বা হরি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু ইনি যে রাম বা হরি নহেন, এ কথা বলিবার অধিকার তাঁহার নাই। ঐরূপ, যাঁহারা

ঈশ্বরকে দেখেন নাই, তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না যে, কালী, দুর্গা প্রভৃতি ঈশ্বরের রূপ নহে। তাঁহার কোন আকৃতি আমরা দেখিতে পাই না বলিয়াই যে, তাঁহাকে নিরাকার বলিতে হইবে, তাহারই বা অর্থ কি? আমরা বিশ্বের সমস্ত পদার্থই কি দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না বলিয়া তাঁহার রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করিব না? চক্ষু ও যন্ত্রাদির অগোচর যে সকল নক্ষত্রমণ্ডল আছে, তাহাদের কি রূপ নাই বলিতে হইবে? ঈশ্বর যদি সেইরূপ দূর-তর প্রদেশ কৈলাস, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে থাকেন, তাঁহাকে দেখিব কি প্রকারে? কিংবা তিনি বিশেষ সাধনা ব্যতীত দেখা দেন না, ইহাও ত হইতে পারে। ইহা যে হইতে পারেই না, তাহার এমন কি প্রমাণ আছে? অতএব তাঁহার আকার যে নাই বা হইতে পারে না, এ কথা বলিবার অধিকারই আমাদের নাই। এমন অকাট্য যুক্তি বা প্রমাণ কি আছে যে, তদনুসারে আমরা বলিতে পারি তাঁহার দেহ থাকিতে পারে না? যখন আমরা বলিতেছি তাঁহার দয়া আছে, ভাল-বাসা আছে, শাসন করা আছে, পুরস্কার দেওয়া আছে, তখন তাঁহার দেহ থাকাই ত সম্ভব। কোনরূপ দেহ নাই অথচ গুণাবলী আছে, এরূপ শুদ্ধ চৈতন্যের সত্তা কোথায় উপলব্ধি করিয়াছি যে, তদনুসারে তাঁহাকে কেবল গুণময় বলিব!

তিনি যখন কার্য্য করেন—সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তখন তাহাতে যে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই বা তাহাতে তিনি কোনরূপ সুখ পান না, একথা বলিবারই বা আমাদের অধিকার কি? আমরা কি এমন কিছু কখনও দেখিয়াছি যে, তাহার কার্য্য আছে অথচ কোনও উদ্দেশ্য নাই? এরূপ কিছু যদি আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির গোচর না হইয়া থাকে, তবে কোন্ যুক্তিতে, কোন্ প্রমাণের বলে, কোন্ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা বলিব ঈশ্বর কার্য্য করেন অথচ তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই? যখন

জড় পদার্থ ভিন্ন আর কাহাকেই বিনা উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে দেখিতে পাই না, তখন যদি আমরা বলি ঈশ্বর কার্য্য করেন অথচ তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে জড় ভিন্ন অন্য কিছু বলিবার আমাদের অধিকারই নাই। সেই জন্যই নাস্তিকেরা বুদ্ধিসম্পন্ন ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন না। কিন্তু আস্তিকগণ ত ঈশ্বরকে জড়বৎ মনে করেন না; প্রত্যুত তাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, দয়া প্রভৃতিরই আধার মনে করেন। তবে কি প্রকারে তাঁহারা বলেন, ঈদৃশ জ্ঞানবানের কার্য্যের কোনও উদ্দেশ্য নাই? বালক যেমন উদ্দেশ্যবিহীন ক্রীড়া করে, তিনি তাহাই করেন, এ কথা কি সম্ভব? যদি অদ্বৈতবাদিগণের কথা সত্য হয়, অর্থাৎ যদি ঈশ্বর ও বিশ্ব ভিন্ন না হইয়া এক হয়, তাহা হইলে কেন না বলিব বিশ্ব যেরূপ গুণসম্পন্ন, ঈশ্বরও সেইরূপ গুণসম্পন্ন? অবশ্যই বলিতে হইবে ব্যষ্টিরূপ আমাদের যেমন প্রেম, সুখ, অনুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি আছে, সমষ্টিরূপ ঈশ্বরেরও সে সমস্ত আছে। যদি দ্বৈতবাদীর কথা সত্য হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর ও বিশ্ব যদি স্বতন্ত্র হয়, ও তাঁহার ইচ্ছাতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে বলিতে হয়, তাহা হইলে কেন না বলিব যে, আমাদের সৃষ্টি করিয়া তিনি কার্য্যবিশেষ করিতেছেন বা কোনরূপ সুখ ভোগ করিতেছেন? নচেৎ সৃষ্টি করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি ছিল? কেন না বলিব সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য আছে ও সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি আমাদিগকে সুখ দুঃখ দিতেছেন? যখন বলিতেছ তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিলে আমাদিগকে সুখী করেন ও না করিলে দুঃখ দেন, তখন প্রজার সম্বন্ধে রাজা যেমন, আমাদের সম্বন্ধে তিনি যে সেইরূপ হইতে পারেন না, তাহার প্রমাণ কি? যদি বলি, সম্রাট্ যেমন প্রজাদিগকে সুপথে রাখিবার জন্য দণ্ড পুরস্কার দিয়া আপনার রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ মনুষ্যগণকে নিয়মিত করিয়া তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা করেন, তাহাতে

দোষ কি? তাহা যে একান্ত মিথ্যা বা অসম্ভব, তাহা বলিবার হেতু কি আছে? এরূপ প্রমাণ যদি তুমি না দিতে পার, তবে তুমি কিসে বল নিশ্চয়ই শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বর হইতে পারে না, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুতঃ শাস্ত্রীয় ঐসকল কথা বিশ্বাস করিলে মিথ্যাপ্রচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, এ কথা বলিবার মনুষ্যের অধিকারই নাই।

সত্য বটে, মানব অনেক বিজ্ঞান ও অনেক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, এবং বিচার করিয়া নানা কুট তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সে সকলের মূল্য কি? বিশ্বের সৃষ্ট পদার্থ সকলের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহারই রহস্য বুঝিবার জন্যই বিজ্ঞানদর্শনের সৃষ্টি। কেন কি হইল, বিজ্ঞানদর্শন কি তাহা বলিতে পারে? না, কর্ত্তার গুণাদি বিষয় নিরূপণের শক্তি বিজ্ঞানদর্শনের আছে? মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পদার্থের পতনের ও গুরুত্বের কারণ, তাপ সহযোগে পদার্থের আকৃতি বৃদ্ধি হয়, বায়ু না থাকিলে শ্বাস ও প্রশ্বাস অভাবে জীবের মৃত্যু ঘটে, দুঃখ না থাকিলে সুখের মধুরত্ব উপলব্ধি হয় না, বিজ্ঞান এইরূপ কথাই বলিতে পারে। কেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, কেন তাপ দ্বারা পদার্থের বিস্তৃতি বৃদ্ধি হয়, ঈশ্বর এরূপ কেন করিলেন, অন্যরূপ করিলেন না কেন ইত্যাদি বিষয় কি বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে? দুঃখ না থাকিলে সুখের যে উপলব্ধি হয় না, এ কথা ত বিশ্ব-ব্যাপার দেখিয়াই বলিতেছেন; কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন, তাহা হইলে তিনি যে সুখশূন্য দুঃখ, ও দুঃখশূন্য সুখ করিতে পারেন না, এ কথা বলিবার অধিকার বিজ্ঞানের কোথায়? যতই বিজ্ঞান দর্শনের উন্নতি হউক, তদ্দ্বারা সৃষ্ট বস্তু ভিন্ন, ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতি আদি স্থির হইতে পারে না। তিনি সাকার কি নিরাকার, সগুণ কি নির্গুণ, বিজ্ঞান তাহার কোনও মীমাংসাই করিতে পারে না। অতএব তুমি যদি কেবল গায়ের জোরে বল শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির

ন্যায় গুণসম্পন্ন ঈশ্বর মিথ্যা, তাহা হইলে আমিও বলিতে পারি তোমার নিরাকার ঈশ্বরও মিথ্যা। তুমি মুখে বলিতেছ ঈশ্বর নিরাকার, অথচ নিয়তই তাঁহার চরণে প্রণিপাত কর; তুমি মুখে বল তিনি নির্ব্বিকার অথচ নিয়ত তাঁহার দয়া প্রার্থনা কর, তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা কর; তুমি মুখে বল ঈশ্বরের সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, অথচ তাঁহার নিকট অন্য হইতে বড় হইবার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। যে তাঁহার অনুগত, তাহাকে সুখী করা ও যে তাঁহার অনুগত নয়, তাহাকে দুঃখী করা যদি তাঁহার অনুগ্রহ ও নিগ্রহে হয়, তবে তিনি গুণহীন কি প্রকারে? যদি তাঁহার দেহীর ন্যায় গুণাবলী থাকিল, তবে দেহ না থাকার কি হেতু নির্দ্দেশ কর?

বেদান্তমতে যে ব্রহ্ম নিরাকার, তাহার অর্থ অন্যরূপ। বেদান্তের ব্রহ্ম কেবল নিরাকার নহেন, নির্গুণ ও নির্ব্বিকার। তিনি যখন সর্ব্বগুণময়, অর্থাৎ পরস্পর বিরোধভাবাপন্ন সকল গুণই যখন তাঁহাতে বিদ্যমান, তখন কখনই তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট গুণসম্পন্ন বলা যাইতে পারে না। সকল বর্ণের সংযোগে যেমন কোন বর্ণই থাকে না, সেইরূপ সকল প্রকার দোষ গুণের সংযোগে তাঁহার কোন গুণই নাই বলিতে হয়। তিনি সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও সংহার করেন, অথবা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের মিলনে তিনি কিছুই করেন না, সুতরাং নির্ব্বিকার। ঐরূপ, সর্ব্ববিধ আকারের সমষ্টি হেতু তিনি নিরাকার; অর্থাৎ সকল প্রকার আকৃতিই যখন তাঁহার, তখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন আকার নাই। যাঁহার যেমন দয়া, তেমনই নিষ্ঠুরতা, তাঁহাকে কি প্রকারে দয়াময় বা নিষ্ঠুর বলিব? তাঁহার নিকট কেবল দয়াই বা চাহিব কি প্রকারে? এ বিরাট্‌মূর্ত্তি আমাদের ধারণা হয় না, তাহার উপাসনাও হয় না। এ রূপ কেবল মহাযোগিগণের সমাধির বিষয় মাত্র, সাধরণের উপাসনার বিষয় নহে, তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনাও করা যায় না।

আধুনিক ব্রাহ্ম প্রভৃতি যে নিরাকার উপাসনা করেন, সে সগুণ নিরাকার। তাঁহার গুণ আছে অথচ আকার নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস ঈশ্বর সমদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মঙ্গলময় প্রভৃতি গুণশালী; নিষ্ঠুরতা, পক্ষপাতিতা প্রভৃতি দোষ তাঁহাতে নাই; কিন্তু কৈ? এ সকল ত সত্য নহে; সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। এ জগৎ যে বৈষম্যময় ও দুঃখে পরিপূর্ণ। পৃথিবীতে কোনও মনুষ্যই ত চিরসুখী নহে; পদে পদে জীবগণ দুঃখ পাইতেছে। রোগ, শোক, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, এমন কোনও ব্যক্তি বা জীবই কেহ কখনও দেখে নাই। যদি ঈশ্বর সমদর্শী প্রভৃতি হইতেন, যদি দুঃখ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে কি এরূপ ঘটিতে পারিত? যখন তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তখন কখনই তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে পারে না। তুমি মানবের স্কন্ধে দোষ নিক্ষেপ করিয়া ঈশ্বরের এই দোষ ক্ষালন করিতে চাও, তাহার হেতু কি? তদ্দ্বারা কি ইহাই বুঝিতে হইবে না যে, ঈশ্বর মানবকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না? ঈশ্বরের ইচ্ছা মানবগণ সুখে থাকুক, মানব তাহা করিতে দিতেছে না! তাহা হইলে ত ঈশ্বর অপেক্ষা মানবেরই শক্তি অধিক হইতেছে। অথবা রাজোপাধিধারী মানবগণ যেমন কতকগুলি আইন করেন ও সেই আইনানুসারে না চলিলে তাহার দণ্ডবিধান করেন, কি করিলে প্রজাগণের আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি জন্মিতে না পারে, তাহার উপায় করিবার শক্তি যেমন রাজার নাই, ঈশ্বরকেও সেইরূপ বলিতে হয়। কারণ তিনিও ত রাজার ন্যায় কতকগুলি আইনই করিয়াছেন, ও যে সকল ব্যক্তি সেই আইন লঙ্ঘন করিতেছে, তাহাদিগের দণ্ডই করিতেছেন। তাঁহার আইন মানিতেই হইবে, বিদ্রোহী হইয়া মনুষ্যগণ কিছুতেই তাঁহার আজ্ঞার অপালন করিতে না পারে, তাহার উপায় ত কিছু তিনি করেন নাই। সুতরাং হয় বলিতে হইবে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন,

অথবা বলিতে হইবে তিনি কেবল মঙ্গলময় প্রভৃতি গুণসম্পন্ন নহেন, দোষ ও গুণ উভয়সম্পন্ন। বিশেষতঃ যখন তিনি কেবল সৃষ্টি ও পালন করেন না, সংহারও করেন, তখন দোষ তাঁহার সৃষ্ট নয় বলা যায় কি প্রকারে? সংহার যদি দোষের না হয়, তবে সৃষ্টিই বা গুণের হইবে কি প্রকারে? বস্তুতঃ সংহার ও পক্ষপাতাদি ঈশ্বরের পক্ষে দোষ নহে; সুখের সহিত দুঃখের যে সম্বন্ধ, গুণের সহিত দোষেরও সেই সম্বন্ধ। অতএব আমি যদি বলি এ পৃথিবীতে যেমন রাজার কারাগার আছে, ঈশ্বরেরও সেইরূপ নরক আছে; রাজারা যেমন উচ্চপদ ও উপাধি বিতরণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ স্বর্গসুখ প্রদান করেন; রাজার ন্যায় তাঁহার ভালবাসা আছে, ক্রোধ আছে, ক্ষমা আছে; (অবশ্য এ সকল গুণ মানুষ অপেক্ষা অনেক উচ্চ প্রকৃতির হইবে) তাহা হইলে তাহা অসম্ভব কিসে? বরং তাহা হইলে এ কথা কি প্রত্যক্ষ, কি বিজ্ঞান, কিছুরই বিরুদ্ধ হয় না। তোমার নিরাকার ঈশ্বরও ত ইহ পরকালে নানাপ্রকার সুখ দুঃখ দেন।

অতএব ঈশ্বর আছেন, তাঁহার বিবিধ গুণ আছে, সৃষ্টি স্থিতি লয় তাঁহারই কৃত, তিনি পাপ পুণ্যের ফল দেন ইত্যাদি কথা স্বীকার করিলে তাঁহার দেহ স্বীকার না করিবার কোনও যুক্তিমার্গানুগত হেতু নাই। বিশেষতঃ ভক্তগণ, যোগিঋষিগণ যখন তাঁহার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিতেছেন, তখন তাহা মিথ্যা বলিবার কোনও হেতুই আমাদের নাই। যিনি আমেরিকা দেখেন নাই, তাঁহার পর্য্যটকের দৃষ্ট বা ভূগোলবিদের কথিত আমেরিকায় অবিশ্বাসের যেরূপ অধিকার নাই, অভক্তেরও সেইরূপ ভক্তের পরিদৃষ্ট ঈশ্বররূপে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। এ কথাও মনে করা উচিত যে, মানবগণকে এরূপে প্রতারণা করিয়া যোগিগণের লাভ কি? এবং সকল

দেশের সকল শাস্ত্রকারগণের মনে একইরূপ প্রতারণাবুদ্ধিরই বা উদয় হইল কি প্রকারে? বিশেষতঃ ভক্তগণ—যোগিঋষিগণ যখন সেই সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, দেবতুল্য পূজনীয় হইয়াছেন, তখন তাহা যে প্রকৃত, তাহাতে আর সংশয় কি? মিথ্যার আশ্রয়ে সর্ব্বদেশীয় ঋষিগণ এরূপ জ্ঞানবান্ ও দেবতুল্য হইয়াছেন মনে করা কি নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য নহে? অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনও কথাই মিথ্যা নহে।

কল্পিত হইলেও মিথ্যা নহে।

তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যাউক, শিব দুর্গা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নহে, এবং বর্ণিত স্বর্গ নরকও সত্য নহে, মানবের কল্পিত। কিন্তু তাহা হইলেই বা দোষ কি? স্বীকার করিলাম ঈশ্বর নিরাকার—তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাঁহার রূপ কি তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। কিন্তু যখন তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে, তখন যাহাতে তদ্বিষয়ে চিত্ত স্থির হয়, তাহা করা ত আবশ্যক। চিত্ত স্থির করিতে হইলে অবলম্বনীয় বিষয় চাই। নিরাকার কি অবলম্বন হইতে পারে? যাহা অনধিগম্য, তাহার উপাসনা ত সম্ভবেই না, তাহার অস্তিত্ব বিষয়েই জ্ঞান জন্মে না। ঈশ্বরকে আমাদের জ্ঞানের সীমায় না আনিলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব হয় না, উপাসনাও হয় না; তাঁহাকে ভক্তি করিতেও পারা যায় না। যিনি বাল্যকাল হইতে নানা বিদ্যার অনুশীলন করিয়া নিরাকার ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়াছেন, তিনিও সাকার উপাসকের ন্যায় ভক্তিভাবে একমনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন না, সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

ভগবান্ তদুত্তরে বলিলেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

—গীতা।

যখন গীতার মতেও অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা অপেক্ষা সাকার ভগবানের উপাসনা শ্রেষ্ঠ ও মানবের পক্ষে অব্যক্তের উপাসনা একান্ত দুঃসাধ্য, তখন যে মূর্ত্তি দ্বারা তিনি আমাদের নিকট ব্যক্ত হইয়াছেন, তাহা কল্পিত হইলেও মিথ্যা নহে। এই মহৎ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে যদি শিব বিষ্ণু প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে, তবে তাহা মিথ্যা হইবে কেন? যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। তাঁহাকে আমাদের জ্ঞানগোচর করিবার জন্য ও হৃদয়মধ্যে স্থাপিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য ভক্ত যোগিগণ ও শাস্ত্রকারগণ তাঁহার অনন্ত প্রকার রূপের মধ্যে যে রূপ উপযোগী বিবেচনায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা নহে। ঐ সকল মূর্ত্তি ভক্তগণের পরীক্ষিত, সুতরাং সম্পূর্ণ সত্য। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান এমন শক্তিবিশিষ্ট কোনও উচ্চতর জীব যদি জগতে থাকেন, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রকারনির্দ্দিষ্ট ঐ ঈশ্বরমূর্ত্তি মিথ্যা হইতে পারে,

কিন্তু মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। কারণ উহা অপেক্ষা সত্য মানবে প্রতিভাত হইবার উপায় নাই।

যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তৎসমস্ত ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়; কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী, সমস্তই তন্ময়, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরের দেহসম্ভূত বা ঈশ্বরের কৃত নয়, এমন পদার্থই জগতে নাই। সুতরাং যে মূর্ত্তিরই আমরা উপাসনা করি, তাহা তাঁহারই মূর্ত্তি। পূর্ণ মূর্ত্তি না হইলেও সে সকল যে তাঁহারই অংশ, তাঁহারই প্রতিনিধি বা তাঁহারই কৃত বা প্রেরিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার অংশ বা তাঁহার প্রেরিতকে তাঁহার স্বরূপ মনে করিয়া তাহাতে তাঁহার উপাসনা করিলে সে উপাসনা—সে পূজা যে ঈশ্বরের, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা পদার্থ সকলের যে সকল শক্তি দেখি, সে সকল কি তাঁহারই শক্তি নহে? যদি শস্যপূর্ণা ধরা দেখিয়া বলি ঈশ্বর আমাদের মা অন্নপূর্ণা; যদি ভূকম্পন, প্রবল বাত্যা, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভীষণ মহামারী দেখিয়া বলি ঈশ্বর আমাদের ভীমা করালবদনা কালী; যদি মহাত্মগণের অতুল দয়া প্রভৃতি দেখিয়া বলি ঈশ্বর আমাদের দয়াময়ী দুর্গতিহারিণী দুর্গা; তাহা হইলে কি আমাদের মিথ্যা বলা হয়? যদি আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, আকাশ, দিক্, কাল প্রভৃতিকে ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি বলি, তাহা হইলে কি আমাদের মিথ্যা বলা হয়? সূর্য্য প্রভৃতির শক্তি কি ঈশ্বরশক্তি নহে? তবে যদি আমরা সূর্য্য বা কোনও একটি পদার্থকে ঈশ্বর মনে করিয়া কেবল সেই পদার্থের শক্তিমাত্রকেই ঈশ্বরশক্তি বলি, তাহা হইলে তাহা মিথ্যা হইতে পারে; কিন্তু আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের যে শক্তির সত্তা অনুভব করিতে পারি, তৎসমস্ত শক্তিই যদি সূর্য্য প্রভৃতিতে আরোপিত করিয়া সেই সূর্য্য প্রভৃতির উপাসনা করি, তাহাতে তাঁহার উপাসনা হইবে না কেন? ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সীমাশূন্য, সে মূর্ত্তি

যখন কাহারও নয়নগোচর হইতে পারে না, তখন তাঁহার খণ্ডিত মূর্ত্তি-গুলিকে যদি তাঁহার মূর্ত্তি না বলি, তবে আর তাঁহার মূর্ত্তি দেখিব কি প্রকারে? যদি খণ্ডিত মূর্ত্তিগুলিকে তাঁহার মূর্ত্তি মনে করিয়া উপাসনা করিলে ভুল হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরাকার মনে করিয়া উপাসনা করিলে যে আরও ভুল হইবে। যাহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সুতরাং যাহার ব্যাপ্তি আছে, তাহা যদি নিরাকার, তবে বিশ্বও নিরাকার। ঈশ্বরের পূর্ণ-মূর্ত্তি দেখিবার শক্তি আমাদের নাই বলিয়া যদি তাঁহাকে নিরাকার বলিতে হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী এক কালে আমাদের চক্ষের গোচর হয় না বলিয়া আমাদের পক্ষে পৃথিবীও নিরাকার। বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে পৃথিবী যেমন নিরাকার, ঈশ্বর সেইরূপ নিরাকার। কিন্তু আমরা এক কালে সমগ্র পৃথিবী দেখিতে না পাইলেও খণ্ডশঃ দেখিতে পাই, অর্থাৎ যদি সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারি, তাহা হইলে একে একে যেমন সমস্ত অংশ দেখিতে পাই, সেইরূপ ভক্ত যোগীর সাহায্যে ঈশ্বরের খণ্ড মূর্ত্তি সকল দেখিতে দেখিতে তাঁহার পূর্ণ রূপ দেখিতে পাই। তাই আমরা খণ্ডিত মূর্ত্তিরই পূজা করি, অথবা সেই মূর্ত্তি অবলম্বনে তাঁহারই পূজা করি। কেন তবে সে পূজা ঈশ্বরে পৌঁছিবে না? রাজপ্রতিনিধির উপাসনা করিলে যখন সে উপাসনা রাজার নিকট পৌঁছে, তখন সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতিনিধিকে—অংশবিশেষকে তাঁহার ন্যায় উপাসনা করিলে, কেন সে উপাসনা তাঁহাতে পৌঁছিবে না? ঈশ্বর কি বুঝেন না যে, তাঁহার অবোধ সন্তান তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া এইরূপে তাঁহারই পূজা করিতেছে! বুঝিয়াও সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন না? সুতরাং আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, যম, অগ্নি, কুবের, দিক্, কাল, আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, যে পদার্থকেই—তাঁহার যে কোনও অংশ বা প্রতিনিধিকেই—তাঁহার যে কোন খণ্ডিত মূর্ত্তিকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি, সে পূজা ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনেই পৌঁছে।

আবার ঈশ্বর যদি গুণহীন বা সমদর্শী হয়েন, তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন কিছুতেই যদি তাহার ফলের অন্যথা না করেন, তবে লোকে তাঁহার উপাসনা করিবে কেন? প্রয়োজনজ্ঞান না হইলে কোনও কার্য্যেই মানবের আসক্তি জন্মে না। কি প্রয়োজনে ঈশ্বরের উপাসনা করিব? তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবে না, শত উপাসনা করিলেও আমি যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি তাহার কুফল হইতে পরিত্রাণ পাইব না, তবে উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? উপাসনা করিয়া এরূপে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কার্য্য করিলে যে দশ টাকা উপার্জ্জন হইবে। যদি বল, উপাসনা করিলে ঈশ্বর আমাদিগকে সুচেষ্টা করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তখন আমরা ফলজনক কার্য্য করিতে পারিব, এই বিবেচনায় তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মিবে। কিন্তু উপাসনা করিলে তিনি যদি আমাদিগকে সুপ্রবৃত্তি ও শক্তি দিতে পারেন, যদি মন্দ লোককে তিনি ভাল করিতে পারেন, তবে মন্দ কার্য্যের ফলই বা ভাল করিতে পারিবেন না কেন? এবং তাহা হইলে তিনি কৃত নিয়মের অন্যথাচরণ করেন না বলা যায় কি প্রকারে? প্রত্যুত তাহা হইলে ত তিনি কাহাকেও দয়া করেন ও কাহাকেও করেন না ইহাই বুঝাইল। তবে তিনি আর গুণহীন বা সমদর্শী কি প্রকারে? বস্তুতঃ ঈশ্বরকে গুণসম্পন্ন না বলিলে, তাঁহার উপাসনায় কোন ফলেরই আশা করা যায় না। এরূপ বিশ্বাস করিলে, কোন ব্যক্তিই ঈশ্বরের উপাসনা করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে না। অতএব এই প্রয়োজন জন্য তাঁহাকে যদি শিব বিষ্ণু প্রভৃতির ন্যায় গুণসম্পন্ন বলা হইয়া থাকে, ভক্তবৎসলতাদি গুণের আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। দেহ-গুণাদিসম্পন্ন না বলিলে তাঁহার উপাসনা করাই যায় না।

আবার উপাসনা করিবই বা কিপ্রকারে? মূর্ত্তি নাই যে হৃদয়ে বসাইব, মন্ত্র নাই যে জপ করিব, নির্দ্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নাই যে

তদবলম্বন করিব, কি করিলে বা কি বলিলে উপাসনা হয়, যুক্তি বা হৃদ্‌বৃত্তি তাহা বলিয়া দিতে পারে না, কিপ্রকারে উপাসনা করিব? তাঁহার গুণ বর্ণনা করিব? "হে ঈশ্বর! তুমি দয়াময়, তুমি আমাদের জন্য নানা সুখকর পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছ, তোমারই প্রসাদে আমরা ভোজন করিয়া শরীরে বলধারণ করিতেছি, তোমারই প্রসাদে আমরা নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিতেছি" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার গুণ গান করিতে হইবে? কিন্তু যিনি নির্গুণ তাঁহার গুণ কোথায় যে, গুণ গান করিব? থাকিলেও তাঁহার গুণ আমরা জানিব কি প্রকারে? ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা না শুনিলে কাহার নিকট তাঁহার গুণের পরিচয় পাইব? ঈশ্বর যে দয়াময়, সুখবিধাতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন, ধর্ম্মশাস্ত্র বিশ্বাস না করিলে তাহা জানিতেই পারা যায় না। কারণ মানবগণ নিয়তই সুখ ভোগ করিতেছে না, অনেকের দুঃখের পরিমাণই অধিক। সুতরাং যে সুখ পায়, সে যদি ঈশ্বরেরই প্রসাদে পায় বলিতে হয়, তাহা হইলে যে দুঃখ পায়, তাহাও তাঁহারই কৃত নিগ্রহে পায় বলিবে না কেন? দুঃখ যদি তাঁহার দেওয়া না হয়, মানব নিজ দোষেই দুঃখ পায় বলিতে হয়, তবে সুখ তাঁহারই দেওয়া বলিবে কেন? নিজেরই গুণে সুখ পায় বলিবে না কেন? যদি কেবল সুখকর পদার্থগুলিই ঈশ্বরের সৃষ্ট বলিতে হয়, তবে দুঃখকর পদার্থগুলি কাহার সৃষ্টি বলিব? তিনি যদি আমাদের জন্য নানাবিধ সুখকর পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে তাহা সকলে আবশ্যক হইলে পায় না কেন? যে দুঃখের সৃষ্টি তিনি করেন নাই, তাহাই বা নিয়ত পায় কেন? কাহারও দুধে চিনি, কাহারও শাকে বালি কেন? যদি মনুষ্যের চেষ্টাতেই সুখ দুঃখ হইল, যে যেমন চেষ্টা করে যদি সে সেইরূপ পাইল, তবে আর তাঁহার দেওয়া হইল কি প্রকারে? সে ত মানুষের চেষ্টাতেই হইল। একজন নানা চেষ্টায় নানা কৌশলে বহুতর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, তদ্দ্বারা সে নানা সুখ উপভোগ

করিতেছে, আর একজন সেরূপ চেষ্টা করিয়া উপার্জ্জন করে নাই, সে অন্নাভাবে ক্ষুধায় কাতর ও শীর্ণ হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। যখন চেষ্টা না করিলে সুখ পায় না, তখন তিনি সুখ দিতেছেন বলিব কি প্রকারে? নিজের চেষ্টাফলে যাহা হয়, তাহা যদি তাঁহার দেওয়া বলিতে হয়, তবে দুঃখও তাঁহার দেওয়া বলিব না কেন? বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে চেষ্টা না করিলে যেমন সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখ সেরূপ নহে, দুঃখের জন্য কেহ চেষ্টা করে না, সুখের চেষ্টা করিতে গিয়া দুঃখ পায়, এবং সুখের চেষ্টা না করিলেই দুঃখ পাইতে হয়। এরূপ হয় কেন? সুখের চেষ্টা করিলাম না, সুখই পাইলাম না, সঙ্গে সঙ্গে আবার দুঃখ কেন? যদি পরমেশ্বর দুঃখ না দেন, তবে সুখের চেষ্টা না করিলে যে দুঃখ হয়, তাহার কারণ কি? সুখের চেষ্টা করি নাই, সুখই হইল না; দুঃখ পাই কেন? আমি উপার্জ্জন করিয়াছি, সুখ পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, আমি সুখভোগ করিতেছি; তুমি সুখ পাইবার চেষ্টা কর নাই, সুখ পাইলে না, দুঃখভোগ করিতেছ কেন? যখন সুখের সঙ্গে দুঃখের এরূপ সম্বন্ধ তখন ঈশ্বর যে কেবল সুখেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, দুঃখের সৃষ্টি করেন নাই, এ কথা বলা যায় কিপ্রকারে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে সুখ দুঃখ উভয়ই ঈশ্বরের দেওয়া। বিশেষতঃ কতকগুলি দুঃখ জীব মাত্রেরই নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। কোন চেষ্টাতেই সে দুঃখ নিবারিত হইতে পারে না। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতির দুঃখ মানুষের দোষে ঘটে বলিলেও বার্দ্ধক্যের ও মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্ট, স্ত্রীজাতির গর্ভযন্ত্রণাদির কষ্ট মানুষের কার্য্য দোষে হয়, বলিবার কোন হেতুই নাই। কোন চেষ্টাতেই কেহ জরামৃত্যুযন্ত্রণাদির হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। অতএব যুক্তিমার্গের অবলম্বনে কি প্রকারে বলিব ঈশ্বর কেবল আমাদের সুখ বিধানই করিতেছেন? একজন মহাধনিসন্তানের ও একজন নিতান্ত দরিদ্রসন্তানের সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে। ধনী প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া

১৬৲ টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার আনাইয়া ও নানা ব্যয়ে সুতদ্বির করিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন; দরিদ্র এক টাকা দিয়া সামান্য একজন কবিরাজও দেখাইতে পারিল না, উপযুক্ত পথ্যও দিতে পারিল না, হয় ত অবসর অভাবে তাহাকে দেখিতেও পারিল না, পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে কেবল যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া সে কি সেই শোকার্ত্ত পিতা প্রাণের সহিত বলিতে পারে 'হে দয়াময়! তোমার অপার দয়া। তুমি কেবলই আমাদের সুখ বিধান করিতেছ'? বৃষ্টির অভাবে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইয়াছে, প্রবল বাত্যায়, ভূমিকম্পে ও অগ্ন্যুৎপাতে সমগ্র দেশ ধ্বংস হইয়াছে, যাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া জীবনমাত্র রক্ষা করিয়াছে, তাহারা কি হৃদয়ের সঙ্গে বলিবে 'ঈশ্বর! তোমার দয়ার সীমা নাই'? নিজের কার্য্যের দোষেই তাহারা এইরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে মনে করিয়া ঈশ্বরের গুণগানে মত্ত হইবে?

বস্তুতঃ গুণ দেখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা অসাধ্য। যদি ঈশ্বরের উপাসনা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার গুণাগুণের প্রতি দৃষ্টি করিলে হইবে না। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহাকে ভক্তি ও তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আমাদের সুখলাভের উপায়ান্তর নাই, এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত রাখিয়া উপাসনা করিতে হইবে। আমাদের শক্তি কিছুই নাই, ঈশ্বর দয়া না করিলে আমাদের কিছুই হইতে পারে না, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার কার্য্যের কোনরূপ সমালোচনা না করিয়া তাঁহার দয়া প্রাপ্তির আশাতেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহাই ভাবিতে হইবে যে, শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাদিগকে দয়া করিবেনই; তাঁহার দয়া না হওয়াতেই আমি দুঃখ পাইতেছি, অতএব একমনে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দয়া আকর্ষণ করিব ও তাহা হইলেই আমার দুঃখ দূর হইবে। এরূপ বিশ্বাস নির্গুণ বা সমদর্শী ঈশ্বরের প্রতি হইতে পারে না। সম্রাটের ন্যায় দেহধারী, দয়াদি গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রয়োজন। শিব, বিষ্ণু, দুর্গা

প্রভৃতির ন্যায় ভক্তবৎসল দীননাথ পতিতপাবন অধমতারণ দুর্গতিনাশন দৈত্যবিনাশন মধুসূদন ভূভারহারী জনার্দ্দন ঈশ্বরের আবশ্যক। প্রেমে তাঁহার দেহ পরিপূর্ণ, ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছাই তিনি পূর্ণ করেন, যিনি যাহা চান তাহাকে তাহাই দেন, এইরূপ ভাবিতে হইবে, তবে ত স্বার্থপর মানব ভক্তিভাবে আগ্রহের সহিত তাঁহার পূজা করিবে। সুতরাং যদি তাঁহার প্রতি মানবগণের ভক্তি উৎপাদনের জন্য, উপাসনার সুবিধার জন্য শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে, তাহাতে দোষ কি? তাহা মিথ্যা হইবে কেন? কল্পনামাত্রই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে যিনি যে রূপই ঈশ্বরের স্বরূপ বলিবেন, তাহাই মিথ্যা। যিনি যে রূপই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করুন, কোনওটি ত প্রমাণসিদ্ধ নহে, কিছুই ত প্রত্যক্ষমূলক নহে, সমস্তই যে ঐরূপ কল্পনামূলক। সুতরাং মানবের কল্পিত বলিয়া যদি শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে নিরাকার ঈশ্বরও মিথ্যা, ঈশ্বরই মিথ্যা। যিনি ঈশ্বর অবলম্বন করেন, তিনিই মিথ্যা-পথের আশ্রয় লয়েন বলিতে হইবে—নাস্তিক হওয়াই কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা যদি কর্ত্তব্য না হয়, আস্তিক হওয়াই যদি প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে এই মিথ্যাদ্বয়ের মধ্যে যেটি আমাদের অধিক হিতকর, তাহাই অবলম্বনীয় ও তাহাই সত্য। নিরাকার ঈশ্বর হৃদয়ঙ্গম হয় না, সাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়, স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করা যায়, তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজন করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করা যায়, যতই দুঃখ যতই বিপদ্ উপস্থিত হউক সম্মুখস্থ তাঁহাকে জানাইয়া শান্তির আশায় উৎফুল্ল হইতে পারা যায়, তাঁহার সম্পর্ক ধরিয়া সর্ব্বজীবের শুভ সাধন করিতে পারা যায়, অর্থাৎ তিনি সকলেরই পিতা, সৃষ্ট সমস্ত জীবই তাঁহার সন্তান, সুতরাং সহোদরতুল্য জ্ঞানে, পিতার প্রীতিভাজন হইতে হইলে যেমন সহোদরগণের প্রতি প্রীতিমান্ হইতে হয়, ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইবার

জন্য সেইরূপ সর্ব্বজীবে ভ্রাতৃস্নেহ করিতে পারা যায়। মানব সর্ব্ববিষয়েই কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। কেহ নরকযন্ত্রণার ভয়ে, কেহ স্বর্গসুখের আশায়, কেহ তাঁহার সালোক্য সারূপ্য বা সাযুজ্য মুক্তির আশায় সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরহিতৈষী হয়। তাহা যদি হইল, তবে তাহাতে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট কোথায়? যদি ইন্দুর ধরিতে পারে, হইলই বা কাষ্ঠের বিড়াল। আমাদের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা যদি সম্পন্ন হইল, তবে তাঁহার রূপকল্পনায়, দোষ কি?

যদি শাস্ত্র এমন কথা বলিত ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও শিব বিষ্ণু প্রভৃতি স্বতন্ত্র, এবং যদি ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া শিব বিষ্ণু প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদার্থের উপাসনা করা শাস্ত্রবিধি হইত, তাহা হইলে দোষের বিষয় হইত। কিন্তু তাহা ত নহে। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা-বিধি ত শাস্ত্রে নাই। সেই সর্ব্বময় ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই তাঁহার রূপের কল্পনা করিয়া তাহাতে তাঁহার উপাসনা করিবার বিধি। শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সেই পরাৎপর ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি। ভক্ত ঈশ্বরেরই শিব বিষ্ণু প্রভৃতি কমনীয় মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিভাবে পূজা করেন, এবং তাঁহার সৃষ্টির যাহাতে মঙ্গল হয়, নিঃস্বার্থভাবে তাহারই চেষ্টা করেন। আমি কেহই নহি, আমার শক্তি কিছু নাই, সমস্ত মঙ্গলা-মঙ্গল তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এ বিশ্বাস থাকায় যতই দুঃখ হউক, যতই অমঙ্গল হউক, তাঁহার প্রতি নির্ভর বাড়ে ভিন্ন কমে না। পিতা মাতা যেমন গুণানুসারে পুত্রগণের মধ্যে পুরস্কার ও তিরস্কার বিতরণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ গুণানুসারে আমাদের প্রতি দণ্ড ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। আমাদের দোষেই আমরা তাঁহার বিরাগভাজন হইয়া দুঃখ পাই মনে করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য চেষ্টা করি। এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাসিগণ সকল দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে লইয়া ঈশ্বরের করুণা লাভেরই যত্ন করেন।

বৈজ্ঞানিক কূটতর্ক অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রতি সন্দিহান হয়েন না। এই ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতার ফল হইতেই মনুষ্যসমাজের শান্তি বিধান হইয়াছে। স্বার্থপর মনুষ্য পরম পিতার প্রীতির জন্য শত শত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমাজের মঙ্গল বিধান করিতেছে; তাই মানব সমাজবদ্ধ হইয়া নির্ভয়ে মনের সুখে বাস করিতেছে, সকলেই পরস্পরের সহায়তা লাভ করিয়া সুখী হইতেছে।

পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত এক্ষণকার অবস্থার তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকায় ধনিগণ শাস্ত্রের অবলম্বনে দরিদ্রের ভরণপোষণে ও দেশের কল্যাণকামনায় প্রভূত ধন ব্যয় করিতেন। অতিথিকে অন্নদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, জলসত্র, বৃক্ষরোপণ, রথ্যা-নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণরক্ষা, ঔষধ ও পথ্য দান, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন প্রভৃতিতে প্রভূত ধন ব্যয় করিতেন। বিলাসে বা বৃথা সুখসম্ভোগে তাঁহাদের মন যাইত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বলবান্ বীরপুরুষগণ পরের রক্ষাবিধানেই আপনাদের সমস্ত বলবীর্য্য ব্যয় করিতেন, কেবল আপনার প্রভুত্ব বা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য কেহ আপনার বলের ব্যবহার করিতেন না। যাঁহারা বিদ্যাধনে ধনী হইতেন, তাঁহারা অন্যকে বিদ্যা বিনয়াদি গুণসম্পন্ন করিবার জন্যই নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন; কেবল স্বার্থ সাধন জন্য সে বিদ্যার প্রয়োগ করিতেন না। যিনি যে বিষয়েই শক্তি-সম্পন্ন হইতেন, সে শক্তি সর্ব্বতোভাবে পরেরই কল্যাণসাধনে প্রয়োগ করিতেন। সেই শক্তি-প্রভাবে কেবল নিজেরই সুবিধা করিয়া লইব, এ চিন্তা কাহারও মনে উদিত হইত না; সুতরাং সকলেই সকলকে বিশ্বাস করিত। দরিদ্র ধনীকে, দুর্ব্বল বলবান্‌কে, মূর্খ পণ্ডিতকে হিংসা করিত না; প্রত্যুত নিয়তই অন্তরের সহিত তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করিত। দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ প্রভৃতির পরবশ হইয়া

লোকে প্রতারণা, জাল জুয়াচুরী করিত না। সকলেই নির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বনে উপার্জ্জন করিয়া, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, প্রতিবেশবাসিগণের হিতসাধন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, গুরুজনে ভক্তি, গুণীর সম্মান, পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিগণের পরিরক্ষণ, ও ভক্তিভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতেন। পরকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহকালেও যে তাঁহারা পরম সুখে বাস করিতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের বিবিধ উপকরণ তাঁহাদের না থাকিলেও দুঃখের পরিমাণ অতি অল্পই ছিল। যে অভাবজ্ঞান দুঃখের মূল, সে অভাবজ্ঞান তাঁহাদের অতি অল্পই ছিল। ঈশ্বরই তাঁহাদের প্রধান প্রার্থনীয় বিষয়; সেই ঈশ্বর তাঁহাদের হৃদয়ে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিতেন। সুতরাং নিয়তই আনন্দময় থাকিতেন। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণাকে তাঁহারা ক্ষণিক মনে করিতেন, সুতরাং সে দুঃখে তত ব্যাকুল হইতেন না। সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে সাংসারিক সকল দুঃখই নিবৃত্ত হইবে, তাহাই করিয়া দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করিতেন। যদি তাহাতে দুঃখনিবৃত্তি না হইত, তাহা হইলেও মনে করিতেন, হয় পরকালের অনন্ত মঙ্গল বিধান জন্য ঈশ্বর এই ক্ষণিক সাংসারিক দুঃখ প্রদান করিতেছেন, অথবা পূর্ব্বজন্মকৃত নিজের দুষ্কৃতির জন্য কষ্ট পাইতেছেন। এই দুঃখভোগ দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে, মনে করিয়া সে দুঃখকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করিতেন, সুখের হেতু মনে করিয়া প্রসন্নমনে সে দুঃখভার বহন করিতেন।

যদি মনের সুখই মানবের উদ্দেশ্য হয়, দুঃখনিবারণই যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যে পথে চলিতেন, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রপথই যে প্রশস্ত, তাহাতে আর কথা কি? যে কল্পিত ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা কল্পিত শিব বিষ্ণু প্রভৃতি মূর্ত্তি দ্বারা মানবের এবংবিধ হিত সাধিত হয়, তাহা যদি মিথ্যা,

তবে সত্য কি? ইহাকে যদি মিথ্যা বলিতে হয়, তবে মিথ্যা নহে কি? রোগী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল আমি সারিব কি না? তিনি বলিলেন হাঁ সারিবে, এই ঔষধ খাইলেই সারিবে। চিকিৎসক হয় ত রোগ সারিবে কি না তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই, কিংবা তিনি বুঝিয়াছেন এ রোগে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন, রোগীর হিতের জন্যই এ মিথ্যা কথা বলিলেন। অবোধ শিশু সন্তানের জ্বর হইয়াছে, ভাত খাইবার জন্য অতিশয় ক্রন্দন করিতেছে; মাতা নানা মিথ্যাকথ্যা বলিয়া তাহাকে ভুলাইলেন। ছেলেরা পড়া শুনায় মন দেয় না, খেলাতেই নিমগ্ন; মাতাপিতা কি গুরু তাহাদিগকে শিক্ষায় মনযোগী করিবার জন্য, "লিখ্‌লে পড়্‌লে দুধ ভাত, না লিখ্‌লে ঠেঙ্গার গুঁত," "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলোভনকারী বাক্য বলেন। লেখা পড়া শিখিলেই কি গাড়ি ঘোড়া দুধভাত পাওয়া যায়, ও লেখা পড়া না শিখিলে সকলেই কি ঠেঙ্গার গুঁতা খায়? কত লোক যে অশেষ শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও উদরান্ন সংস্থান করিতে পারিতেছে না, অথচ ক অক্ষর মহামাংস এমন শত শত লোক উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। এইরূপে মঙ্গলের জন্য কত মিথ্যা কথা নিয়ত মানুষকে বলিতে হয়, সে সকল মিথ্যার ফলে মানবের সমূহ মঙ্গল সাধিত হয়। এরূপ মিথ্যার আশ্রয় যদি অকর্ত্তব্য হয়, তবে সত্য কি, কর্ত্তব্য কি, এ কথা মানুষকে বুঝানই ভার হইবে।

সত্য বলিয়া চিরনির্দ্দিষ্ট কিছু নাই। আমার চক্ষে যাহা সত্য, তোমার চক্ষে তাহা মিথ্যা। যুবা তুমি অক্ষরগুলি যেরূপ পরিষ্কার দেখিতেছ, বৃদ্ধ আমি কখনই সেরূপ দেখিতে পাই না। বালক বিস্বাদ বলিয়া যে সুক্তা মুখে দেয় না, বৃদ্ধ তাহা অতি উপাদেয় জ্ঞানে ভোজন করে। দুর্ব্বল যে পদার্থকে অতিশয় ভার বলে, বলবান্ নিতান্ত লঘু জ্ঞানে তাহা উৎক্ষিপ্ত করে। বুদ্ধিমান্ যে অঙ্কটী অতিশয় সরল

মনে করে, নির্ব্বোধ তাহা অতিশয় কঠিন ভাবে। যে দুগ্ধ ঘৃত স্বাস্থ্যের নিদান বলিয়া সাধারণে মনে করে, সেই দুগ্ধ ঘৃত অনেকেরই পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। কেহ জগৎকে সুখের আধার দেখেন, কেহ দেখেন জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ। কেহ ঢেঁকির মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখেন, কেহ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানেই তাঁহাকে খুঁজিয়া পান না। যাহার যেমন শক্তি, যেমন অবস্থা, সত্য, তাহার নিকট সেইরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং কোনটী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, নির্দ্ধারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। হিতাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সত্যাসত্য বিচার করা আবশ্যক। যাহা হিতকর, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, এবং যাহা অহিতকর, তাহা সত্য হইতে পারে না। যখন তুমি নিজেই বলিতেছ ঈশ্বর সত্যস্বরূপ এবং মঙ্গলের নিদান, তখন তোমাকেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যখন দেখা যাইতেছে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে জগতের এবংবিধ সমূহ মঙ্গল সাধিত হয়, তখন নিশ্চয়ই ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য; কল্পিত হইলেও সত্য।

তুমি যাহাকে সত্য বলিতেছ, তাহার আশ্রয়ে মানবের কি বিষময় ফল ফলিতেছে একবার চিন্তা করিয়া দেখ দেখি। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ঈশ্বরপ্রণীত নহে, মনুষ্যেরই কৃত ও মিথ্যা, অতএব তাহা অবলম্বনীয় নহে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক জনগণ কি অনিষ্টই না করিতেছেন! এখনও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস এককালে লোপ পায় নাই; দৃঢ়বিশ্বাসী লোক এখনও অনেক আছেন; এবং যাঁহাদের ঐ বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, এখনও তাঁহাদের হৃদয়ে বহুজন্মার্জ্জিত সংস্কার দৃঢ় অঙ্কিত আছে; এখনও রাজশাসন, সমাজশাসন ও লোকশিক্ষা প্রভৃতি ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরূপই আছে; তথাপি কি না হইতেছে? এক্ষণে উপাসনা দূরে থাকুক, ঈশ্বরের নামও প্রায় কেহই করেন না। বেশ ভূষায় আচ্ছাদিত হইব, নানাপ্রকার মুখরোচক দ্রব্য

ভোজন করিব, লোকের উপর অযথা প্রভুত্ব করিব, সদা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিব, ইহাই এক্ষণকার লোকের মহামন্ত্র হইয়াছে। সুরাপান, বেশ্যাসম্ভোগ ও নানাপ্রকার কুকার্য্যে সমস্ত ধনসম্পত্তি, সমস্ত পুরুষকার ব্যয় করিতেছেন। এক্ষণে সকলেই সমান, একজনকে বড় মনে করিতে সকলেই কষ্ট অনুভব করেন। হইলেই বা তুমি পণ্ডিত, হইলেই বা তুমি বুদ্ধিমান্; কিন্তু তাহা বলিয়া আমি যেমন বুঝি, তুমি কখনই তেমন বুঝ না। সুতরাং তোমার উপদেশ আমি শ্রবণ করিব কেন? তোমাকে মান্যই বা করিব কেন? তুমি জ্যেষ্ঠভ্রাতা—কিছুদিন অগ্রে জন্মিয়াছ, তাই বলিয়াই আমাকে তোমার মতানুযায়ী হইতে হইবে তাহার অর্থ কি? তুমি পিতা—জন্ম দিয়াছ, তাই বলিয়াই তোমাকে ভক্তি করিতে হইবে? জন্মদানকালে কি তোমার মনে সুখাভিলাষ ছিল না? স্বাভাবিক অনুরাগই কি তোমাকে আমার পালনে প্রবৃত্তি দেয় নাই? তবে কোন্ অসাধারণ গুণের জন্য তুমি আমার ভক্তিভাজন? তুমি বড় জোর ইহাই বলিতে পার যে, বাল্যকালে যে ঋণ দিয়াছ, তাহারই পরিশোধ পাইবার অধিকারী, অর্থাৎ তুমি যখন অক্ষম হইবে, তখন কিছু সাহায্য পাইবে। ইহাই মাত্র আমার কর্ত্তব্য হইতে পারে। কেননা তাহা না করিলে আমার পুত্রও আমাকে সাহায্য করিবে না। কিন্তু তোমাকে ভক্তি করিতে হইবে ও তোমার আজ্ঞানুসারে চলিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? গুরু ত ভৃত্যবিশেষ, বেতন লইয়া তিনি শিক্ষা দান করেন, তাঁহাকে সম্মান করিব কেন? তিনি যখন আমার নিকট হইতে ভৃতি গ্রহণ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাকেই ভৃত্যের ন্যায় আমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে। রাজা ও ধনিগণ ত দস্যু তস্কর-বিশেষ। তাঁহারা ছলে বলে কৌশলে সাধারণের ধনাপহরণ করিয়া ধনী ও রাজা হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে সম্মান করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের দমন করাই উচিত। পরস্পরের সুখের জন্যই স্ত্রী

পুরুষের সম্মিলন, সুতরাং দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের সেরূপ অনুরাগ না থাকিলে কেন পরস্পরের হিতচিকীর্ষু হইতে হইবে, এবং স্ত্রীই বা কেন স্বামীর নিদেশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে? এইরূপে যুক্তির আশ্রয়ে উচ্চ-নীচভেদজ্ঞান, গুরুশিষ্যজ্ঞান, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান, ঈশ্বরবিশ্বাস মানুষের হৃদয় হইতে ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে, এবং উচ্চেরা নিম্নগণের প্রতি ও নিম্নেরা উচ্চগণের প্রতি নিয়তই দ্বেষহিংসাপরায়ণ হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব কিছুমাত্র নাই। উচ্চেরা নিম্নগণকে দলিত করিবার ও নিম্নেরা উচ্চদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য নিয়তই পরস্পরে দ্বন্দ্ব করিতেছে।

উচ্চেরা বলেন অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে নাই, তাহারা কেবল খাদ্য সামগ্রী মহার্ঘ্য করিতেছে মাত্র, তাহাদের অল্পতা হইলেই জন-সমাজের মঙ্গল। এক্ষণে মজুরের তাদৃশ প্রয়োজনও নাই, যন্ত্রসাহায্যেই এক্ষণে অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; অতএব যাহাতে তাহাদের সংখ্যার অল্পতা হয়, তাহার জন্য তাহাদের বিবাহ হইতে না দেওয়া এবং মধ্যে মধ্যে দেশবিশেষের সহিত বিবাদোপলক্ষে যুদ্ধ বাধাইয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহাদের সংখ্যা অধিক থাকিলে পুনঃপুনঃ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতে থাকিবে। এদিকে নিম্ন-শ্রেণীরা বলেন ঈশ্বর সকলকেই সকল বিষয়ে সমান স্বত্ব দিয়াছেন, অতএব ধনীরা কোটী কোটি মুদ্রার অধিপতি হইয়া বিলাসে ও আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকিবেন এবং কোটী কোটী দরিদ্র লোক অনশনে জীবন ত্যাগ করিবে, অথবা সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া তাঁহা-দের দাস্যবৃত্তি করিবে, সমদর্শী বিধাতার কখনই ইহা অভিপ্রেত নহে। অতএব সাধারণে উহাদের ধন সমভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। এইরূপে উচ্চগণের সহিত নিম্নগণের, বৃদ্ধের সহিত যুবার, পুরুষের সহিত স্ত্রীর, রাজার সহিত প্রজার নিয়ত কলহ চলিতেছে।

পুরুষকারকে একমাত্র উপায় জ্ঞানে সকলেই প্রাণপণে কেবল নিজেরই স্বার্থসাধনের চেষ্টা করিতেছে। কোনও দিকে লক্ষ্য নাই; কিসে আপনার বাহ্যাড়ম্বরের উন্নতি হইবে, কিসে আপনার প্রাধান্য বৃদ্ধি হইবে, কিসে নিজেরই ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিবে, নিয়ত তাহারই চেষ্টা করিতেছে। এইরূপে মানবীয় সকল হৃদ্‌বৃত্তিই নিস্তেজ হইতেছে, ও পশুবৃত্তিই বৃদ্ধি পাইতেছে। এরূপ হইলে কখনই মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, প্রকৃত সুখও হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি পশুবৃত্তির আধিক্য মানবের শ্রেষ্ঠতার কারণ? না দয়া, ক্ষমা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয় প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তির আধিক্য মানবত্বের কারণ? যে সত্যের আশ্রয়ে মানবগণ মানবত্ব হারাইয়া পশ্বাদি ইতর প্রাণী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আর মিথ্যা কি? অতএব যে সত্যপ্রভাবে মানবজাতির এবংবিধ অনিষ্ট সাধিত হয়, সে সত্যকে কখনই সত্য বলিতে পারা যায় না; এবং যে ধর্ম্মশাস্ত্রের পরতন্ত্র হইলে মানবগণ দেবভাবসম্পন্ন হয়, সে ধর্ম্মশাস্ত্রকে কখন মিথ্যা বলা যাইতে পারে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।

এইক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ধর্ম্মশাস্ত্র ত একখানি নহে, শত শত সম্প্রদায়ের শত শত ধর্ম্মশাস্ত্র। বেদ যেমন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল সেইরূপ খৃষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্র, কোরাণ সেইরূপ মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রিপিটক সেইরূপ বৌদ্ধের ধর্ম্মশাস্ত্র। আবার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির সম্প্রদায়ভেদেও নানা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে। যদি ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য হয়, তবে তৎসমস্তের মত পরস্পর এত ভিন্ন কেন? যদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ঈশ্বরপ্রণীত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তৎসমস্ত একইপ্রকার হইত। তাহা যখন নয়, যখন এক ধর্ম্মশাস্ত্র অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তখন সকলগুলি যে ঈশ্বরপ্রণীত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি উহার কোন একখানিকে ঈশ্বরপ্রণীত নয় বলিতে হয়, তবে অন্যখানি যে ঈশ্বরপ্রণীত, তাহার প্রমাণ কি? যদি উহার একখানি মিথ্যা হইতে পারে, তবে অন্যখানি মিথ্যা না হইবার হেতু কি? অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র যখন পরস্পর ভিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তৎসমস্ত বা উহার একখানিও ঈশ্বরপ্রণীত নহে।

আমাদের বোধ হয়, এরূপ তর্কের কোন মূল্য নাই। কারণ যদি সত্য সত্যই ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সর্ব্বাংশে সমান না হয়, তাহা হইলেও যে, সে সকল ঈশ্বরকৃত নয়, বা সত্য নয়, এরূপ বলিবার কোন হেতুই নাই। জগতে ঈশ্বরকৃত কোন্ বস্তু সর্ব্বাংশে সমান যে, তাই দেখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সর্ব্বাংশে একরূপ হইবে মনে করিতে হইবে? খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসল-

মানধর্ম্ম সর্ব্বাংশে সমান নয় বলিয়া যদি উহাদিগকে ঈশ্বরপ্রণীত না বলিতে হয়, তাহা হইলে খৃষ্টান ও মুসলমান, এ উভয় জাতিও ঈশ্বরের সৃষ্ট নয় বলিতে হয়। ইয়ুরোপবাসী খৃষ্টান ও আসিয়াবাসী মুসলমান কি আকৃতি প্রকৃতি আদি সর্ব্ববিষয়ে সমান? না কাফ্রি, নিগ্রো, ইংরাজ, কাবুলী, হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতীয় মনুষ্য সর্ব্বাংশে সমান? অনেক বিষয়েই কি পরস্পর পরস্পরের বিপরীত ভাবাপন্ন নহে? কাহারও বর্ণ শুভ্র, কাহারও বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ ও কেহ তাম্রবর্ণ; কোন জাতি দুর্ব্বল, কোন জাতি বলবান্; কোন জাতি বিবাদপ্রিয়, কোন জাতি শান্ত; কোন জাতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কোন জাতি বুদ্ধিহীন। দেশভেদে, বংশভেদে, ব্যক্তিভেদে মনুষ্যগণের মধ্যে এইরূপ নানা প্রভেদ দৃষ্ট হয়। আকৃতি ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, পরিচ্ছদ ভিন্ন, খাদ্য ভিন্ন, জলবায়ু (climate) ভিন্ন। কোন দেশ শীতপ্রধান, কোন দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, কোন দেশ বর্ষাপ্রধান, কোন দেশ নদীময়, কোন দেশ পর্ব্বতময়, কোন দেশ সমতল, কোন দেশ তুষারময়, কোন দেশ বালুকাময় মরুভূমি, কোন দেশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী; কোন দেশের লোকের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল, কোন দেশের গোধূম, কোন দেশের যব, কোন দেশের আলুই প্রধান খাদ্য। প্রত্যেক দেশের সর্ব্ববিষয়ে যদি এত ভিন্নতা ঈশ্বরের কৃত হইতে পারে, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিন্নতা তাঁহার কৃত না হইবার কারণ কি? প্রত্যুত ইহাই বলিতে হইবে, ঈশ্বর যে দেশের, যে কালের, যে সম্প্রদায়ের যেমন অবস্থা করিয়াছেন, সেই দেশের, সেই কালের, সেই সম্প্রদায়ের উপযোগী সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়ে যেমন দেশবিশেষে কালবিশেষে মানবগণের ভিন্নতা ঈশ্বরের কৃত, ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিন্নতাও সেইরূপ ঈশ্বরের কৃত। কেবল দেশবিশেষের মধ্যেই ভিন্নতা নহে, একই দেশের শ্রেণীবিশেষের ও বংশবিশেষের মধ্যেও নানা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একই শ্রেণীর

ও একই বংশের মধ্যে নানা প্রকৃতির মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। একজন দেবতা ও একজন রাক্ষস বলিয়া অভিহিত হয়। যখন সকল বিষয়েই পরস্পরের ভিন্নতা প্রাকৃতিক, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের ভিন্নতা অপ্রাকৃতিক হইবে কেন? অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধভাব থাকিলেও তাহা ঈশ্বরকৃত, সত্য ও হিতকর বলিতে হইবে। "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যাং বিধীয়তে।" রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়ম যেমন সকল দেশে সমান নয়—ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা ভিন্ন ভিন্নপ্রকার রাজনিয়মানুসারে ও সামাজিক নিয়মানুসারে চলিতেছে, ও তাহাতেই রাজ্যের ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনগণ ভিন্ন ভিন্নরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে চলিলে তত্তদ্দেশ-বাসীর হিত সাধিত হয়। জাতিধর্ম্মের—পৈতৃক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই মঙ্গললাভ হয়। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেও সমস্তই সত্য এবং ঈশ্বরকৃত।

বাস্তবিক ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন নহে। যাঁহারা বলেন এক ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে হইলে, অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়, তাঁহাদের কথা সত্য নহে। সকল শাস্ত্রেরই যে পরস্পর সামঞ্জস্য আছে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে। একটু চিন্তা করি-লেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মূল মত একরূপ; তবে কোনটী বিস্তৃত, কোনটী সংক্ষিপ্ত, কোনটী সার্ব্বভৌমিক, কোনটী প্রাদেশিক, কোনটী সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ, কোনটী আংশিক, কোনটীতে কেবল সাধারণ সূত্র-গুলি আছে, কোনটীতে তৎসহ বিশেষ বিধির সূত্রগুলিও আছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত। ঈশ্বরপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ ও অনুষ্ঠানপ্রকরণ। এক এক করিয়া এই তিন ভাগেরই আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রসকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত সকল শাস্ত্রেরই সহিত সকল শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

ঈশ্বরপ্রকরণ।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মতেই ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্ট, ঈশ্বরের উপাসনা সকলেরই কর্ত্তব্য, ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরেরই প্রণীত এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনা ও কার্য্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী এবং মানবের জ্ঞানাতীত। সকল শাস্ত্রেরই মতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে চলিলে স্বর্গসুখ পাওয়া যায়, না চলিলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অতএব সকল শাস্ত্রেরই মত এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ একরূপ, কোনও ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিতই এ সকল বিষয়ে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেরই কিছুমাত্র বিরোধ নাই। ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসনার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন-প্রকার হইলেও মূলতঃ সকল শাস্ত্রেরই মত এক।

ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরকৃত হইলেও ঈশ্বর যে স্বহস্তে কালী কলম লইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা নহে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে তিনি যোগী ঋষি ও ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই ভক্তমুখে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যোগ-প্রভাবে যোগিগণ তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্ত ও যোগিগণ দিব্য চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পান, অন্যে পায় না, এ কথা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সম্মত। সুতরাং বলিতে হইবে, যে ভক্তের যেমন প্রবৃত্তি, যেমন সাধনা, যেমন আবশ্যক জ্ঞান, তিনি তদনুরূপ মূর্ত্তিই দেখিয়া থাকেন; তাই ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার ভিন্ন ভিন্নপ্রকার মূর্ত্তি এবং ভিন্ন ভিন্নপ্রকার উপাসনা-প্রণালী। যে ভক্ত যে শাস্ত্রের প্রচারক, তিনি তদ্দৃষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তির বিষয় প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং ভিন্ন ভিন্নপ্রকার হইলেও সে সমস্তই ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ ও প্রকৃত উপাসনা-প্রণালী। সকল শাস্ত্রেরই মতে তিনি সর্ব্বময় ও সর্ব্বস্বরূপ, সুতরাং কোনও মূর্ত্তি বা কোনও প্রণালীই মিথ্যা নহে।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

গীতা।

তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ঈশ্বর বল, (God) গড্ বল বা খোদা বল, তাহাতে যেমন কোন ভেদ নাই, সেইরূপ তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কৃষ্ণ বল, খৃষ্ট বল, বুদ্ধ বল, আল্লা বল, তাহাতেও কোন ভেদ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী, গণেশ, সবিতা সমস্তই তাঁহারই জ্ঞাপক। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া খৃষ্টান যে খৃষ্টের পূজা করেন, মুসলমান যে মহম্মদের পূজা করেন, হিন্দু যে রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির পূজা করেন, সমস্তই ঈশ্বরপূজা। সুতরাং কোনও শাস্ত্রই মিথ্যা বা পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য প্রচার করে নাই; সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে এক মত।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, উপাসনাপ্রণালীতেও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। কারণ কেহ পুষ্পপত্র হস্তে করিয়া তাঁহার উদ্দেশে ইষ্টমূর্ত্তির চরণে অর্পণ করেন, কেহ সেই পুষ্পপত্র গুচ্ছ করিয়া বেদিতে রাখিয়া ও দ্বারে ঝুলাইয়া দিয়া তাঁহার পূজা করেন; কেহ সংস্কৃতে, কেহ ইংরাজীতে, কেহ আরবীতে মন্ত্র পাঠ করেন; কেহ বারবিশেষে পূজা করেন, কেহ তিথিবিশেষে পূজা করেন; কেহ দশ জনের সহিত মিলিত হইয়া তারস্বরে স্তব পাঠ করেন, কেহ নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার ধ্যান করেন; কেহ কাঁসর ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজাইয়া পূজা করেন, কেহ মন্দিরে টাঙ্গান ঘণ্টা বাজাইয়া ও হার-মনিয়মাদির স্বরসংযোগে গান করিয়া পূজা করেন; কেহ মন্দিরে, কেহ মস্‌জিদে, কেহ গির্জ্জায় বসিয়া পূজা করেন, কেহ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পূজা করেন; কেহ সম্মুখস্থ মূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ হৃদয়ে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করেন; কেহ অন্ন জলাদি দ্বারা পূজা করেন, কেহ বা ধ্যান স্তব জপাদি দ্বারা পূজা করেন। অন্ন জল

বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি পূজার উপকরণ-দ্রব্য সকল যেমন তাঁহার বই আমাদের নয়; ধ্যান ধারণা জপ তপ প্রভৃতিও সেইরূপ তাঁহার বই আমাদের নয়। সকলেই তাঁহারই দ্রব্য তাঁহাকে দিয়াই পূজা করেন; আমাদের নিজস্ব কি আছে যে, তাঁহাকে দিব ?

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

গীতা।

যদি তাঁহারই দেওয়া বলিয়া অন্ন জল বস্ত্র অলঙ্কারে তাঁহার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাঁহারই দেওয়া জপ তপ গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রয়োজন নাই বলিতে হইবে। তাঁহার আমি তাঁহার দ্রব্য ভিন্ন আমার নিজের দ্রব্য কোথায় পাইব ? তাঁহারই দত্ত ভক্তিভরে, তাঁহারই দত্ত শক্তি অনুসারে, তিনি যেরূপ বুঝাইয়া দেন সেই রূপ বুঝিয়া, তাঁহার আমি তাঁহারই দত্ত ভাবভরে তাঁহারই দত্ত দ্রব্য দিয়া তাঁহার পূজা করি। তিনি যাহাকে যেমন অবস্থা দিয়াছেন, যেমন শক্তি দিয়াছেন, সে তদনুরূপই পূজা করে। পণ্ডিত বিষ্ণবে নমঃ ও মূর্খ বিষ্টায় নম বলিয়া তাঁহার পূজা করে; উভয় পূজাই তিনি সমান ভাবে গ্রহণ করেন, এবং সাধক উভয় পূজাতেই সমান ফল প্রাপ্ত হন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা।

যদি ঈশ্বর থাকেন ও তাঁহার পূজার আবশ্যক হয়, তবে বিশ্বাস ও ভাবভরে যিনি যেরূপেই তাঁহার পূজা করুন, তাহাতেই যে ফললাভ হইবে, তাহাতে আর কথা কি ? রাম রহিমে ভেদ নাই, চন্দন গোময়েও ভেদ নাই। অক্রুর ভক্তিভাবে কদলীর পরিবর্ত্তে তাহার ত্বক্ খাইতে দিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃষ্ণ তুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই প্রথম

অংশ অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনা-প্রণালী একইপ্রকার। মূলতঃ এ অংশে ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের কিছুমাত্র মতভেদ নাই। অন্ততঃ হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এ বিষয়ে বিরোধ নাই। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে নিরাকার নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের উপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষ শিলা পর্য্যন্ত সকলেরই উপাসনাপ্রণালী আছে, সকল অবস্থার উপযোগী ঈশ্বরতত্ত্ব ও উপাসনাপ্রণালী আছে ও তৎসমস্তেরই অনুরূপ পূজাপ্রণালী আছে।

যাঁহারা দেবদেবীর পূজা করেন, তাঁহারাও ঈশ্বরেরই পূজা করেন।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥

গীতা।

যেমন ক্ষুধা হইলে অন্নের ও রোগ হইলে ঔষধের শরণ লইতে হয়, সেইরূপ ধনার্থীরা লক্ষ্মীর, বিদ্যার্থীরা সরস্বতীর, পাপনাশার্থীরা গঙ্গার শরণাপন্ন হয়েন। নির্গুণ বা সর্ব্বগুণময় ব্রহ্মের নিকট নির্দ্দিষ্ট কামনা সম্ভবে না; তাই তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ঐশী শক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন বিষয় প্রার্থনা করেন। কামনা জন্য পূজা দেবদেবীর নিকটই করা বিহিত; পূর্ণ ব্রহ্মে নিষ্কাম পূজা ভিন্ন সকাম পূজা সম্ভবে না।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥

গীতা।

এইরূপ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজা করিলে ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মে ও পূজা সফল হয়। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার বিরোধভাব নাই। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র অনেক

ও বিবিধপ্রকার বলিয়া এ বিষয়ে কোন সংশয় জন্মিবার হেতু নাই; পরস্পর কেহ কাহাকেও পাপী ভাবিয়া ঘৃণা করিবার হেতুও কিছু নাই। সকলেরই পিত্রবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তিই সত্য। অতএব যিনি স্বধর্ম্মে বিশ্বাসবান্ হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিবিশেষের সেবা করেন, তাঁহার কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিরোধাচরণ করা হয় না। এবং যদি স্বধর্ম্মে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া অন্য শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তির পূজা করেন, তাহাতেও স্বধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয় না। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই এরূপ উপাসনা করিবার নিষেধ নাই। ভক্ত হিন্দু যদি কৃষ্ণ ও খৃষ্ট উভয়কে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেন, তাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে অবৈধ কার্য্য করা হইবে না। খৃষ্টের শরণ না লইলে পরকালে উদ্ধার হইবে না, এই কথাই খৃষ্টধর্ম্ম-শাস্ত্রে আছে; এমন কোন কথা নাই যে, খৃষ্টের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের উপাসনা করিলে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই ঐরূপ মত, অর্থাৎ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে পূজা করিতে বলিয়াছেন মাত্র। সেরূপ করিয়া যদি অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরমূর্ত্তির তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে পূজা করা যায়, তাহা যে অবৈধ হইবে, এ কথা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। তবে যে মুসলমান অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে কাফের বলেন, ও খৃষ্টান অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হিদেন বা পৌত্তলিক বলেন, সে কেবল মূর্খতা জন্য। তাঁহারা জানেন না যে কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি সামান্য পুত্তলিকা নহে। হিন্দু যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে ম্লেচ্ছ বলেন, সে ভিন্ন দেবতার উপাসক বলিয়া নহে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচারসম্পন্ন বলিয়া; ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানপদ্ধতির পরতন্ত্র না হইলে মানব প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর ও ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে পারে না বলিয়া। অনুষ্ঠানপ্রকরণে এ বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। ফলতঃ শাক্ত যেমন বিষ্ণু শিব গণেশ সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করেন, বৈষ্ণব যেমন শক্তি শিব সূর্য্য গণেশাদির পূজা করেন, শৈব যেমন শক্তি বিষ্ণু সূর্য্য

গণেশাদির পূজা করেন, সেইরূপ যদি সকলেই সকল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেবতারই যথাসাধ্য পূজা করেন, অথবা অসাধ্য হইলে অপরের দেবতাকে ঘৃণা না করিয়া মান্য করেন, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে উপাসনা সম্বন্ধে কোন ভেদই থাকে না। তাহাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করাও হয় না। ঘৃণা করিলেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। কেননা সমস্তই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তির অবমাননা করিলে ঈশ্বরেরই অবমাননা করা হয়; তাই হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চ সাকার-উপাসক ও নিরাকার-উপাসক সমস্তই মিলিত হইয়াছে। অধিক কি, হিন্দু দেববিদ্বেষী বুদ্ধকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। হিন্দু যে পীরের সিন্নি দেন, গোঁয়ারা করেন এবং বড়দিনে গৃহ সজ্জীভূত করেন, তাহা কর্ত্তব্য ভিন্ন অকর্ত্তব্য নয়। বস্তুতঃ সম্প্রদায়বিশেষ যাহাকে ঈশ্বরমূর্ত্তি বিবেচনা করিয়া পূজা করেন, কোন সম্প্রদায়েরই তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য নয়। তাঁহাকে ভক্তি না করিলেও অভক্তি করা উচিত নয়। এক সম্প্রদায় যেরূপে ঈশ্বরের পূজা করেন, অন্যে সেরূপে পূজা না করিয়া অন্য রূপে করেন বলিয়া তাহা কাহারও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়; স্বেচ্ছাপূজাই শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যাঁহারা অহঙ্কারপরায়ণ হইয়া শাস্ত্র-প্রণালী ঠিক নহে, আমিই ঠিক বুঝিয়াছি, মনে করিয়া নিজের ইচ্ছামত পূজা করেন, তাঁহারা অতি বড় ভক্ত হইলেও নিন্দিত; তাঁহাদের তপস্যা অতি বড় কঠোর হইলেও আসুরিক। যথা—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

গীতা।

নীতিপ্রকরণ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বিতীয় অংশ নীতিপ্রকরণ। এ অংশেও ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ নাই। কারণ সত্য বাক্য বলা উচিত, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, পরদ্রব্য ও পরদার গ্রহণ করা অনুচিত, হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের বশীভূত হওয়া উচিত নয়, সকল মনুষ্যকে আপনার ন্যায় দেখা উচিত, সাধ্য মত সকলেরই উপকার করা কর্ত্তব্য, কাহারও অনিষ্ট করা উচিত নয়, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত, কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দমন এবং দয়া ক্ষমা বিনয় ধৃতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের পরিবর্দ্ধন করা উচিত ইত্যাদি সাধারণ নীতিবাক্য সকল শাস্ত্রেরই একরূপ। এ বিষয়ে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সহিত কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিরোধ নাই। কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে নাই যে, সত্য বলিলে ও পরের অনিষ্ট না করিলে পাপ হইবে। তবে যে কোন কোন বিষয়ে শাস্ত্রবিশেষে কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়, সে কেবল দেশ, কাল ও পাত্রভেদ জন্য।

এ জগতে এমন কোনও বিষয় নাই যে, তাহা সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ও সকল ব্যক্তির পক্ষে কেবলই শুভ বা অশুভ ফল প্রসব করে। সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলজনক ও সর্ব্বাঙ্গীন অমঙ্গলজনক বিষয় এ জগতে নাই। যাহা অবস্থাবিশেষে একান্ত হিতকর, তাহাই আবার অবস্থাবিশেষে ভয়ানক অনিষ্টের হেতু। যে আহার ভিন্ন প্রাণ রক্ষা হয় না, অবস্থাবিশেষে সেই আহারই প্রাণনাশক; যে দয়া সমূহ মঙ্গলের নিদান, সেই দয়াই অবস্থাবিশেষে অশেষ অমঙ্গলের কারণ; যে কাম ক্রোধাদি মহান্ রিপু নামে আখ্যাত ও মহানিষ্টকর বলিয়া সাধারণ্যে

পরিচিত, তাহাদের পরিচালনার এককালীন অভাবে সৃষ্টিলোপ হয়। সুতরাং কোনও নীতিবাক্যেরই অবলম্বনে কার্য্য করিলে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় শুভ ফল ফলে না। সকল নীতিরই বিশেষ স্থল আছে, সকল নীতিবাক্যেরই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ঐ ব্যতিক্রমস্থলগুলি বিশেষবিধি নামে আখ্যাত ও নীতিবাক্যেরই অন্তর্গত। কোন কোন শাস্ত্রে কেবলমাত্র সাধারণ বিধিগুলি আছে ও কোন কোন শাস্ত্রে তৎসঙ্গে বিশেষ বিধিগুলিও আছে। সেই বিশেষ বিধিগুলি দেখিয়া যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষকে নীতিবিরোধী মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা কি জানেন না যে, অন্ন অনেক সময়ে বিষ হয় এবং অনেক সময়ে বিষ ঔষধ হয়? 'অন্ন দেওয়া উচিত' এই সাধারণ নীতিবাক্যের উপর আস্থা রাখিয়া যে সময়ে অন্ন ভোজনে প্রাণনাশ হয়, সে সময়ে যদি অন্ন দেওয়া হয়, এবং কাহাকেও বিষ প্রদান করা অনুচিত এই সাধারণ বিধিপরায়ণ হইয়া যে সময়ে বিষ প্রয়োগ ব্যতীত প্রাণ রক্ষা হইবে না, সে সময়ে যদি বিষ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কি অন্যের প্রাণ নাশ করা হয় না? কোন্ সময়ে অন্ন বিষ হইবে ও কোন্ সময়ে বিষ ঔষধ হইবে, অনেকের পক্ষে তাহা জানা অসাধ্য; এই জন্য সাধারণ বিধি বা নীতি এই যে, ক্ষুধা হইলে অন্ন দেওয়া উচিত, এবং কখনও কাহাকেও বিষ দেওয়া অনুচিত। কিন্তু তৎসঙ্গে হিতকর স্থলে ঐ বিধির অন্যথাচরণ করা যায়, এরূপ বিধি যদি না থাকে, তাহা হইলে অতি বিচক্ষণ চিকিৎসকও বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া পাপভয়ে অন্ন ভোজন বন্ধ করিয়া বা বিষপ্রয়োগ দ্বারা কাহারও প্রাণরক্ষারূপ কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারেন না। ঐরূপ, সত্য, অহিংসা, দয়া প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর; এবং মিথ্যা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে হিতকর।

সত্যবাক্য কথন যে পুণ্যজনক ও কর্ত্তব্য, এবং মিথ্যা বাক্য কথন

যে পাপজনক ও অকর্ত্তব্য, তাহার কারণ এই যে, সত্যজ্ঞান না হইলে মানুষ তদবলম্বনে প্রকৃত হিতকর কার্য্য করিতে পারে না, মিথ্যাকে সত্যজ্ঞানে কার্য্য করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হইয়া অনিষ্টই হয়; তাই সত্যের এত মান ও মিথ্যার এত নিন্দা। এই জন্য মিথ্যা বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া কাহারও অনিষ্ট করা উচিত নয়। কিন্তু যেরূপ মিথ্যায় ইষ্ট সাধিত হয়, সেরূপ মিথ্যাকে মিথ্যা বলা যায় কি প্রকারে? মনে কর, আমি তোমার নিকটে টাকা চাহিতে গেলাম, তুমি বলিলে কল্য দিব; আমি তদনুসারে কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য করিবার বন্দোবস্ত করিলাম; কিন্তু তুমি টাকা দিলে না, তাহাতে আমার ক্ষতি হইল— তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমি যে কার্য্যবিশেষ আরম্ভ করিয়াছিলাম, অর্থাভাবে তাহা শেষ করিতে না পারায় সমূহ অনিষ্ট হইল। কাযেই তোমার সে মিথ্যা কথা অনিষ্টজনক। কিন্তু তুমি যদি বল কল্য টাকা দিব না, দশদিন পরে দিব, বার বার প্রয়োজন জানাইলেও শেষে যদি বল বৃথা কেন বিরক্ত করিতেছ, কিছুতেই কল্য টাকা পাইবে না, ও পরে যদি সুবিধা হওয়ায় সেই টাকা পাঠাইয়া দেও, তাহা হইলে ত তোমার মিথ্যা বলা হইল। কিন্তু সেই টাকা পাইয়া আমার যথেষ্ট উপকার হইল—দেনার দায়ে সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছিল, সেই টাকায় সে সম্পত্তি রক্ষিত হইল। এরূপ মিথ্যায় যখন অনিষ্ট না হইয়া সমূহ মঙ্গল হয়, তখন ইহাকে মিথ্যা বলিব কি প্রকারে? সুতরাং একটী প্রযুক্ত শব্দের প্রয়োগে তাহার যে অর্থ হয়, তাহার উপরই সত্য মিথ্যা নির্ভর করে না। যাহা নীতিসঙ্গত হিতকর, তাহাই সত্য; ও যাহা নীতিবিরুদ্ধ অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। সত্য মিথ্যার সহিত হিতাহিতের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সত্যের এত মান, ও মিথ্যার এত নিন্দা। অবস্থাবিশেষে সত্যই মিথ্যাস্বরূপ ও অবস্থাবিশেষে মিথ্যাই সত্যস্বরূপ হয়। কোন্ সময়ে সত্য মিথ্যাস্বরূপ এবং কোন্ সময়ে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, বিশেষ

বিধি সকল তাহাই বুঝাইয়া দেয়। সকল নীতি সম্বন্ধেই এই নিয়ম। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে না পারিলে সকল নীতিই কুফল প্রসব করে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল নিকৃষ্ট হইলেও যেমন এককালে পরিত্যাজ্য নয়, উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি উৎকৃষ্ট হইলেও সেইরূপ নিয়ত অবলম্বনীয় নয়। অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের প্রয়োগ করিলে যেমন অনিষ্ট ও তজ্জন্য পাপ হয়, সেইরূপ অবস্থা বিবেচনা না করিয়া সত্য, অহিংসা, দয়া, বিনয় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের প্রয়োগ করিলেও সমূহ অমঙ্গল ও তজ্জন্য পাপ হয়। ঈশ্বর, কি নিকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্ট, যে সকল বৃত্তি মানবকে প্রদান করিয়াছেন, তৎসমস্তেরই পরিচালন আবশ্যক, নচেৎ জীবস্থিতি সম্ভবে না। অতএব, অযথা প্রযুক্ত না হইতে পারে, এই জন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসমূহের দমন করা যেমন কর্ত্তব্য, উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলেরও সেইরূপ দমন করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিও যাহাতে অযথা প্রযুক্ত না হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পরস্পর বিরোধভাবাপন্ন। ক্রোধ ক্ষমা, হিংসা অহিংসা, দম্ভ বিনয়, ইন্দ্রিয়সুখ-সাধন ইন্দ্রিয়সুখ-বিরতি, ভোগ ত্যাগ, অপহরণ দান, পরানিষ্টকরণ পরোপকার, অভক্তি ভক্তি, আসক্তি বৈরাগ্য, দ্বেষ প্রেম, সমস্তই পরস্পর বিরোধী। ইহার একের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অন্যের লোপ হয়। ইহার প্রথমগুলি নিকৃষ্ট ও শেষের-গুলি উৎকৃষ্ট হইলেও সকলগুলিরই প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহার কোনওটি যদি মানবহৃদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে মানবসমা-জের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং ঐগুলির এমন ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, কোনওটী এমন প্রবল না হয় যে, তাহাতে তাহার বিপরীত বৃত্তিটীর লোপ হয়। ইহারা সমস্তই সহজাত, সুতরাং পরস্পর ভ্রাতৃতুল্য। একের বিলোপ করিলে ভ্রাতৃবধপাপ জন্মে।

কালিদাস বলিয়াছেন "গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব।" বস্তুতঃ সহোদরের ন্যায় পরস্পরের রক্ষা করা উচিত। তবে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রবল ও অত্যন্ত সুখপ্রদ বলিয়া দুর্দ্দান্ত; পাছে তাহারা উৎকৃষ্ট সহোদরগুলিকে বিনাশ করে, এই ভয়ে তাহাদিগের দমনে ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির পরিবর্দ্ধনে অধিক যত্ন করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলির এমন দমন করিলে চলিবে না ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির এমন পরিবর্দ্ধন করিলে চলিবে না যে, তাহাতে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির বিনাশ সাধন করে। যাহাতে উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি অনেক সময়েই বিবেকের নিদেশ মানে না বলিয়াই উহা নিকৃষ্ট,—উহারা স্বস্ব প্রধান ও স্বাধীনতাপ্রিয় বলিয়াই নিকৃষ্ট,—উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অস্তিত্ব নষ্ট করে বলিয়াই নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি যদি ঐরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় হয় ও বিবেকের আদেশ পালন না করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির বিলোপ সাধন করে, তবে সেগুলিও যে নিকৃষ্টের মধ্যে পরিগণিত হইবে। তবে সচরাচর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-গুলিই প্রবল হয়, ঐ বৃত্তিগুলি মানুষকে এককালে আয়ত্ত করিয়া ফেলে; তাই শাস্ত্রকারেরা ঐগুলির দমন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির পরিবর্দ্ধন করিবার সাধারণ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

সকল শাস্ত্রেরই মতে সদা সত্য কথা বলা উচিত, কদাচ মিথ্যা বলা উচিত নয়। ঐরূপ সকল শাস্ত্রেরই মতে অহিংসা পরমোধর্ম্ম এবং আত্মরক্ষা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে সত্য কথা বলিলে পরের অনিষ্ট করিতে হয় বা আত্মনাশ সম্ভব হয়,—অথবা যেখানে পরের হিত সাধন বা আত্মরক্ষা করিতে হইলে মিথ্যা বলার প্রয়োজন হয়, সে স্থলে কি করিবে? এরূপ স্থলে সাধারণ বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে ত মানুষকে একাধিক পাপের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। হয় পরের উপকার বা

আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা বলিতে হইবে, না হয় সত্যপালন জন্য পরের অনিষ্ট বা আত্মনাশ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে যদি বিশেষ বিধির আশ্রয় না লইতে পারা যায়, তাহা হইলে কোনও ব্যক্তিরই পাপের হস্ত হইতে—দুর্নীতির কবল হইতে নিস্তার পাইবার উপায় থাকে না; একটা না একটা পাপ করিতেই হইবে। কিন্তু যদি বিশেষ বিধির আশ্রয় লইতে পারা যায়, তাহা হইলে বুঝিয়া চলিতে পারিলে কোনও পাপেরই পরবশ হইতে হয় না। সুতরাং বিশেষ বিধিগুলি নীতির বিরুদ্ধ নহে, পরিরক্ষক। যে সত্য অহিংসা, দম, অস্তেয় প্রভৃতি নীত্যন্তর-বিরোধী, তাহা নীতি নহে; এবং যে মিথ্যা, হিংসা, স্তেয় প্রভৃতি নীত্যন্তরের পরিরক্ষক, তাহাও দুর্নীতি নহে।

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্মবৎ।"

কতকগুলি নিরীহ ভদ্রলোক দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য এক নিবিড় বন মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। এক সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়াছিলেন, দস্যুগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সত্য বলা উচিত মনে করিয়া তাঁহাদিগের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। তখন দস্যুগণ তাঁহাদের সকলের প্রাণ বধ করিল। এরূপ স্থলে মিথ্যা বলিয়া এতগুলি নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা নীতিবিরুদ্ধ? না, সত্য বলিয়া নিরপরাধ বহুতর মানবের প্রাণবধ করান নীতিবিরুদ্ধ? যুধিষ্ঠির গাণ্ডিবের নিন্দা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন পূর্ব্বসত্য রক্ষার অনুরোধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ যদি বিশেষ বিধির প্রয়োগে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুন সত্যরক্ষা-রূপ ধর্ম্ম পালনের জন্য পূজনীয় ধার্ম্মিকপ্রবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণনাশ-রূপ মহৎ অকার্য্য করিতেন। ঐরূপ, বিশেষ বিধি না থাকায় ইউরোপের ধার্ম্মিকগণও অনেক নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন। কথার সত্যতা রক্ষার অনুরোধে অনেক সময়ে তাঁহারা শত শত লোকের, এমন কি, সমগ্র সমাজের সমূহ অনিষ্ট সাধন করেন।

কেবলমাত্র বিশেষ বিধির অভাবে ভীমসভা, নিহিলিষ্টসভা প্রভৃতি শত শত সভা ইউরোপের নানা অনিষ্ট করিতেছে। যাঁহারা শাস্ত্রবিশ্বাসী ধার্ম্মিক, তাঁহারাও সাধারণ-বিধি-নির্দ্দিষ্ট পাপ-ভয়ে ঐ সকল অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারেন না। প্রত্যুত তাঁহারা পাপভয়েই মহাপাপের অনুষ্ঠানপরায়ণ হয়েন। এই সকল সভা অনেক ধার্ম্মিক শাস্ত্র-বিশ্বাসী লোককে আপনাদের সভার সভ্য করিবার জন্য এমন অব-স্থায় ফেলেন যে, হয় তাঁহাদিগকে সভ্য হইবার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে, না হয় আপনার প্রাণ দিতে হইবে! অনেকে প্রাণ-পণ করিয়া স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হয়েন ও পরিশেষে তাঁহাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। যাঁহাদের প্রাণের প্রতি মমতা আছে, তাঁহারা অগত্যা প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাদের দলভুক্ত হয়েন। পাছে সত্যভঙ্গরূপ পাপ হয়, এই ভয়ে তাঁহারা জনসমাজে কিছুই প্রকাশ করেন না, ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা উচিত মনে করিয়া শত শত অকার্য্য করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়েন। কদাচ মিথ্যা বলা উচিত নহে, এই সাধারণ বিধির বশবর্ত্তী হইয়া য়ুরোপীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশ্বাসিগণ পাপভয়ে কেহ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, কেহ বা সেই দল-ভুক্ত হইয়া শত শত অপকর্ম্ম করেন। তাঁহারা যদি বিশেষ বিধির আশ্রয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিয়া পরে সেই সত্য ভঙ্গ করিয়া তাহাদের দমনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কি সত্যভঙ্গ-জনিত যে পাপ হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পুণ্যসঞ্চয় হয় না? অধার্ম্মিকের হস্তে স্বীয় মূল্যবান্ প্রাণ বিসর্জ্জন অধিক কর্ত্তব্য? না, হিতোদ্দেশে মিথ্যা বলিয়া অধার্ম্মিকগণের হস্ত হইতে নিজের মূল্যবান্ জীবন রক্ষা ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মহৎ হিতসাধন অধিক কর্ত্তব্য? পাপকার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অধিক দূষণীয়? না, নীতি-বিরুদ্ধ সত্য রক্ষার জন্য সেই পাপব দলভুক্ত হইয়া শত শতপ্রকার

পাপ ও পৈশাচিক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা অধিক দূষণীয়? এরূপ স্থলে সত্যভঙ্গ করিলে পাপ নাই, প্রত্যুত পুণ্যসঞ্চয় হয়, এই বিশেষ বিধি যদি পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে থাকিত, তাহা হইলে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কেহ কাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। জনসাধারণে প্রচারিত হইবার ভয়ে কেহই সে চেষ্টা করিত না। সুতরাং এরূপ ভীমসভা সকলের সৃষ্টিই হইত না। অতএব বিশেষ বিধি সকল সাধারণ বিধি সকলের বিরোধী নহে, প্রত্যুত সমন্বয়কারক।

যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ বিধি সকল নাই, সে সকল শাস্ত্রাবলম্বিগণ শাস্ত্রনিদেশবর্ত্তী হইয়া চলিলে সংসারের কার্য্য চলে না দেখিয়া শাস্ত্রবিশ্বাস সত্ত্বেও সময়ে সময়ে শাস্ত্রবিধির বিরোধী কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন। প্রয়েজন জন্য ঐরূপ করিতে করিতে পাপপথে যাইবার প্রবৃত্তি বাড়িয়া যায়। একটু একটু করিয়া শাস্ত্র অমান্য করিতে করিতে এককালে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়েন—সীমা অতিক্রম করেন। পাপপথে একবার প্রবেশ করিলে ক্রমে পাপের প্রতি অশ্রদ্ধা কমিয়া যায়, তখন তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা বড় কঠিন। তখন অতি প্রয়োজনীয় বিধিও পালন করে না। খৃষ্ট বলিয়াছেন 'এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিবে' অর্থাৎ মানুষ যতই অত্যাচার করুক না কেন, কখনই তাহার প্রতিশোধ দিবে না, ক্ষমাই করিবে। কেবল যে ক্ষমা করিবে তাহা নহে, এমন সহিষ্ণুতা দেখাইবে যে, আহ্লাদ করিয়া আরও অত্যাচার করিতে দিবে। কিন্তু এরূপ করিলে সংসার চলে না, কাযেই লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুসারে চলিতে পারে না। যখন শাস্ত্র অমান্য করিল, তখন ক্রমে সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। তাই যে পাশ্চাত্য ধর্ম্মপরায়ণের মতে এক গালে চড় খাইয়া আর এক গাল ফিরাইয়া দিতে হয়, সেই পাশ্চাত্যগণ এক্ষণে ভয়ানক প্রতিশোধপরায়ণ হইয়াছেন!!!

তাঁহাদের অন্যায়কারী কোন স্বদেশীয় যদি ভিন্নদেশীয় কোন ন্যায়ানুষ্ঠানকারী কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ নিগৃহীত হয়েন, তাহা হইলেও দেশের সকল লোকে বদ্ধপরিকর হইয়া সেই নিগ্রহকারী যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশের সকলেরই বিনাশ সাধন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন—তাঁহাদের স্বাধীনতা, ধন, মান, প্রাচীন কীর্ত্তি সমুদয় ধ্বংস করেন। একজনের কৃত অপরাধের প্রতিশোধ দিবার জন্য সমগ্র দেশবাসীর উচ্ছেদ সাধন করেন। বুদ্ধ বলিয়াছেন 'অহিংসা পরমধর্ম্ম'। সুতরাং যজ্ঞ বা কোন প্রয়োজনীয় স্থলেও কোন জীবের প্রাণনাশ করা অবৈধ; কিন্তু তাহা করিলে চলে না—ব্যাঘ্র, সর্প, মশক, মৎকুণ প্রভৃতি না মারিলে চলে না; শরীর রক্ষার জন্যও সময়ে সময়ে মাংস ভোজন আবশ্যক; কাযেই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিতে হইল। যখন তাহার লঙ্ঘন করিতে হইল, তখন তাহার সীমা থাকিল না; তাই অহিংসা-পরম-ধর্ম্ম-বাদী বৌদ্ধ চীনবাসীরা তৈলপায়িক পর্য্যন্ত ভক্ষণ করেন। এমন প্রাণী নাই যে, তাহার প্রাণ বধ করিয়া তাহার মাংস না খান! এমন হিতকারী যে গোজাতি, সামান্য মাংসের লোভে সেই পরম হিতকারী জন্তুর প্রাণবধে কোনও দেশীয় জনগণই ইতস্ততঃ করেন না। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে বিশেষ বিধি নাই বলিয়া তদনুসারে চলিলে সংসারকার্য্য চলে না দেখিয়াই দিন দিন লোকের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা জন্মিতেছে। এবং সেইজন্য তথাকার ধর্ম্মভীরুগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নীতিমার্গের আশ্রয় লইতেছেন—হিতবাদদর্শন প্রভৃতির প্রণয়ন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয়ের উপায় করিতেছেন। কিন্তু যদি শাস্ত্রীয় বিশেষ বিধির আশ্রয়ে প্রয়োজনানুসারে সাধারণ বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য করা যায়, তাহা পাপজনক বলিয়া মনে হয় না, প্রত্যুত শাস্ত্রানুমত কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানে পাপপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয় না। হিন্দুর শাস্ত্রে বিশেষ বিধি সকল থাকায় প্রয়োজনীয় স্থলে শাস্ত্র লঙ্ঘন

করিতে হয় না; তাই হিন্দু এত শাস্ত্রপরায়ণ, এবং তাই হিন্দু পাশ্চাত্য-গণের ন্যায় প্রতিশোধপরায়ণ নহেন, বৌদ্ধের ন্যায় মাংসাশী নহেন। শাক্তগণ ধর্ম্মকার্য্য উপলক্ষে ঢাক ঢোল বাজাইয়া পশু বধ করেন বটে, কিন্তু কসাইদিগের ন্যায় নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। বৃথা মক্ষিকা-নাশেও শাস্ত্রপরায়ণ শাক্তগণ কষ্ট বোধ করেন।

বিশেষ বিধি সকলের সুপ্রয়োগ করিতে না পারিয়া অশিক্ষিত জনগণ পাছে অধিক অনিষ্ট করে ও সাধারণ বিধির প্রতি আস্থাশূন্য হয়, সেই জন্য শিশুশাস্ত্র সকলে বিশেষ বিধি সকলের উল্লেখ নাই। যে জাতির যেমন ধারণাশক্তি, সেই জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র তদনুরূপ। তাই, কোন্ স্থলে বিশেষ বিধির প্রয়োগ করা উচিত, তাহা বুঝিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহাদের শাস্ত্রে বিশেষ বিধির উল্লেখ হয় নাই। শিশুরা ধারণা করিতে পারে না বলিয়া যেমন তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে সাধারণ বিধিগুলি মাত্র থাকে, অসভ্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিতেও সেইরূপ সাধারণ নীতিবাক্য মাত্রই থাকে। শিশুরা সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ শেষ করিয়া যখন বৃহৎ গ্রন্থে বিশেষসূত্রগুলি শিখে, তখন কি বলিতে হইবে যে, এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ব শিক্ষার বিরুদ্ধ ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থ পড়িতেছে? না, মনে করিতে হইবে এত দিনে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে? ভারত ভিন্ন অন্যান্য দেশে যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, সেগুলি শিশুধর্ম্মশাস্ত্র—Beginer's ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই তাহাতে কেবল সাধারণ বিধিগুলি আছে। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বয়োধিকের পাঠ্য গ্রন্থের ন্যায় উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্র—পূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই ইহাতে সাধারণ বিধি ও বিশেষ বিধি সমস্তই আছে। সুতরাং উহার নীতিপ্রকরণ ঐ সকল শিশুধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী নহে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ সংস্করণ।

যে সময়ে মানব কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তিপরায়ণ পশুভাবাপন্ন ছিল, কাহারও কিছুমাত্র ধর্ম্মভাব ছিল না, সে সময়ের শাস্ত্রকারগণ নিকৃষ্ট বৃত্তির দমন ও

উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য কেবল সাধারণ বিধিগুলিরই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কালে যখন ধৰ্ম্মশাস্ত্রপরায়ণগণ ঐ সকল বিধির পরতন্ত্র হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির অত্যধিক দমন ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির অত্যধিক পরিচালন আরম্ভ করিলেন, ও তজ্জন্য সমাজ ও সংসার-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল, তখন বিশেষ বিধিগুলির প্রয়োজন হওয়ায় ধৰ্ম্মশাস্ত্রে তাহার স্থান লাভ হইল। যে সকল ধৰ্ম্মশাস্ত্র উন্নতিশীল নহে, সেই সকল শাস্ত্রে সেই সাধারণ বিধিগুলিই রহিয়া গেল, হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় উন্নতিশীল ধৰ্ম্মশাস্ত্র সকলে বিশেষবিধি সকলের সন্নিবেশ হইল। যে হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান ও দান করা একান্ত কর্ত্তব্য, সেই হিন্দু-শাস্ত্রেরই মতে মূর্খ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে বা দান করিলে মহাপাপ হয়। যখন ব্রাহ্মণগণ সকলেই বেদপরায়ণ ও ধাৰ্ম্মিক ছিলেন, তখন প্রথমোক্ত সাধারণ বিধি দ্বারাই কার্য্য সম্পাদিত হইত। পরে যখন ব্রাহ্মণগণ বিপথগামী হইয়া উঠিলেন, তখন শেষোক্ত বিশেষ বিধির প্রয়োজন হইল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণরক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা, মূর্খ ব্রাহ্মণ রক্ষায় সে প্রয়োজন সাধিত হয় না বলিয়াই প্রকৃত ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য শেষোক্ত হিতকর বিশেষ বিধি প্রণীত হইল। এ বাক্য দুইটি যেমন পরস্পর বিরোধী নহে, সেইরূপ কোন ধৰ্ম্মশাস্ত্রের সহিতই হিন্দুধৰ্ম্মশাস্ত্রের নীতিগত প্রভেদ নাই। মূলে সকল ধৰ্ম্মশাস্ত্রের নীতিবাক্য সকল একইপ্রকার।

অনুষ্ঠান-প্রকরণ।

কিরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলে মানবের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে, নীতি-মার্গের অনুসরণে প্রবৃত্তি জন্মে, প্রবল পাশব বৃত্তির দমন ও দুর্ব্বল মানবীয় বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া নীতিমার্গের অনুসরণ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং স্বার্থসাধন অপেক্ষা ঈশ্বরসেবায় ও পরার্থসাধনে অধিক আনন্দ অনুভব হয়, অনুষ্ঠানপ্রকরণে তাহাই শিক্ষা দেয়। হিন্দু ধৰ্ম্মশাস্ত্র

ভিন্ন অন্য কোনও শাস্ত্রে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নাই বলিলেই হয়। ইন্দ্রিয়ের দমন, পরের হিতসাধন, ঈশ্বরে ভক্তি প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য, এই সকল উপদেশই অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। কি করিলে লোকের ঐ সকল উপদেশ অনুযায়ী কার্য্যে অনুরাগ ও তাহা সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি জন্মে, সে কথা হিন্দু ভিন্ন আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেই নাই; কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই সে সকল অর্থাৎ দৈহিক, পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজকীয়, অনুষ্ঠেয় সকল বিষয়েরই কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মাত্রেরই নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে। হিন্দু যাহা করিবে, শাস্ত্রের বিধি মানিয়া করিবে। যাহা শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা হিন্দুর কর্ত্তব্যই নহে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সেরূপ নহে। আহার-বিহারাদির নিয়ম, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম, অবস্থানপ্রণালী, নিত্য ক্রিয়াকলাপাদির ব্যবস্থা, সমস্তই তাঁহাদের সামাজিক প্রথা, রাজনিয়ম ও আপন আপন সুবিধার উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মশাস্ত্রে এ সকলের কোন বিধানই নাই। সুতরাং যখন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন বিধি বা নিষেধই ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই, তখন কোন অনুষ্ঠানপ্রণালীই তাঁহাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না। পরস্পরের অনুষ্ঠানপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হইলেও তাহা হিন্দু ভিন্ন কাহারই ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহাদের স্বসমাজের সামাজিক প্রথা, রাজনিয়ম, এটিকেট্ যেমন তাঁহাদের শাস্ত্রসম্মতও নহে, বিরুদ্ধও নহে; অন্যান্য সমাজের সামাজিক প্রথা, রাজনিয়ম, এটিকেট্ প্রভৃতিও সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমত বা বিরুদ্ধ নহে। সুতরাং হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ সকল নিয়মাদিও কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ নহে। যাহার বিধি বা নিষেধ শাস্ত্রে নাই, তাহার করণ বা অকরণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইবে কি প্রকারে?

হিন্দুশাস্ত্রের মতে গার্ভাদি সংস্কার একান্ত কর্ত্তব্য, অন্য শাস্ত্রের মতে সে সকল কর্ত্তব্য নহে বটে; কিন্তু সে সকল যে, সে সকল শাস্ত্র-মতে

অকর্ত্তব্য, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেননা তাঁহাদের শাস্ত্রে ওরূপ কার্য্যের যেমন বিধি নাই, সেইরূপ নিষেধও নাই; যাহা নিষিদ্ধ নহে, তাহা করিলে অকর্ত্তব্য করা হয় না, এবং তাহা করিলে শাস্ত্র-বিরোধী কার্য্য করা হয় না। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে দান করেন, গঙ্গাস্নান করেন, পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণ করেন, দশবিধসংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিরোধাচরণ করেন না। কারণ ব্রাহ্মণকে দান করিলে, গঙ্গাস্নান করিলে, পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে যে পাপ হয়, এমন কথা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। ঐরূপ যাঁহারা মদ্য পান করেন না, গোবধ করেন না, তিথি- বিশেষে দ্রব্যবিশেষ ভোজন করেন না, বিধবাবিবাহ করেন না, অসবর্ণ বিবাহ করেন না, বা অসবর্ণ অন্ন ভোজন করেন না, তাঁহারাও কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধাচরণ করেন না। কেননা কোনও শাস্ত্রেরই এমন মত নহে যে, সুরাপান না করিলে, গোবধ না করিলে, বিধববিবাহ না করিলে, অসবর্ণ অন্ন ভোজন করিলে পাপ হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণ এবং মুসলমানশাস্ত্রে শূকরমাংস ভক্ষণ অতিশয় নিষিদ্ধ। কিন্তু কোন শাস্ত্রেই ত এমন কথা নাই যে, গোমাংস বা শূকরমাংস ভক্ষণ না করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইবে। সেদিন ঢাকা সহরে একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত সভামধ্যে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, গোবধ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা মুসলমানশাস্ত্রে নাই। সুতরাং সকলেই যদি গোমাংস ও শূকরমাংস ত্যাগ করে, তাহা হইলে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিরোধাচরণ করা হয় না। ঐরূপ খৃষ্টান মুসলমানাদি যদি হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ ভোজনাদি ত্যাগ করেন, গঙ্গাস্নান করেন, ব্রাহ্মণভোজন করান বা ব্রত পূজা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করেন, তাহা হইলে কোন মতেই তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে না। তাহা যদি না হইল, তবে কি প্রকারে বলিব হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান-

পদ্ধতি অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী? বড় জোর অন্যান্য শাস্ত্রাবলম্বীরা ইহাই বলিতে পারেন যে, ঐ সকল অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই। সংস্কার ও ভ্রান্ত যুক্তির অবলম্বনেই বলিতে পারেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে নহে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অনুষ্ঠানপদ্ধতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

কার্য্যই মানবের কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্যপালন কেবল জ্ঞানলাভ হইলে হয় না, প্রবৃত্তি ও শক্তি থাকা চাই। কেবল ঈশ্বরে জ্ঞান থাকিলেই ভক্ত হইতে পারা যায় না; উপাসনারূপ অভ্যাসের প্রয়োজন। সেইরূপ নীতিজ্ঞান হইলেই মানব নীতিপরায়ণ হইতে পারে না। সুনিয়মে অভ্যাস করিলে তবে ঈশ্বরে ভক্তি ও কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে শক্তি ও প্রবৃত্তি জন্মে। প্রবল পাশব প্রবৃত্তির দমন ও দুর্ব্বল মানবীয় বৃত্তির পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে, যাহা আশু রুচিকর, তাহাতে অরুচি জন্মাইতে হইলে, এবং যাহাতে রুচি নাই, তাহাতে রুচি জন্মাইতে হইলে অভ্যাসের আবশ্যক। স্বভাবকে অতিক্রম করা সহজ নহে, অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলেও অভ্যাসের আবশ্যক। স্বভাবতঃ যাঁহার ক্রোধ অধিক, তিনি ইচ্ছা করিলেই ক্ষমাপরায়ণ হইতে পারেন না,—বাল্যকাল হইতে নিয়ম মত চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিলে তবে স্বভাবতঃ প্রবল ইন্দ্রিয়ের দমন করিতে পারা যায়, অভ্যাসবলেই প্রবল স্বার্থপরতার অল্পতা করিয়া পরার্থে মন দিতে পারা যায়, এবং অভ্যাসবলেই বৃথা আমোদ-ভক্তির অল্পতা করিয়া ঈশ্বরভক্তি বৃদ্ধি করা যায়। যেমন বাল্যকাল হইতে একটু একটু করিয়া লিখিতে, পড়িতে, চিত্র করিতে, শিল্পকার্য্য করিতে অভ্যাস করিলে, কালে পণ্ডিত, উত্তম লেখক ও সুনিপুণ শিল্পকর হওয়া যায়, যেমন একটু একটু করিয়া ব্যায়াম অভ্যাস করিলে কালে

শরীর সুস্থ সবল ও দৃঢ় হয়, সেইরূপ বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিলে তবে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বশীভূত হয়, ঈশ্বরভক্তি প্রবলা হয়, বিশ্বপ্রেমে হৃদয় আপ্লুত হয়। কেবল ঈশ্বর আছেন, তাঁহার এই সকল আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিলেই মানবের স্বভাব ও শক্তি পরিবর্ত্তিত হয় না।

যে দ্রব্য স্বাভাবিক রুচিকর, তাহাই খাইতে লোক ভালবাসে, অরুচিকর দ্রব্য কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক খাইতে চাহে না। বালকেরা বাটী বাটী গুড় খায়, কিন্তু একটুমাত্র তিক্ত খাইতে চাহে না। পীড়া সারিবে, অনেক উপকার হইবে ইত্যাদি নানা প্রলোভন-বাক্য বলিয়াও বালকদিগকে ঈষৎ তিক্ত সুমধুর সুক্তাও খাওয়ান সহজ নহে। কারণ উপদেশবাক্য তিক্তকে মিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু অভ্যাস বশতঃ যাহা রুচিকর, তাহা অরুচিকর হয় এবং যাহা অরুচিকর, তাহা রুচিকর হয়। যদি অল্পে অল্পে নিত্য খাদ্যের সহিত এমন ভাবে একটু একটু তিক্ত খাওয়ান যায় যে, তাহা নিতান্ত অরুচিকর বোধ না হয়, তাহা হইলে অভ্যাসের গুণে পরে তিক্ত আর বিস্বাদ বোধ হয় না; প্রত্যুত ঐরূপে তিক্ত খাওয়া বৃদ্ধি করিলে তিক্ত মিষ্ট অপেক্ষা সুমধুর বোধ হয়। অভ্যাস বলে পলতার বড়া ও ডান্‌লা, নিমবেগুণ ভাজা, নিম সজিনার চচ্চড়ি প্রভৃতি তিক্ত এমন উপাদেয় বোধ হয় যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক মিষ্ট ফেলিয়া ঐ সকল তিক্ত খায়। যে লঙ্কা ঝাল বলিয়া এবং যে ওল কচু লাগে বলিয়া মুখে দেওয়া যায় না, অভ্যাসবলে সে সকলই অতি সুস্বাদু জ্ঞানে ভোজন করে। যে পলাণ্ডু, হিং, পচা মৎস্য প্রভৃতির গন্ধে বমি আইসে, যে তাম্রকূট, সিদ্ধি, আফিম, গাঁজা, মদ প্রভৃতি মুখে দিলেই লোকে ছট্‌ফট্ করে, অভ্যাসবলে তাহাও অতিশয় প্রিয় হয়। সচরাচর অনিষ্টকর দ্রব্যই অধিক রুচিকর, তাই বালকেরা সেই সকল দ্রব্য খাইতে ভালবাসে। মিষ্ট, অম্ল, ভাজা, পোড়া প্রভৃতি বালকদের যেমন সুস্বাদু বোধ হয়, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি তেমন সুস্বাদু বোধ

হয় না। অতএব আপাত-বিস্বাদ হিতকর দ্রব্য খাইতে অভ্যাস করান আবশ্যক। এমন ভাবে অভ্যাস করাইতে হয় যে, যেন ইচ্ছা করিয়া তাহা খায়। কেননা ভাল না লাগিলে হিতকর জানিয়াও তাহা খাইতে চাহে না এবং মুখ-প্রিয় হইলে অহিতকর জানিয়াও তাহা ছাড়িতে চাহে না। জানে কুইনাইন খাইলে ভাত পাওয়া যাইবে, তথাপি বালকেরা কুইনাইন খাইতে চাহে না।

সকল বিষয়েই ঐরূপ। জানিলাম কর্ত্তব্য করিলে ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, এবং অকর্ত্তব্য করিলে ভবিষ্যতে অনিষ্ট সাধিত হইবে; কিন্তু অকর্ত্তব্যের এমনই আপাত-মধুর আস্বাদ যে, তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না, এবং অকর্ত্তব্যের এমনই আপাত-কটুতা যে, তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে যদি এমন করিয়া কর্ত্তব্যে রতি ও অকর্ত্তব্যে বিরতি অভ্যাস করান যায় যে, তাহা তত কটু বোধ না হয়, তাহা হইলে মানব অভ্যাসবলে ক্রমে কর্ত্তব্যের মধুর আস্বাদ বুঝিতে পারে; তখন লোকে ইচ্ছা করিয়াই কর্ত্তব্যানুরত হয়। কর্ত্তব্যে মন না থাকিলে মানুষকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করা বড়ই কঠিন; উপদেশ দিয়া, ভয় দেখাইয়া বা গুণ দোষ ব্যাখ্যা করিয়া যেমন তিক্তকে মিষ্ট করা যায় না, সেইরূপ কঠোর কর্ত্তব্যকে কেবল উপদেশাদি দ্বারা মধুর করা যায় না। কেবল অভ্যাস দ্বারা করিতে পারা যায়। সুতরাং মানুষকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে হইলে, ধীরে ধীরে তাহাতে অভ্যাস করাইতে হয়।

বাল্যকাল হইতে হিন্দু বালকেরা পিতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, মাতুল পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজন সম্মানার্হ, ইহাঁদের সকলেরই আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য জানিয়া তাঁহাদের আদেশ পালন করিতে অল্পে অল্পে অভ্যাস করে। গুরুজনেরাও বালকগণের প্রতি এমন ব্যবহার করেন যে, তাহাতে বালকদিগের মনে তাঁহাদের

প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিতে থাকে; কাযেই আগ্রহের সহিত বালকেরা তাঁহাদের আজ্ঞাপালনে যত্নশীল হয়। এইরূপে মধুরভাবে অন্যের আদেশ পালন করিতে শিখে ও সেই অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু যুবা বিনীত, বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়। এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে তাহারা শিক্ষাগুরু, প্রতিবেশী ও সমগ্র মানবজাতির প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হয় এবং কর্ত্তব্য পালনে বিলক্ষণ আনন্দ বোধ করে। তখন দম্ভ অপেক্ষা বিনয়ই অধিক মধুর বোধ হয়।

একান্নবর্ত্তী সংসারে বহু লোকের সহিত বাস করায় বাল্যকাল হইতে সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া খাওয়ার অভ্যাস হয়, এবং নানা জনের অন্যায়াচরণও কিছু কিছু সহ্য করা অভ্যাস হয়। সেই অভ্যাসবশতঃ হিন্দুরা একাকী খাওয়া অপেক্ষা দশজনকে দিয়া খাওয়া ভালবাসে এবং সমাজস্থ লোকে অন্যায়াচারী হইলেও তাহা সহ্য করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে শিখে। তখন প্রতিশোধ দেওয়া অপেক্ষা ক্ষমার মাধুর্য্য অধিক বোধ হয়। বাল্যকাল হইতে ইহা খাইতে নাই, এ সময়ে খাইতে নাই, একা খাইতে নাই, এত খাঁইতে নাই, ইত্যাদিরূপ বিচার করিয়া খাওয়ার ও বেশ বিন্যাসের সংযম অভ্যাস হওয়ায় লোভের ও বিলাসিতার স্পৃহা কমিয়া যায়; আহার বিহার বেশবিন্যাস প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংযত হয়।

গৃহে যে সকল পূজা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি হয়, তাহাতে পুরুষ ও রমণীগণের ভক্তিভাব দেখিতে দেখিতে এবং যত্নের সহিত ব্রাহ্মণাদির ভোজন, নির্দ্দোষ আমোদকর গীতবাদ্য শ্রবণ ও বিবিধ প্রসাদী সুভোজ্য ভোজন করিতে করিতে এমন মনের গঠন হয় যে, ঈশ্বরের আরাধনা আর কষ্টকর বোধ হয় না, প্রত্যুত সুখেরই আকর বলিয়া মনে হয়। এইরূপে হিন্দুর অনুষ্ঠানপ্রণালী কর্ত্তব্য কর্ম্মে মানুষকে করে। তখন নিজের খাওয়ায় যে সুখ না হয়, পরকে খাও-

য়াইয়া সে সুখ পাওয়া যায়; বিলাসিতার সুখ অপেক্ষা পরোপকারে অধিক সুখ বোধ হয়; আত্মম্ভরিতা অপেক্ষা বিনয় ভাল লাগে; পর-নিন্দা অপেক্ষা প্রশংসাবাদ মধুর বোধ হয়; রিপুপরতন্ত্রতা অপেক্ষা রিপুদমনে অধিক সুখ বোধ হয়; সর্ব্বপ্রকার অকর্ত্তব্য অপেক্ষা কর্ত্তব্যই মধুর ও রুচিকর হয়। রুচিকর হইলে মানব আপনা আপনিই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সকল এই প্রকারে মানবকে কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগী করে। এই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি-বলেই মানুষ সর্ব্বপ্রকারে স্বার্থত্যাগী হইয়া পরের—জগতের—ঈশ্বরের কার্য্যই করেন। নিজেকে—নিজের কার্য্যকে গণনার মধ্যেই আনেন না।

হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রকরণ অনুসারে চলিয়া কি রাজা, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, সকলেই সংযত হয়েন; সকলেই পরের সেবাতেই প্রায় সমস্ত ধন ও শ্রম ব্যয় করেন; আহার বিহার আমোদ প্রমোদ কোন বিষয়েই স্বেচ্ছাচারী হয়েন না। হিন্দুর নিজের অস্তিত্ব যেন পরেরই জন্য। আহারের প্রধান প্রয়োজন শরীররক্ষা ও মানবত্বের পুষ্টিসাধন জন্য, কেবল সুখভোগের জন্য নহে। কেবল গলাধঃকরণ-কালীন সুখসাধনের জন্য হিন্দুর আহারের প্রয়োজন নহে। কেবল পাশব শরীরের পুষ্টিসাধনই হিন্দুর আহারের উদ্দেশ্য নহে। যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে সঙ্গে সঙ্গে মানবত্বের পুষ্টিসাধন হয়, তাহাই হিন্দুর ভোজ্য। অতি মধুর হইলেও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক দ্রব্য হিন্দুর খাদ্য নহে।

সুসন্তান উৎপাদন ও ধর্ম্মসাধনই হিন্দুর বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, কেবল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধনমাত্র হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। তাই হিন্দুর বিবাহে পূর্ব্বানুরাগ বা গান্ধর্ব্বানুরাগ (Love) নাই; বৈধ অনুরাগই হিন্দুর ঘরে ঘরে। কেবল নিজের পছন্দ হইলেই স্ত্রী গুণান্বিতা হয় না; পিতা, মাতা, স্বজন, প্রতিবেশী, সকলেরই পছন্দ হওয়া চাই। তাই হিন্দু

কেবল নিজের সুখের উপযোগী নিজের পছন্দ মত স্ত্রী গ্রহণ করেন না; পিতা মাতা প্রভৃতি যাহাকে যোগ্য মনে করেন, যাহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক প্রয়োজন সম্পাদিত হয়, যাহার গর্ব্ভে গুণবান্ সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা, কর্ত্তব্যানুরোধে তাহাকেই হিন্দুর ভালবাসিতে হয়। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেইরূপ ভালবাসার ফলে কুৎসিতা স্ত্রীও পরম রূপবতী হয়; হিন্দুর চক্ষে নিজের স্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী। সুতরাং হিন্দুর রূপ খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। স্বামীর সুখসম্পাদনই পত্নীর একমাত্র কার্য্য নহে; হিন্দুরমণীকে শ্বশুর, ননন্দা, দেবর প্রভৃতি পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সেবা করিতে হয়, অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির আহার প্রস্তুত করিতে হয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদির আয়োজন করিতে হয় এবং গার্হস্থ্য কার্য্যের সমুদয়ই মনোযোগের সহিত সম্পাদন করিতে হয়। কাযেই হিন্দুরমণী বিলাসপ্রিয় নয়, আমোদপ্রিয় নয়; কর্ত্তব্যপালনেই হিন্দুস্ত্রীর আমোদ। ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষও স্ত্রীকে লক্ষ্মীস্বরূপা ও নিজের অর্দ্ধাঙ্গ মনে করেন। হিন্দুর স্ত্রী কেবল বিলাসের সামগ্রী নহেন, কেবল মদনজ প্রেমলালসার ক্ষেত্র নহেন,—সহধর্ম্মিণী।

বেশ ভূষা ক্রীড়া কৌতুক গীত বাদ্য প্রভৃতি অন্যান্য আমোদ প্রমোদ হিন্দুর নিতান্ত অল্প। বৃথা আমোদের সময়ই হিন্দুর হয় না। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শয়নকাল পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে করণীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে যে, সেই সকল কর্ত্তব্য করিতেই হিন্দুর সময় অতিবাহিত হয়। সেই নিয়মানুসারে শৌচ, আচমন, স্নান, জপ, তপ, পূজা, বলি, তর্পণ, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, পিত্রাদির শুশ্রূষা, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া অবশিষ্ট সময় জীবিকা অর্জ্জনে মনোযোগী হয়েন। ঐ সকল কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহাদের যেমন সুখ বোধ হয়, বৃথা ক্রীড়া কৌতুক সেরূপ ভাল লাগে না।

উপার্জ্জন বিষয়ে হিন্দু যথেচ্ছাচারী নহেন। পিতা যেরূপে জীবিকা অর্জ্জন করেন, বাল্যকাল হইতে অনন্যমনে তাহাই শিক্ষা ও তাহারই উন্নতি করিয়া যে উপার্জ্জন হয়, তাহাতেই তুষ্ট থাকেন। সকলেই এইরূপ করায় সকল বিষয়েরই উন্নতি হইতে থাকে, অথচ কাহাকেই জীবিকার জন্য নিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় না। কি বৃত্তি অবলম্বন করিব, কাহার নিকট কার্য্য শিক্ষা করিব, কাহার উপাসনা করিব, ইত্যাদি চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে হয না। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিতে হয় না; সুতরাং জুয়াচুরি, প্রতারণার ফন্দী কিছুই করিতে হয় না; স্বাভাবিক কার্য্যের ন্যায় বাল্যাভ্যস্তপৈতৃক কার্য্যে রুচিমান্ ও নিপুণ হইয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে তদবলম্বনে উপার্জ্জন করেন।

ব্যয় বিষয়েও হিন্দু যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন না; অর্থোপার্জ্জন যে কেবল নিজের ভোগসুখের জন্য, এ বিশ্বাস হিন্দুর হইতেই পারে না। বাল্যকাল হইতেই দেখিতেছেন নিজের প্রয়োজনীয় ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে যাহা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন আর কিছুই হিন্দু গৃহস্থ গ্রহণ করেন না। পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি বহুতর পরিজন হিন্দুর একান্ত পোষ্য; উদরান্নসংস্থানে অসমর্থ দূর আত্মীয়গণের পালনও করিতে হয়; অতিথিসেবা ও ভিক্ষাদান হিন্দুর নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে; এতদ্ভিন্ন দশবিধ সংস্কার, নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্ব্বণ, বারব্রত প্রভৃতি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ও সামাজিক বহুবিধ কার্য্য করিতে হয়। প্রায় সকল কার্য্যেই যথাশক্তি ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি ও আত্মীয় ভোজন করাইতে হয় ও দরিদ্রদিগকে দান করিতে হয়। আবার পুষ্করিণী খনন, ছায়াবৃক্ষ রোপণ, রাজমার্গ প্রস্তুত, এবং দেবমন্দির নির্ম্মাণ ও দেবসেবার ব্যবস্থাদি করিলে হিন্দুর মহাপুণ্য হয়। অর্থ থাকিলে এই সকল পুণ্যজনক পরের কার্য্য ও দেবকার্য্য করিয়াই হিন্দু অতুল আনন্দ লাভ করেন। সেই সকলে অভ্যস্ত হইয়া সন্তান

সন্ততিরা তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ না হইলেও পিতৃপুরুষদের কীর্ত্তি রক্ষার অনুরোধেও কর্ত্তব্যরত হয়েন।

এইরূপে হিন্দুগৃহ বৃহৎ অতিথিশালা-বিশেষ; গৃহী তাহার অবৈতনিক কর্ম্মচারী মাত্র। তিনি কেবল নিজের উদরান্নমাত্র গ্রহণ করিয়া পরের কার্য্য সম্পাদন জন্যই নিয়ত ব্যস্ত থাকেন। ঋণ পরিশোধ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণ শোধ করিবার জন্যই যেন তাঁহার জন্ম ও অস্তিত্ব; তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। সুতরাং বৃথা আমোদে তাঁহার মন যাইবে কি প্রকারে? বাল্য হইতে অভ্যস্ত হইয়া হিন্দু যাহা করেন, সমস্তই বিশ্বের জন্য—সমস্তই বিশ্বকর্ত্তার জন্য। সে সকল কার্য্যের ফলও তিনি চাহেন না, সমস্তই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রদান করেন। যাঁহার দ্রব্য, সেই পরমেশ্বরকে উৎসর্গ না করিয়া কোন দ্রব্যই হিন্দু ব্যবহার করেন না, করিলে অপহরণ করা হয় মনে করেন। তিনি জানেন কোন দ্রব্যই তাঁহার নিজের নহে, সমস্তই সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের; সুতরাং তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া, তাঁহার সৃষ্ট ভূতগণকে না দিয়া কেবল নিজের ভোগসুখের জন্য লইলে পরদ্রব্য অপহরণ করা হয়।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

গীতা।

যাঁহার এরূপ শিক্ষা, তিনি কি পরের দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন? যিনি নিজের অর্জ্জিত দ্রব্যই আপনার মনে করিতে পারেন না, তিনি যে পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে আর কথা কি?

আমার মতে এইটী করিলে সুখ হইবে, বা আমার মতে এইটী কর্ত্তব্য, অতএব ইহাই আমি করিব, এরূপ আত্মম্ভরিতার ভাব অনুষ্ঠানপরায়ণ হিন্দুর হইতেই পারে না। পিতা মাতা গুরুজন সাক্ষাৎ দেবতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত সত্য, ইত্যাদি বাল্যকাল হইতে হৃদয়ে পরিপুষ্ট হইতে থাকায় এবং পিত্রাদির ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রদর্শিত উদাহরণে সেই সকল শিক্ষিত বিষয় হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হওয়ায় নিয়মানুবর্ত্তিতা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, স্বেচ্ছাচারে হিন্দুর প্রবৃত্তিই জন্মে না। ঈশ্বরপ্রেম, গুরুপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, পিতৃপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেম, পুত্রপ্রেম, স্বজনপ্রেম, মনুষ্যপ্রেম, প্রাণিপ্রেম, প্রকৃত হিন্দুর হৃদয়ে নিয়ত বর্ত্তমান। যে হিন্দুর হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ, নিজের অভিলষিত বিষয়ে প্রেম তাহার কোথা হইতে হইবে? সে স্বার্থপর প্রেমের স্থান কোথায়? হিন্দু প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকেও সমস্ত স্নেহ দিতে পারেন না, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে তাহার অংশ দিতে হইবে; প্রেমময়ী পত্নীকে সমস্ত ভালবাসা দিতে পারিবেন না, পরিবারস্থ সকলকে অংশ করিয়া দিতে হইবে। নিজের ইচ্ছানুরূপ প্রেম বিতীর্ণ হইবে না; শাস্ত্র, সমাজ ও গুরুজনের নিদেশানুসারে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে। বাল্যকাল হইতে পিত্রাদির নিদেশানুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া, শিক্ষাকালে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে অবস্থিত হইয়া ও গার্হস্থ্য জীবনে শাস্ত্র ও সমাজের নিদেশানুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়া আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে পরের করিয়া লয়েন। তাই হিন্দুর প্রেম কেবল অভিলষিত পদার্থে নহে, বিশ্বের সর্ব্বত্রই হিন্দুর প্রেম পরিব্যাপ্ত। নিজের ভোগ্যমাত্রে নির্ভর করিতে হিন্দু একান্ত কাতর হয়েন, পরের তৃপ্তিই হিন্দুর প্রধান প্রার্থনীয়। এখনও দেখা যায় নিমন্ত্রিতগণের আগমনে হিন্দুরা আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, ও

মহাসমারোহ করিয়া ভোজনের আয়োজন করিয়াও পাছে নিমন্ত্রিত-গণের কোনরূপ সন্তোষ বিধানের ত্রুটী হয়, এই ভয়ে কুণ্ঠিত থাকেন।

হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিই এই সকল কর্ত্তব্যপরায়ণতার কারণ। অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে অভ্যাস করলে কর্ত্তব্যে যে রুচি হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। কিছুদিন অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারিবেন, আত্মোদর পূরণ করা অপেক্ষা পরকে খাওয়া-ইলে অধিক সুখ হয়; কিছুদিন অভ্যাস করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া যথেচ্ছ সুখ সম্ভোগ করা অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণকে নিজের অধীনে আনিতে পারিলে অনেক সুখ হয়; কিছুদিন অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারিবেন, অর্জ্জিত অর্থ বিলাস আমোদাদিতে ব্যয় করিয়া যে সুখ হয়, পরোপকারে—পরের তুষ্টি বিধানে ব্যয় করিলে তদপেক্ষা অধিক সুখ হয়, কিছুদিন অভ্যাস করিলে বুঝিতে পারিবেন সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা পার্ব্বণে যে বিমল আনন্দ জন্মে, কোন ভোগবাসনা চরিতার্থ হইলে সেরূপ আনন্দ জন্মে না।

"ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

ভোগ করিয়া কেহ তৃপ্তিলাভ করে না, প্রত্যুত নিয়তই উত্তরোত্তর বাসনার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইচ্ছামত ভোগ্য দ্রব্য এ জগতে কে পায়? কাযেই ভোগে কাহারই তৃপ্তিসুখ লাভ হয় না, আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায় দুঃখেরই মাত্রা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অভ্যাস দ্বারা দুঃখকে যদি সুখে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ ইচ্ছামত উপভোগ হইলে সাধারণতঃ যে দুঃখ বোধ হয়, অভ্যাস দ্বারা যদি উপভোগবিরতি অধিক সুখকর মনে হয়,—যদি ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছ পরিচালন অপেক্ষা দমনে অধিক আনন্দ জন্মে, তাহা হইলে সকলেই সুখী হইতে পারে, অন্ততঃ অভাব-

জনিত দুঃখের তীব্র জ্বালায় কাহাকেও অস্থির হইতে হয় না। অভ্যাস-বলে দুঃখের দুঃখত্বই থাকে না।

মানুষ যদি নিজে দুঃখ পায়, তবে পরের দুঃখে দুঃখিত হইবে কি প্রকারে? যদি নিজের নানা অভাব-জনিত দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাতেই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইল, তবে কি প্রকারে পরের দুঃখ মোচনের ইচ্ছা ও চেষ্টা করিবে? অন্ধ কি অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে? আবার সকলের শক্তি কিছু সমান নহে; সুতরাং ইচ্ছা যদি সমান হয় অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী উপভোগ দ্বারাই দুঃখ নিবারণ ও সুখ ভোগের চেষ্টা যদি সকলেরই হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে কেন? শক্তি ও অনুকূল অবস্থা না হইলে ত চেষ্টার সফলতা হয় না। মনের ধারণা চেষ্টা করিলেই ভোগসুখ লাভ হইবে; সুতরাং সকলকেই প্রাণপণে ভোগসুখ লাভের জন্য ব্যস্ত হইতে হয়। পরের হিত করা দূরে থাকুক, পরের সর্ব্বনাশ করিয়াও আপনার কার্য্য করিতে হয়। কাযেই জাল, জুয়াচুরি, নরহত্যা প্রভৃতিই বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজশাসনরূপ দৃঢ় অস্ত্র নিয়ত মানুষের মস্তকোপরি ঝুলিতে থাকে। রাজশাসনের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য কত শান্ত সুশীলও কত কষ্ট পায় ও কত অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। অনুষ্ঠানপদ্ধতির কল্যাণে হিন্দুর জন্য রাজনিয়মের প্রয়োজন অতি অল্পই হইত, স্বেচ্ছা করিয়া সকলে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত—নিজে নিজেই দণ্ড গ্রহণ করিত। এইরূপে হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠানপদ্ধতি হিন্দুকে সর্ব্ববিষয়ে সুখী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করে।

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের নীতিবাক্য সকল অতি উচ্চ হইলেও, অনুষ্ঠান-প্রকরণ না থাকায় তদবলম্বিগণকে তদনুরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে অতি অল্পই দেখা যায়। যে বাইবেলের মতে এক গালে চড় মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দিতে হয়, যে খৃষ্ট প্রাণবধকারীর কোন-

রূপ অনিষ্ট না করিয়া তাহার মঙ্গল কামনাই করিয়াছিলেন, সেই বাইবেলের ও সেই খৃষ্টের উপাসকগণ অনুষ্ঠানধর্ম্মের অভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতেছেন। ক্ষমা করা দূরে থাকুক, কেহ সামান্য অনিষ্ট করিলেও তাঁহারা এমন প্রতিশোধ দেন যে, সেই অনিষ্টকারীর স্বজাতি ও জন্মভূমির উচ্ছেদ সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। প্রতি-শোধের অছিলায় পাশ্চাত্যগণ যে কত দেশের কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐরূপ অনুষ্ঠানপদ্ধতির অভাবে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন আজ্ঞাই প্রতিপালন করিতে পারেন না।

কেবল গির্জ্জায় যাইয়া কিয়ৎক্ষণ উপাসনা করিলেই হৃদয়ে ঈশ্বর-ভক্তি স্থায়ী হইবে কি প্রকারে? কার্য্যপ্রণালী ও অভ্যাস যে সম্পূর্ণ বাইবেলের বিপরীত। যে সকল নীতি-উপদেশ তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, কার্য্যকালে যে সে সমস্তই বিপরীত ভাব ধারণ করে। বাল্য-কাল হইতে কেবল নিজের সুখের প্রতিই যে তাঁহাদের নিয়ত দৃষ্টি। বাল্যকালে কিছুদিন পিতা মাতা ও গুরুজনদিগের নিকট কয়েকটী সংক্ষিপ্ত উপদেশ পান মাত্র। কার্য্য দ্বারা সে সকলের অভ্যাস তাঁহাদের আদৌ হয় না, প্রত্যুত পিতা মাতার ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উদা-হরণে বিপরীত শিক্ষাই প্রাপ্ত হয়েন। গার্হস্থ্য প্রণালীতে দয়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষার উপযোগী কোনও কার্য্যই পাশ্চাত্য বালকেরা দেখিতে পায় না। যাহাতে শারীরিক বলবৃদ্ধি ও অর্থকরী বিদ্যার অর্জ্জন হয়, তাহাই মাত্র শিক্ষা করিয়া বাল্যকাল অতিবাহিত করে, তাহার পরেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়। অর্থই তখন প্রধান চিন্তনীয় বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে মনোমত সুন্দরী পত্নীর অন্বেষণে ব্যস্ত থাকেন। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ও সুন্দরী রমণীর অন্বেষণ ভিন্ন আর কোন চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয়ে থাকে না। যাঁহাদের চিত্ত নিয়ত কামিনী কাঞ্চনে আকৃষ্ট, নীতি-উপদেশ মাত্র কি প্রকারে

তাঁহাদিগকে নিয়মিত করিবে? প্রথমে কি করিলে প্রভূত ধন উপার্জ্জন হইবে ও কি প্রকারে মনোমত রমণী লাভ হইবে, তাহারই চেষ্টা করেন, এবং পরে কাঙ্ক্ষিত অর্থ ও রমণী লাভ হইলে কেবল ভোগলালসা চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকেন। পতি ভিন্ন অন্য কাহারই সহিত পত্নীর কোন সম্বন্ধ নাই। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা বা অন্য কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয় না; সুতরাং নিয়ত পতির সহিত প্রেমালাপ ও বিলাসকামনার পরিতৃপ্তিই করিতে থাকেন। পতি উপার্জ্জনকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই পত্নীর সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত থাকেন। যাহা উপার্জ্জন করেন, সমস্তই ইচ্ছানুরূপ ভোগবিলাসে ব্যয় করেন। আত্মীয়পালন দূরে থাকুক, পিতামাতারও পালন করিতে হয় না; বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান পালন করিতেও বাধ্য নহেন। হিন্দুর ন্যায় কোন দৈব, পৈত্র্য বা নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে কোনরূপ ব্যয় করিতে হয় না। এরূপ অবস্থায় অর্থ থাকিলে বিলাসিতাবৃদ্ধি ভিন্ন আর কি হইবে? যাহা উপার্জ্জন করেন, সমস্তই অশন বসন ও আমোদপ্রমোদেই ব্যয় করেন। ধনীর গৃহ অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত, শরীরে নিত্য নব নব বেশ, মদ্য মাংস ও বিবিধ আমোদকর দ্রব্যে উদর পূর্ণ হয়। আমোদের জন্য কত রঙ্গালয়, কত চত্বর, কত উদ্যান, কত আপণ নানা সাজে সজ্জিত, প্রেমিক প্রেমিকায় সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ। এইরূপ আমোদেই যাঁহারা নিয়ত মত্ত, যাঁহাদের অর্থই পরম পদার্থ, অর্থের বিনিময়ে প্রাণ দিতেও যাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন, যাঁহারা অর্থহীন জীবন থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল বোধ করেন, যাঁহারা বাল্যকাল হইতে কেবল স্বার্থসাধনই করেন, পরের হিতে তাঁহাদের মন যাইবে কি প্রকারে? কি প্রকারে তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের আদিষ্ট কার্য্য করিবেন? কি প্রকারে অভ্যাসের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের উপাসনা ও নীতির অনুসরণ করিবেন? এখনও যে তাঁহাদের মধ্যে মহানুভব পরার্থপরায়ণ ব্যক্তি দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহার কারণ কেবল স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তি ও উচ্চ শিক্ষা, এবং এখনও তাঁহাদের রক্তে ধর্ম্মশাস্ত্র-শিক্ষা-জাত কিছু কিছু সংস্কার আছে বলিয়া। যে সকল ব্যক্তি প্রকৃতি বশতঃ সচ্চরিত্র, যাঁহারা সুশিক্ষা পাইয়া জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহাদের অন্তরে বংশপরম্পরা-জাত বা বাল্যাভ্যস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র-সংস্কার অজ্ঞাতভাবে অঙ্কিত আছে, তাঁহারা স্বভাব-পরিচালিতের ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ নীতিমার্গের অনুসরণ করেন। এরূপ সুযোগ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই ঘটে; তাই পাশ্চাত্যগণের অধিকাংশই কেবল স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত থাকেন।

পাশ্চাত্যসভ্যতার অনুকরণে অনুষ্ঠানপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমাদেরও গার্হস্থ্য শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। সেই জন্য এক্ষণে হিন্দু-সমাজের অবস্থা অতিশোচনীয় হইয়াছে। এক্ষণে অতিশৈশবে পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য থাকিলেও বয়স হইলেই আর কেহ তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করেন না। পিতা মাতা আর এক্ষণে দেবতা নহেন। পুত্র অপেক্ষা যে তাঁহাদের বোধশক্তি অধিক, এ কথা আর কেহ বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা পিতা মাতাকে মান্য করেন না, তাঁহারা অন্যকে মান্য করিবেন কেন? তাই এক্ষণে সকলেই স্বস্ব প্রধান। এক্ষণে শিক্ষিত সমাজে একান্ন-বর্ত্তী পরিবার অধিক নাই। অনেকে চাকরী অবলম্বনে ভিন্ন স্থানে বাস করেন। সেরূপ সুবিধা না ঘটায় যাঁহারা কিছুদিন একান্নে থাকিতে বাধ্য হয়েন, তাঁহাদেরও পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি নাই। অনেক স্থানেই যিনি যেমন উপার্জ্জন করেন, তিনি তদনুরূপ অবস্থায় থাকেন; সুতরাং সকলে মিলিয়া থাইতে হয়, পরস্পরের দোষ মার্জ্জনা করিতে হয়, এ সকল শিক্ষা এক্ষণে আদৌ হয় না, প্রত্যুত পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষী হইবার শিক্ষাই পান। যাঁহাদের ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নাই, যাঁহারা আপনার উপার্জ্জিত অর্থ পিতাকে ও ভ্রাতাকে দিতে পারেন

না, তাঁহারা পরের হিত চিন্তা করিবেন কি প্রকারে? পূজা, পার্ব্বণ, ব্রত, সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান অতি অল্প লোকেই করেন, নিত্য সন্ধ্যাহ্নিকই অনেকে করেন না; সুতরাং কি দেখিয়া বালকের হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তির বীজ রোপিত হইবে? অতিথিসেবা ত নাইই, ভিক্ষুক আসিলে প্রায়ই তিরস্কৃত হইয়া তাড়িত হয়, সুতরাং কি দেখিয়া বালকগণ পরোপকার দয়া ক্ষমাদি করিতে শিখিবে? স্বার্থের অল্পতা করিয়া ও ইন্দ্রিয়ের দমন করিয়া এখনকার লোকে কি কার্য্য করেন যে, তাহা দেখিয়া বালকেরা নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যানুরাগী হইবে? চাকুরীই এক্ষণে প্রধান জীবিকা, স্ত্রীপুত্রই একমাত্র পালনীয়, ও বিলাসিতার সুখলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। রুটিন বাঁধিয়া এইরূপ একইপ্রকার কার্য্য সকলেই করেন। সকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি আহারের উদ্যোগ, পরে আহার করিয়া আফিসে গমন, আফিস হইতে আসিয়া পুনরায় আহার, পরে কেহ স্ত্রী বা বন্ধুবর্গের সহিত গল্পাদি করেন বা নবেল পড়েন; কেহ মদ খাইয়া, কেহ বেশ্যালয়ে যাইয়া, কেহ বা থিয়েটার দেখিয়া রাত্রি যাপন করেন। পুত্রদিগকে স্কুলে দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন। যাঁহার সংস্থান আছে, তিনি বাড়ীতে একজন মাষ্টার রাখেন; যাঁহার সে সংস্থান নাই, তিনি যদি শিক্ষিত ও সৎস্বভাবাপন্ন হয়েন, তাহা হইলে নিজে স্কুলের পড়াটী বলিয়া দেন মাত্র। ধর্ম্মশিক্ষা নিজেও করেন না, পুত্রকেও দেন না। প্রত্যুত ধর্ম্মশাস্ত্র যে কেবল শঠের শাঠ্য ও মূর্খের অবলম্বনীয়, এই শিক্ষাই সকল বালকেই পায়। পরিবারের অলঙ্কার, আপনার বেশ ভূষা, পুত্রের চাকরীর উপযোগী শিক্ষা এবং পুত্রের বিবাহে কন্যাপক্ষের অর্থ-শোষণ-চেষ্টা ব্যতীত এখনকার বালকেরা পিত্রাদিকে অন্য কোনও কার্য্য করিতে দেখিতে পায় না। সুতরাং বালকগণ এই সকল ভিন্ন আর কি শিখিবে? কি প্রকারে তাহাদের কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে? আধুনিক

বৃদ্ধগণের তবু সংস্কারগত একটু বিশ্বাস আছে এবং পিত্রাদির উদাহরণও কিছু কিছু দেখিয়াছেন; পুত্রগণের সংস্কার ও উদাহরণ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। স্বধর্ম্ম শিক্ষা ত হয়ই না; পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। নীতিমান্ হওয়া উচিত, জাতীয়তা রক্ষা করা উচিত, স্বদেশের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত, ইত্যাদি যে সকল কথা এক্ষণকার শিক্ষিতগণ পাশ্চাত্য বিদ্যা-প্রভাবে শিক্ষা করেন, কার্য্যে তাহারও কিছু করিতে পারেন না। ইচ্ছা হইলেও অভ্যাসের অভাবে কার্য্যে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। অতএব অভ্যাসের জন্য অনুষ্ঠানপরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি না জানিলে প্রকৃত অনুষ্ঠানপরায়ণ হওয়া যায় না, যথেচ্ছ অভ্যাস হইলে অনিষ্টই ঘটে। ঈশ্বরের উপাসনা ভক্তিসহকারে ইচ্ছামত করিলে হইতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কেবল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া করিলে হয় না। আপন আপন রুচিমত কার্য্য করিলে কর্ত্তব্য কার্য্য করা হয় না। যাহা প্রকৃত হিতকর, তাহাই করিতে হয়; হিত ভাবিয়া অহিতকর কার্য্য করিলে তাহার হিতকর ফল হয় না। অমৃত মনে করিয়া বিষ পান করিলে বিষের বিষত্ব যায় না। তাই মনু প্রভৃতি-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অনুষ্ঠানপদ্ধতিতেই পরিপূর্ণ বলিলেই হয়; ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই সে সকল শাস্ত্রে আছে। তথাপি ঐ সকল শাস্ত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত। ঈশ্বরতত্ত্ব সকলে বুঝে না, না বুঝিলেও তত ক্ষতি নাই, যে যেমন বুঝে তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু যথাসম্ভব কর্ত্তব্যপরায়ণ সকলেরই হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণব হউন, শাক্ত হউন, শৈব হউন, সৌর হউন, গাণপত্য হউন, খৃষ্টান হউন, মুসলমান হউন, তিনি যদি ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠানপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলেই তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সকল শাস্ত্রের মতানু-

যায়ী ধার্ম্মিক হইবেন। ফলতঃ যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে হয়, তাহা হইলে অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং অনুষ্ঠানপদ্ধতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ। অনুষ্ঠান-পরায়ণ না হইলে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা পালন করা যায় না।

যখন দেখা গেল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন আর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নাই, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেরই বিরোধী নহে, তখন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠানপ্রণালী অনুসারে চলিবার বাধা কি? সকলেই যেমন সকল দেশীয় বিজ্ঞান দর্শনাদি শাস্ত্র অবলম্বনে স্ব স্ব জাতীয় বিজ্ঞান দর্শনাদি শাস্ত্রের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন, সর্ব্বদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেরও সেইরূপে পুষ্টিসাধন করায় দোষ কি? যদি সকল শাস্ত্রই অলৌকিক বা ঈশ্বরপ্রণীত হয়, তাহা হইলে তাহা না করিলেই দোষ, কোনও এক ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধাচরণ করিলেই ঈশ্বরাজ্ঞার অপালন করা হয়। যদি মনুষ্যকৃত হয়, তাহা হইলেও যখন বিজ্ঞান ইতিহাসাদির সমন্বয় হইতেছে, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের সমন্বয় হইতে দোষ কি? প্রত্যুত তাহা হইলে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব জন্য অনিষ্ট আর হইবে না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রই একমাত্র পূর্ণ—ধর্ম্মশাস্ত্র। কেবল এই ধর্ম্মশাস্ত্রেই সাধারণ ও বিশেষবিধি সম্বলিত ঈশ্বরপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ ও অনুষ্ঠান-প্রকরণ আছে, আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহা নাই। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় সনাতন প্রাচীন ধর্ম্মও পৃথিবীতে আর নাই, সমস্ত নব্যধর্ম্ম শিশুধর্ম্ম, এই সনাতনধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বা ইহার অংশবিশেষ। সুতরাং সকলেই যদি স্ব স্ব শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ইষ্টদেবের পরায়ণ হইয়া অন্যান্য বিষয়ে সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী কার্য্য করা হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবে তাঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রপরায়ণই হয়েন বলিতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মশাস্ত্র স্বার্থপরের প্রণীত নহে।

কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের স্বার্থসাধনোপযোগী ব্যবস্থায় পূর্ণ। কিন্তু বাস্তবিক সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ যে ঘোর স্বার্থত্যাগী ছিলেন, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে ঋষিগণকে লইয়া অনেকে টানাটানি করেন বটে; অধঃপতিত হিন্দুর সময়দোষেই হউক, বা বিকৃত শিক্ষার প্রভাবেই হউক, অনেকে মনে করেন হিন্দুশাস্ত্র স্বার্থপর ব্রাহ্মণের রচিত। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, একটু মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকার ঋষিগণের তুল্য সর্ব্বস্বার্থত্যাগী পরার্থপর পৃথিবীর কোনও দেশে কখনই ছিল না। যাঁহারা বলেন ঋষিগণ স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণের সুবিধার জন্য অন্যান্য বর্ণের প্রতি অত্যাচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথার কোন অর্থই নাই। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের এমন কি সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলা যায়? ব্রাহ্মণগণ কি বাঁছিয়া বাছিয়া সুখকর ও প্রলোভনজনক বৃত্তিগুলি আপনারা লইয়াছেন? না, কেবল ভোগসুখেই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন? কোন্ বিষয়ে অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের ঐহিক সুখের উপকরণ অধিক আছে? যে বল ও অর্থ প্রাধান্যের ও সুখের প্রধান উপকরণ, সে বল ও অর্থ তাঁহাদের নয়। রাজপদ ক্ষত্রিয়ের, ধন বৈশ্যের।

ব্রাহ্মণ ভিক্ষামাত্রোপজীবী—পরের অনুগ্রহমাত্রের উপরই ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ভর করে। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহই ব্রাহ্মণের বৃত্তি; সেরূপে লব্ধধন সঞ্চয় করিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই। শিল্প, বাণিজ্য, রাজত্ব, সকল ত্যাগ করিয়া যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষামাত্র অবলম্বন করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ দিন আনেন, দিন খান, সেই উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বার্থপর? * ভিক্ষাই কি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি? যদি বল কোন পরিশ্রম ও চিন্তা না করিয়া যখন অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তখন ভিক্ষাকে মন্দই বা বলিব কি প্রকারে? কিন্তু মূর্খ ও অলস ব্রাহ্মণের ভিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা কি শাস্ত্রে আছে? না, মূর্খ ব্রাহ্মণেরা যাজন ও অধ্যাপনা করিতে পারে? যাঁহারা যথোচিত বিদ্যার অর্জ্জন, কঠিন তপঃসাধন ও সুখকামনা সকল এককালে পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই এ বৃত্তি অবলম্বনে জীবনোপায় সংগ্রহ করিতে পারেন। গুণসম্পন্ন না হইলে কোনও

---

* অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥ ২। ৪
যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ম্ ॥ ৩। ৪
ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্ ॥ ১১। ৪
সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১২। ৪
অকৃত্বা ভৈক্ষ্যচরণমসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণিব্রতং চরেৎ॥ ১৮৭। ২
আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভির্নিন্দিত এব চ ॥ ১৬৫। ৩
বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেশবাগ্বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ ॥ ১৮। ৪
মনু।

ব্রাহ্মণ গুরুপদে বৃত বা যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত হইতে পারেন না, ভিক্ষাও পান না। সকল শাস্ত্রেই মূর্খ ও দোষযুক্ত ব্রাহ্মণকে দান নিষিদ্ধ *। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ উপার্জ্জনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম না করিলেও তপঃ-

---

* যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥ ১৫৭। ২
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥ ১৫৮। ২
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ১৬৮। ২
ব্রাহ্মণস্ত্বনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং নহি ভস্মনি হূয়তে॥ ১৬৮। ৩
নশ্যন্তি হব্যকব্যানি নরাণামবিজানতাম্।
ভস্মীভূতেষু বিপ্রেষু মোহাদ্দত্তানি দাতৃভিঃ॥ ৯৭। ৩
বিদ্যাতপঃসমৃদ্ধেষু হুতং বিপ্রমুখাগ্নিষু।
নিস্তারয়তি দুর্গাচ্চ মহতশ্চৈব কিল্বিষাৎ॥ ৯৮। ৩
দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
তীর্থং তদ্ধব্যকব্যানাং প্রদানে সোঽতিথিঃ স্মৃতঃ॥ ১৩০। ৩
সহস্রং হি সহস্রাণামনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
একস্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্ব্বানর্হতি ধর্ম্মতঃ॥ ১৩১। ৩
জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবীংষি চ।
নহি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ॥ ১৩২। ৩
যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ হব্যকব্যেষমন্ত্রবিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্তশূলষ্ট্যয়োগুড়ান্॥ ১৩৩। ৩

মনু।

অনৃতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চোরভক্তপ্রদো হি সঃ॥

পরাশর

সাধনের যে কষ্ট গ্রহণ করেন, লক্ষ মুদ্রা দিলেও কেহ সেরূপ কষ্ট করিতে স্বীকার করেন না। তবে ব্রাহ্মণ স্বার্থপর কিসে? ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত যাঁহারা শাস্ত্রেরই পরবশ হইয়া দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য ও ভূত-ঋণ শোধেই ব্যস্ত থাকেন, ভোগসুখের নিকটেও যান না, সে ব্রাহ্মণ যদি স্বার্থপর হয়, তবে এ জগতেপরার্থপর কে?

সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তি অবলম্বনে যে আয় হইতে পারে, তাহাও নিতান্ত অল্প। অধ্যাপনায় আয় নাই বলিলেই হয়, অধ্যাপনায় বেতন লওয়া নিষেধ *। বিনা বেতনে ৯ বৎসর, ১৮ বৎসর বা ৩৬ বৎসর পড়িয়া যাঁহারা গার্হস্থ্য অবলম্বন করিবেন, তাঁহারা কিছু গুরুদক্ষিণা দেন মাত্র †। যাঁহারা চির-ব্রহ্মচারী থাকেন, তাঁহাদের নিকট কিছুই পাওয়া যায় না; অবস্থাবিশেষে কিঞ্চিৎ শাকমাত্র গুরুদক্ষিণা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে হয় ‡। এই ত ব্রাহ্মণের অধ্যাপনার বৃত্তি, ইহাতে তাঁহাদের আয় কত হইতে পারে? যাজনে অর্থাগম অতি অল্প হয়। সকলপ্রকার যাজন সু-ব্রাহ্মণের

---

* ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ড-গোলকৌ॥ ১৫৬। ৩
ন পূর্ব্বং গুরবে কিঞ্চিদুপকুর্ব্বীত ধর্ম্মবিৎ।
স্নাস্যংস্তু গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুর্ব্বর্থমাহরেৎ॥ ২৪৫। ২
মনু

† ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ ১। ৩
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥ ২। ৩
মনু

‡ ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমাসনম্।
ধান্যং শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ॥ ২৪৬। ২
মনু

কর্ত্তব্য নহে। প্রতিগ্রহ সম্বন্ধীয় নিয়ম আরও কঠিন। শূদ্রের প্রতি-গ্রহ এককালে নিষিদ্ধ, কোনরূপ পাপপরায়ণ দ্বিজের দানও গ্রহণীয় নয় *। এইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহে কি আয় হইতে পারে যে, সেই লোভে ব্রাহ্মণগণ বাছিয়া বাছিয়া এই বৃত্তিগুলি আপনারা লইয়াছেন বলিতে পারা যায়? আর যাহা কিছু আয় হয়, সে আয়েই বা তাঁহাদের সুখ কি? কোন বিলাসদ্রব্য ত তাঁহাদের ব্যবহার করিবার যো নাই। শাস্ত্রে তাঁহাদের যে অবস্থানপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে কার্য্যভার তাঁহাদিগকে দিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ টাকা পাইলেও তাঁহাদের স্বার্থসাধন বা আমোদপ্রমোদ করিবার অধিকার নাই। যদি কেহ সেরূপ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহার সে বৃত্তি থাকিবে না। প্রচলিত প্রবাদই আছে "লাক টাকায় বামণ ভিখারী"। ব্রাহ্মণের এ বৃত্তি অপেক্ষা কি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি

---

* ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্ম্যং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহং কুর্য্যাদবসীদন্নপি ক্ষুধা ॥ ১৮৭। ৪

ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়াদরাজন্যপ্রসূতিতঃ।
সূনাচক্রধ্বজবতাং বেশেনৈব চ জীবতাম্ ॥ ৮৪। ৪

যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনঃ।
স পর্য্যায়েণ যাতীমান্ নরকানেকবিংশতিম্ ॥ ৮৭। ৪

প্রতিগ্রহাদ্ যাজনাদ্বা তথৈবাধ্যাপনাদপি।
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ প্রেত্য বিপ্রস্য গর্হিতঃ ॥ ১০৯। ১০

মনু

প্রতিগ্রহেণ ব্রাহ্মণানাং ব্রাহ্মং তেজঃ প্রণশ্যতি।

বিষ্ণু।

ভাল নহে? রাজপদ, ভূম্যধিকারিপদ, সৈনিকের পদ এবং অন্যান্য অনেক উচ্চ পদ ক্ষত্রিয়ের। বৈশ্য ত ধনকুবের বলিলেই হয়। কৃষি, বাণিজ্য, সুদ প্রভৃতি যে সকল উপায়ে অধিক অর্থ লাভ হয়, তৎ-সমস্তই বৈশ্যের। শূদ্রের বৃত্তিও ব্রাহ্মণের বৃত্তি অপেক্ষা লাভজনক ও অনায়াসলভ্য। তাহাদের মজুরি ও শিল্পাদিতেও আয় আছে। এক্ষণে অনেক ভদ্র পরিবারের অবস্থা অপেক্ষা শিল্পী ও মজুরের অবস্থা অনেক ভাল। সেবা শূদ্রের বৃত্তি নয়, সেবা তাহাদের তপস্যা *। তাহা-দের সেরূপ শিক্ষালাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা ব্রাহ্মণাদির সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট জ্ঞানাদি লাভ করে ও সংযমপরায়ণ হইয়া উন্নতির পথে—মোক্ষের পথে অগ্রসর হয়। বিনা ব্যয়ে, বিনা শ্রমে তাহাদের পরকালের মঙ্গল সাধিত হয়।

তবে কি সম্মান দেখিয়া ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলিবে? সকল লোকে, এমন কি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতিও ব্রাহ্মণের সম্মান করেন; অই ব্রাহ্মণকে স্বার্থপর বলিবে? গুণের সম্মান কে না করে? বিদ্যাবিন-য়াদিগুণসম্পন্নের সম্মান ও আনুকূল্য কে না করে? আধুনিক সভ্য সমাজে বিদ্যা ও কবিত্বের এত আদর যে, কবিগণ সমূহ-দোষ-বিশিষ্ট হইলেও যথেষ্ট আদর পান। কত কাল সেক্সপিয়ার গতায়ু হইয়াছেন, এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মান জন্য কত অর্থ ব্যয়িত হই-তেছে। আমরা সাহিত্যসেবীর সম্মান করিতে জানি না বলিয়া আমা-দের অতিশয় কলঙ্ক প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি কবি হেমচন্দ্রের শেষ জীবনে তাঁহার সাহায্য জন্য কতই চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রধান

---

* বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাম্।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ॥ ৩৩৪। ৯
মনু

উকীল ছিলেন, যথেষ্ট আয় ছিল, এমন কি, বড় বড় জমীদারের ন্যায় তাঁহার বার্ষিক আয় হইত, স্থাবরসম্পত্তিও ছিল। পরের কার্য্যে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন নাই, যথেষ্ট সুখসম্ভোগে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তথাপি কেবল সাহিত্যসেবী বলিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য কত চেষ্টা করা হইল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বধর্ম্মত্যাগী, সুরাপায়ী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, নানা বিষয়ে আয়ও তাঁহার যথেষ্ট ছিল; তথাপি তিনি কবি বলিয়া সাধারণের নিকট সাহায্য পাইবার অধিকারী বলিয়া সকলেরই ধারণা; তাঁহার তথাবিধ সাহায্য হয় নাই বলিয়া আমরা সর্ব্বসমাজে কলঙ্কিত। যখন কেবল বিদ্যা বা কবিত্বের এত সম্মান, পাপপরায়ণ কবিরও যখন এত সম্মান, তখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বসুখত্যাগী পরার্থচিন্তকপরায়ণ ব্রাহ্মণের সম্মান ও বৃত্তিব্যবস্থা স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে বলা যায় কি প্রকারে? যদি শাস্ত্রের ব্যবস্থা হইত যে, ব্রাহ্মণমাত্রই সমান সম্মানার্হ ও পোষ্য, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে স্বার্থপর বলা যাইত না; কিন্তু তাহাও তাঁহারা করেন নাই। শাস্ত্রে মূর্খ ব্রাহ্মণের যেরূপ দুর্গতির ব্যবস্থা আছে, শূদ্রের প্রতিও সেরূপ নাই। সুতরাং কিছুতেই বলা যায় না যে, তাঁহারা স্বজাতির সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সত্য বটে, ব্রাহ্মণগণ স্ববৃত্তিপরায়ণ ও জ্ঞানবান্ না হইলেও পূজনীয়, এরূপ কথা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ নহেন, সকল জাতিই জাতিগত সম্মান পাইয়া থাকেন। সকল দেশেই সম্ভ্রান্ত বংশের সম্মান কিছু না কিছু আছে। ইংলণ্ডের লর্ডবংশীয়গণের কত সম্মান! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, সকলেই বংশমর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। তবে বর্ণভেদপ্রথা থাকায় আমাদের দেশে জাতীয় সম্মান কিছু অধিক। বহু জন্মের চেষ্টায় প্রকৃতির উচ্চতা হয়। উচ্চবংশজাত কুলাঙ্গারেরও প্রকৃতির উচ্চতা এককালে নষ্ট হয় না, সেই কুলাঙ্গারের

বংশে আবার উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিতে পারে, নিম্নতর বংশে সেরূপ উচ্চশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম গ্রহণের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই বর্ণসঙ্কর দ্বারা যাহাতে প্রকৃতির উচ্চতা নষ্ট না হয়, তাহারই জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার গুণে অতিমূর্খ দুষ্কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণবংশেও মহাপুরুষের উদ্ভব হয়; একান্ত নির্বীর্য্য ক্ষত্রিয়ের বংশে শৌর্য্যবীর্য্যশালী বীরপুরুষের জন্ম হয়। যখন এই ব্যবস্থা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে—সকল বর্ণেরই পক্ষে, তখন ইহাতে ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা কোথায়? আর এক কথা, যদি গুণ দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক সময়ে স্বেচ্ছাচার প্রবেশ করে। গুণ বুঝিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই থাকে; মতও নানাজনের নানাপ্রকার। সেই জন্য গুণাগুণ নির্ণয়ের ভার সাধারণের উপর না দিয়া শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, কোনও ব্রাহ্মণেরই অসম্মান বা অনিষ্ট করা উচিত নহে। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের গুণ স্মরণ করিয়া সেরূপ করিলে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও কর্ত্তব্যসাধন ভিন্ন কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করা হয় না।

কেহ কেহ বলেন, যে বিদ্যাপ্রভাবে মানুষ মানুষ-নামের যোগ্য হয়, সে বিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া, অপর জাতিকে তাঁহারা সে বিদ্যা শিখিতে দেন না। কিন্তু কৈ, শাস্ত্রে ত কোনও বর্ণেরই বিদ্যাশিক্ষার বাধা নাই; কেবলমাত্র শূদ্রের বেদে অধিকার নাই মাত্র, তদ্ভিন্ন সমস্ত বর্ণেরই বেদপাঠ ও ব্রহ্মচর্য্য, সকল বিষয়েই সমান অধিকার আছে। সমগ্র অধিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ণের সংখ্যা যদি সমান হয়, তাহা হইলেও শূদ্রসংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমাদের বোধ হয়, যে কালে শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে শূদ্রের সংখ্যা খুব কমই ছিল; কেননা কৃষক গোপাল পর্য্যন্ত বৈশ্যের অন্তর্গত। সকল সমাজেই, বিশেষতঃ

ভারতে কৃষকের সংখ্যা অধিক; সেই কৃষক যখন শূদ্র নয়, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মিলিয়া চৌদ্দ আনারও অধিক ছিল বলিতে হয়। কাজেই বলিতে হইবে, বড় জোর দুই আনা লোক বেদপাঠে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু পুরাণাদিপাঠে তাহারা বঞ্চিত ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে এককালে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হয় নাই। যাজন-প্রণালী, মন্ত্র ও ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব ভিন্ন বেদে এমন কি সাধারণ জ্ঞাতব্য আছে যে, নিম্ন শ্রেণীর কয়েক জনকে বেদপাঠে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতাই তাহার কারণ বলিতে হইবে? মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্র পড়িলে কি বেদের জ্ঞান লাভ হয় না? যদিও স্বীকার করা যায় যে, বেদপাঠ না করিলে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত হয় না; তাহাতেই বা দোষ কি? কোন্ সভ্য দেশে অর্দ্ধেক অধিবাসীর উচ্চ শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে? কৃষক গোপালাদি অপেক্ষা যাহারা নিম্নশ্রেণীতে বর্ত্তমান, সে শ্রেণীর লোক কোন্ দেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, এবং করিলেও তাহাদের মধ্যে কয়জন এরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করে যে, সেই শিক্ষার অভাবে দেশের অনিষ্ট হয় বলিতে হইবে? বিজ্ঞান দর্শনাদি পাঠে ত সকলেরই অধিকার আছে; কিন্তু কয় জন বিজ্ঞান দর্শনাদির অনুরাগী? ভাষা শিক্ষার অনুরাগীই বা কয় জন? সুতরাং অধিকার থাকিলেই তাৎকালিক শূদ্রের ন্যায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকে বেদ পাঠ করিত বা বিদ্যার আলোকে সমুজ্জ্বলিত হইত, এরূপ মনে করার কোনও কারণই নাই। এক্ষণে কায়স্থ প্রভৃতি শূদ্র নামে অভিহিত হওয়াতেই মনে হয় যে, যে কায়স্থ জাতি এক্ষণে হাইকোর্টের জজ হইতেছেন, বড় বড় উচ্চ পদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের নানা ব্যাখ্যা করিতেছেন, শিক্ষার নানা গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, হিন্দুর অধিকার থাকিলে তাহা তাঁহাদের স্বপ্নেরও বোধ-

গম্য হইত না; প্রত্যুত ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সেবা করিয়াই জীবন অতিবাহিত হইত। কাযেই দেশের উন্নতি হইবে কি প্রকারে? এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশীভূত হইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন না যে, আধুনিক কায়স্থ প্রভৃতি জাতি প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র নহেন, তাৎকালিক শূদ্রের তুল্যও নহেন। আভিজাত্য, বিদ্যা, বৃত্তি প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহারা শূদ্র নহেন। অধিক কি, বণিক্, গোপ, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, মালাকর, তন্তুবায় প্রভৃতি জাতিও প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র নহেন, প্রকৃত শূদ্র বঙ্গে নাই। বর্ত্তমান সমাজের বাগ্দী দুলে প্রভৃতির ন্যায় হীন জাতিরাই তখন শূদ্রের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাহাদের বেদে অধিকার না থাকিলে সমাজের কি অনিষ্ট হইতে পারে এবং অধিকার থাকিলেই বা তাহাতে ব্রাহ্মণেরই বা কি স্বার্থহানি হইতে পারে? যদি বেদশিক্ষা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের সহস্রের মধ্যে এক জনও বেদপরায়ণ হইতে পারিত কি না সন্দেহ। সুতরাং এরূপ মনে করিবার কোনও কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না যে, পাছে শূদ্রেরা বেদ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণগণের কোন স্বার্থহানি হয়, পাছে তাহারা বেদবিৎ হইলে ব্রাহ্মণের বৃত্তির লোপ হয়, এই ভয়ে তাহাদিগকে বেদপাঠে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যদি সে ভয়ের কোন সম্ভাবনা থাকিত, তবে তাহা ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বারাই সম্ভব ছিল। কেননা বল, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, সকল বিষয়েই ইঁহারা অনেক উচ্চ; এমন কি, অনেক ব্রাহ্মণ হইতেও অনেক ক্ষত্রিয় বৈশ্য বিদ্যা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক; সুতরাং যদি স্বার্থসাধনই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণকেও বেদাধিকারে বঞ্চিত করিতেন। তাহা না করিয়া যখন কেবল নিকৃষ্ট শূদ্রকেই—কৃষক গোপাল অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোককেই

বঞ্চিত করিয়াছেন, তখন স্বার্থপরতা কখনই তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যাহা হউক, যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণের বেদাধিকার রহিয়াছে, অধ্যয়ন সম্বন্ধে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কোন পার্থক্যই নাই, তখন কি প্রকারে বলা যাইবে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন? এবং কেমন করিয়াই বা বলিব যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণের ন্যায় উচ্চতা লাভের অবসর পান নাই? প্রত্যুত শাস্ত্রাদির আলোচনায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক ক্ষত্রিয় অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি জনকের নিকট অনেক প্রাজ্ঞ ঋষিও পরাজিত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সর্ব্বব্রাহ্মণের পূজ্য। ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন ক্ষত্রিয় ভীষ্মের তর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিষয়ে অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদাদির আলোচনা করিয়া অনেক ঋষি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতাপ্রণোদিত হইয়া অপরাপর জাতিকে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না।

যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে যে ফল হয়, অপর জাতিকে দান করিলে সেরূপ ফল হয় না, এই কথা শাস্ত্রে নিবদ্ধ থাকায় ক্ষত্রিয়াদি ঋষিতুল্য হইলেও প্রতিগ্রহের দ্বারা যখন জীবনোপায় করিতে পারেন না, তখন ইহা পক্ষপাত নয় ত কি? কিন্তু বাস্তবিক ইহা পক্ষপাতের কথা নহে; কেননা প্রতিগ্রহ বাহ্মণের জীবনোপায়ের বৃত্তিবিশেষ মাত্র; অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি মাত্র ব্রাহ্মণের জীবনবৃত্তি; এ বৃত্তি অন্যের পক্ষে নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে তাহাদের যে জীবনবৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল।

ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা কখনই অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন না, স্বার্থপরতা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না, সকল মনুষ্যকেই তাঁহারা সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি, উদ্ভিদের প্রতিও তাঁহারা সমান দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহাদের মতে ব্যাঘ্র সর্প বধেও সমূহ পাপ, একটী বৃক্ষপত্র ভঙ্গেও পাপ। সত্য বটে, শূদ্রের প্রতি এমন কতকগুলি ব্যবস্থা আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাহাদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে কিরূপ অত্যাচারী, তাহা ইউরোপীয় সেনানী, নাবিক ও কাবুলী প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয় নিম্নশ্রেণীস্থ লোক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশের বর্ত্তমান মুটে ও গাড়োয়ানদিগকে দেখিলেও কতক বুঝা যায়। কে না বলেন তাহাদের দমন করা বড়ই আবশ্যক? কোন্ ভদ্রলোক তাহাদের অন্যায়াচরণে কষ্ট না পান? তাহাদিগকে নিয়মিত করিবার জন্যই শাস্ত্রের ঐমত ব্যবস্থা। শাস্ত্রের সকল কথা সামঞ্জস্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল ঐরূপ প্রয়োজন জন্যই শূদ্রের কঠিনতর শাসন ব্যবস্থা, পক্ষপাত জন্য নহে। স্থলবিশেষে অর্থাৎ যে সকল পাপ জ্ঞানাজ্ঞানসাপেক্ষ, সে সকল পাপের অনুষ্ঠানে শূদ্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণাদির অধিকদণ্ডই হইয়া থাকে *। আবার, শূদ্র যদি বিনয়াদি বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে শূদ্র উচ্চ

---

* কার্ষাপণং ভবেদ্দণ্ড্যো যত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥ ৩৩৬। ৮
অষ্টাপাদ্যন্তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষং।
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ৩৩৭। ৮
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ ॥ ৩৩৮। ৮

মনু

জাতিত্ব প্রাপ্ত হয় *। তাঁহাদের এই সমদর্শিতা হইতে—তাঁহাদের দৃঢ় তপশ্চর্য্যা হইতেই ভারতের এই উন্নতি। পাশ্চাত্যগণও এ কথা স্বীকার করেন। অতএব স্বার্থপরতা হইতে সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি নহে, তাঁহাদের অতুল দয়া ও দৃঢ় তপশ্চর্য্যা হইতেই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকাশ ও উন্নতি।

যদি ব্রাহ্মণসমাজ স্বার্থপর হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা সাধারণের এত ভক্তিভাজন হইতেন না, কখনই তাঁহাদিগকে সকল লোকে গুরু বলিয়া মানিত না। যিনি যতই পণ্ডিত হউন, তিনি যদি আপনাকে লইয়াই থাকেন, আপনাকে বড় দেখাইয়া অপরকে ঘৃণা করেন, তাহা হইলে তিনি কখনই সাধারণের প্রিয় হইতে পারেন না। পরহিতসাধনই ব্রাহ্মণের একমাত্র কার্য্য; তাই বিনা অস্ত্রে তাঁহারা সমগ্র ভারতভূমির আধিপত্য করিয়াছেন, তাই লোকে বিনা সন্দেহে হিতকারী ভাবিয়া তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাই তাঁহাদের মুখনিঃসৃত শাস্ত্রবাক্যে এ দেশীয় জনগণের এত দৃঢ় বিশ্বাস, তাই মহাপরাক্রমশালী রাজগণও তাঁহাদের পদানত। তাঁহাদেরই আদেশানুসারে কার্য্য করিতেন বলিয়া অস্ত্রশস্ত্রশালী ভীমমূর্ত্তি রাজাও সাধারণের নিকট দেবভাবে পূজিত হইতেন। হিন্দু এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়েই এত উন্নত হইয়াছিলেন। যে সময়ে পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতীয় মনুষ্যবর্গ পশুরই সদৃশ ছিল, ধর্ম্মশাস্ত্রের কল্যাণে সেই সময়ে হিন্দুর উন্নতির সীমা ছিল না। এই অধঃপতিত সময়েও হিন্দুর মধ্যে দুই চারি জন যেরূপ মনুষ্য আছেন, সেরূপ মনুষ্য আর কোনও দেশে আছে বোধ হয় না।

---

* শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্মৃদুবাগনহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়ো নিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে ॥৩৩৫॥৯
মনু।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ কেবল পরকালেরই মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, ঐহিক-সুখও ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐহিক-সুখ লাভ করিতে হইলে অর্থ অপেক্ষাও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ধর্ম্মশাস্ত্রের পরায়ণ হইলেই মানব প্রকৃত সুখ স্বাধীনতা ও অর্থলাভ করিতে পারে; তদ্ভিন্ন যে সুখ স্বাধীনতা ও অর্থলাভ হয়, সে সুখ দুঃখেরই হেতু, সে স্বাধীনতা পূর্ণ পরাধীনতা এবং সে অর্থ অনর্থেরই হেতু। এবিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখা আবশ্যক, সুখ কাহাকে বলে ও সুখের উপকরণ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় অর্থ ও স্বাধীনতাই ঐহিক সুখের হেতু। অন্তঃকরণ যে অর্থ বা বিষয় চায়, তাহা পাওয়ার যদি বাধা না হয়, তাহা হইলেই সুখ হয়। সুতরাং বলিতে হইবে অন্তঃকরণ যাহা চায়, তাহার প্রাপ্তি জন্য মনে যে ভাববিশেষ হয়, সেই ভাববিশেষের চরিতার্থতা সম্পাদিত হইলেই সুখ হয়। যতক্ষণ অন্তঃকরণের সেই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ মানুষ দুঃখ পায়। কিন্তু সকলের অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সমান নহে, সুতরাং সকলের আকাঙ্ক্ষার বিষয়ও সমান নহে। এই জন্য সকলে সকলরকম পদার্থকে সুখকর মনে করেন না। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'। একজন যাহাকে পরম সুখকর মনে করেন, আর একজন তাহার নিতান্ত বিদ্বেষী। সুতরাং পদার্থ বা বিষয়মাত্র সুখের উপকরণ নহে। মনোবৃত্তির সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সেই বিষয় প্রাপ্তিতেই সুখ হয়। যে বিষয় আমার

মন চাহিতেছে, সেই বিষয় পাইলে আমি সুখী হই ও তাহার অপ্রাপ্তিতে দুঃখ জন্মে সুতরাং দেশ কাল পাত্র অনুসারে সুখের উপকরণ ভিন্ন ভিন্নপ্রকার।

আবার অন্তঃকরণের বৃত্তি আমাদের অনেকপ্রকার ও পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। সুতরাং অনেক সময়ে বৃত্তিবিশেষের কাঙ্ক্ষিত পূর্ণ করিতে হইলে, অন্য বৃত্তির কাঙ্ক্ষিতের ব্যাঘাত ঘটে। ক্রোধের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, ক্ষমার ইচ্ছার বিরোধাচরণ করিতে হয়; প্রতিশোধ-প্রিয়তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, দয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এই জন্য অনেক সময়ে লোকে কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করে। উদ্দীপ্ত ক্রোধভরে একজনকে সংহার বা গুরুতর প্রহার করিয়া পরে উদিত ক্ষমা ও দয়ার বশে অতিশয় কাতর হয়। কাযেই ইচ্ছামত কার্য্য করিলেও তাহাতে মানুষের সুখ হয় না, কারণ সে কার্য্যে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। লোকে মনে করে নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিলেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলাম, অর্থাৎ আমি যাহা করিতে ইচ্ছা করি, অন্যে যদি তাহাতে বাধা না দেয়, তাহা হইলেই আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, যে কার্য্য আমারই বৃত্তিবিশেষের অনুমোদিত নহে, সে কার্য্য আমি স্বাধীনভাবে করিয়াছি বলা যায় না; সে কার্য্য যে আমার ইচ্ছারই বিরোধী। ইচ্ছা বৃত্তিবিশেষ নহে, হইলেও বৃত্তি সকলের আজ্ঞাবাহী; অর্থাৎ যখন যে বৃত্তির বিষয় উপস্থিত হয়, তখনই সেই বিষয় লাভের জন্য সেই বৃত্তি উত্তেজিত হয়, ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়। সে সময় যদি বিরোধী বৃত্তি সতেজ না থাকে, তাহা হইলে উত্তেজিত বৃত্তির ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলাম মনে হয় বটে, কিন্তু সে বৃত্তির উত্তেজনা কমিয়া গেলে, যখন বিরোধী বৃত্তির অস্তিত্ব অনুভব হয়, তখন বুঝা যায় যে, আমি স্বাধীন

ভাবে কার্য্য করিতে পারি নাই, একটি বৃত্তির অধীন হইয়া বৃত্তি-বিশেষের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছি; সেইজন্য তখন মনে বড় কষ্ট হয়। যদি একই সময়ে পরস্পর বিরোধী বৃত্তিদ্বয়ের সমান উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে নিজেই নিজের ইচ্ছা পূরণের বাধা দেয়। তখন ইচ্ছার পূরণ কি প্রকারে হইবে? তখন যদি পরস্পর বিরোধী বৃত্তির অনুমোদন মতে কার্য্য করিতে পারা যায়, তবেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করা হইবে। তাহা করিতে হইলে বিবেককে মধ্যস্থ রাখিয়া পরস্পর বিরোধী বৃত্তির সামঞ্জস্য করা আবশ্যক। অতএব ইচ্ছামত কার্য্য করিলেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করা হয় না, বিবেকের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করা হয়। কিন্তু বিবেকের প্রাধান্য না জন্মিলে ত বিবেক প্রবল বৃত্তির বিরোধী আজ্ঞা দিতে পারে না। সুতরাং বিবেককে শক্তিশালী করা একান্ত আবশ্যক। এমন শক্তিশালী করা আবশ্যক, যেন সকল বৃত্তিই তাহার মতে মত দেয়। যদি বিবেক এমন শক্তিশালী হয় যে, কোনও বৃত্তিই তাহার আজ্ঞার বিরোধাচরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে বিবেক সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে পারে, এবং সেই নির্দ্দেশ অনুসারে যদি ইচ্ছা জন্মে, তবেই মানব স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে, বলিতে পারা যায়। কিন্তু বিবেক যদি ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে পুষ্ট না হয়, আপন আপন যুক্তির আশ্রয়ে পুষ্ট হয়, অথবা যাহার যেমন শিক্ষা সেইরূপে পুষ্ট হয়, তাহা হইলে সে বলশালী বিবেক প্রকৃত কর্ত্তব্যপথে চালিত করিতে পারে না, পারিলেও তাহাতে সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। কেননা তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিবেক ভিন্ন ভিন্নরূপ মতাবলম্বী হয় ও পরস্পর পরস্পরের মতবিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

আমার যেমন স্বাধীনতা আছে, সকলেরই ত সেইরূপ স্বাধীনতা আছে। আপনার ইচ্ছানুযায়ী সুখ লাভ করিতে সকলেই যত্নবান্; সুতরাং একজনের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিলে, যদি আর একজনের ইচ্ছার বিরোধা-

চরণ করা হয়, তাহাতে অন্যে বাধা দেয়, কাযেই সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, সে ইচ্ছার পূরণও হয় না। অতএব যেরূপ কার্য্য করিলে পরের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সেরূপ ইচ্ছা করিতে নাই, করিলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যদি প্রকৃত সুখী হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে এমন ইচ্ছা করিতে হইবে যে, সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে অন্যে বাধা দিতে না পারে। কিন্তু কি কার্য্য পরের স্বাধীনতার বিরোধী, তাহা বুঝা বড় কঠিন। বুঝিলেও প্রবল স্বার্থ-পরতার দমন না করিতে পারিলে তাহা কার্য্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য। বিবেককে ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে শক্তিশালী করিতে পারিলে, তবে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়। কারণ যে কার্য্য অন্যের স্বার্থবিরোধী ও নিজের বৃত্তিবিশেষের বিরোধী, ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সে কার্য্য নিষিদ্ধ, এবং যে কার্য্য নিজের বৃত্তি সকলের অনুমোদিত ও পরস্পর সকলেরই ইচ্ছার অনুরূপ, সেইরূপ কার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রমতে বৈধ। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রমতে কর্ম্ম করিলে, সে কার্য্য নিজের বৃত্তিবিশেষের বা পরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে বিবেক বলশালী হইলে সকলের বিবেক একইপ্রকার ভাবাপন্ন হয়, কাহারও সহিত কাহারই মতভেদ হয় না; সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মতে একই পথে চলিবার চেষ্টা করায় সকলেরই বৃত্তিসামঞ্জস্য একইপ্রকার হয়।

আবার প্রকৃতিও অনেক ইচ্ছাপূরণের বাধা দেয়। সকলের অদৃষ্ট অর্থাৎ শক্তি, অবস্থাদি সমান নয়; কাযেই দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সম্ভব অসম্ভব, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করিয়া সাম্যস্বাধীনতা-বাদের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে মানব অভ্যস্ত হয়, যদি বিবেককে ধর্ম্মশাস্ত্রমতে পরিপুষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কখনই মানবের মনে অন্যায় বা অসম্ভব ইচ্ছার উদ্রেক হইবে না। যে ইচ্ছারই উদ্রেক হইবে, তাহাই পূর্ণ করিতে পারা যাইবে। সে ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদনের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই,

অনুতাপ বা দুঃখ জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। সমস্ত ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়া মানষ সুখী হইতে পারে। এইরূপে যদি সকলেই নিজে নিজে সুখী হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ, সমগ্র মানবমণ্ডলী সুখী হইতে পারে। সুতরাং পরকালে বিশ্বাস না থাকিলেও ইহকালের সুখের জন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রপরায়ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যদি পরকালে বিশ্বাস না থাকে, ইহকালীন সুখই যদি আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় হয়, তাহা হইলে জীবনই আমাদের প্রধান প্রার্থনীয় বলিতে হইবে। কেননা যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিনই আমাদের সুখ। যিনি যত অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, তিনি তত অধিক দিন সুখী হইবেন। সুতরাং ইহজীবনের সুখমাত্রের প্রার্থী হইলে,—সুখভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ আবশ্যক। যাহাতে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়, তাহার চেষ্টা প্রধান কর্ত্তব্য। কেবল দীর্ঘায়ু লাভ করিলেই সুখ হয় না, স্বাস্থ্যেরও একান্ত আবশ্যকতা; অসুস্থ শরীরে—পীড়িত শরীরে বাঁচিয়া থাকার তুল্য কষ্ট আর নাই। কি করিলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা যায়, কি করিলে সুস্থ শরীরে জীবন অতিবাহিত করিতে পারা যায়, ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাহার যেমন বিধান আছে, কুত্রাপি সেরূপ নাই। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে চলিলে যে শরীর সুস্থ সবল থাকে এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়, তাহা সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যাঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থা না মানিয়া যথেচ্ছাচরণ করেন, তাঁহারা চিরকাল রোগ-ভোগ করেন ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

ইহকালীন সুখই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, মৃত্যুভয় তাঁহাদের অতিশয় কষ্টদায়ক। যখনই তাঁহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে হইবে, যখনই কোনরূপ কঠিন পীড়া হইবে, বা যখনই দেশে কোনরূপ মহামারী উপস্থিত হইবে, তখনই 'এত কষ্ট করিয়া যে সকল সুখের

সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে, শূন্যে পরিণত হইতে হইবে, এককালে সুখের অভাব হইবে,’ এই সকল ভাবিয়া এককালে ম্রিয়মাণ হয়েন। মৃত্যুযন্ত্রণাও তাঁহাদের অতিশয় কষ্টদায়ক, সে কষ্টের কথা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁহাদের পরকালে বিশ্বাস আছে, যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে কিছুমাত্র ভয় করেন না, প্রত্যুত ভবযন্ত্রণা দূর হইল মনে করিয়া আনন্দিত হয়েন।

কেবল নিজের মৃত্যুভয় নহে, স্ত্রী পুত্র প্রিয়-পরিজনগণের মৃত্যুভয়ও নিয়ত থাকে। যে প্রিয় পরিবারের প্রেমে হৃদয় পূর্ণ, যে স্নেহের পুত্তলী পুত্রের স্নেহে হৃদয় বিভোর, যাহাদিগকে লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, তাহাদের মৃত্যু হইলে চিরকাল দুঃখসাগরে ভাসিতে হইবে মনে করিয়া যে দারুণ দুঃখ জন্মে, তাহার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। এ মর্ত্ত্যভূমিতে সকলই অনিত্য এবং এ মর্ত্ত্যধাম কেবল সুখের উপকরণে পরিপূর্ণ নহে। বলিতে গেলে দুঃখের ভাগই অধিক। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আছে, ভূমিকম্প আছে, জলপ্লাবন আছে, প্রবল বাত্যা আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মারীভয় আছে, দস্যুতস্করের ভয় আছে, যুদ্ধবিগ্রহ আছে, অশনিপাত আছে, বহুতর হিংস্রজন্তু আছে, কখন্ কোন্ বিপদ্ উপস্থিত হইয়া যে কাহার সর্ব্বনাশ করে, তাহার স্থিরতা নাই। কত সাধ করিয়া উত্তম অট্টালিকা প্রস্তুত হইল, ভূকম্পনে তাহা ধরাশায়ী হইল; কত ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া মনোহর উদ্যান প্রস্তুত হইল, প্রবল বাত্যায় তাহা ছিন্নভিন্ন হইল; কত শ্রম ও কত ব্যয়ে শস্য বপন্ করা হইল, জলপ্লাবনে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল; নানা ক্লেশে যে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইল, দস্যুতস্করে সমস্তই লইয়া গেল; কত আশা বুকে বাঁধিয়া কেহ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন, বিদেশীয় প্রবল শত্রু সে রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে

দূরীভূত করিয়া দিল, হয় ত চিরকাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল; কত অনুসন্ধানে কত চেষ্টায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সুন্দরী রমণী লাভ হইল, কালরোগে তাহার জীবনান্ত হইল; এইরূপ কত কষ্টের কারণ আছে। আধি আছে, ব্যাধি আছে, জরা আছে, শোকতাপ আছে। অনেক সময়ে এমন অবস্থা ঘটে যে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সুখের বিন্দুমাত্রও আশা থাকে না, প্রত্যুত অসহনীয় দুঃখভারে পীড়িত হইতে হয়। কোনও বিজ্ঞানে—মানবের কোনও চেষ্টাতে সে সকল দুঃখ প্রশমিত হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে এ সকল দুঃখও দূর হয়। যাঁহারা আবাল্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহারা সকলপ্রকার দুঃখই হৃদয়ে পাতিয়া লইতে পারেন, কোনরূপ দুঃখই তাঁহাদিগকে ম্রিয়মাণ করিতে পারে না। দুঃখ অনেক সময়ে তাঁহাদের সুখেরই হেতু হয়। যাঁহারা ধর্ম্মপথের পথিক নহেন, তাঁহাদিগকে বৃথা দুঃখ অনেক ভোগ করিতে হয়। অভ্যাস দ্বারা তাঁহারা কতকগুলি অপ্রাকৃতিক অভাবের সৃষ্টি করেন ও সেই অভাবজনিত দুঃখে জর্জ্জরিত হয়েন। ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণগণের সেরূপ দুঃখভোগ করিতেই হয় না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ হইলেই তাঁহারা তুষ্ট থাকেন।

শরীররক্ষার জন্য অন্ন, জল ও বায়ুর একান্ত প্রয়োজন। অন্নাদি না পাইলে কেবল যে শরীর নষ্ট হয় তাহা নহে—ক্ষুধা পিপাসাদির জ্বালায় লোকে অস্থির হয়, ক্ষুধা পিপাসাদির ন্যায় দুঃখ মানুষের আর নাই। এই দুঃখ নিবারণের জন্য আহার মানুষের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় প্রয়োজন আশ্রয়—যাহাতে শীত বাত আতপাদিতে শরীর নষ্ট না হয়, তাহার জন্য গৃহ ও বস্ত্রাদির নিতান্ত প্রয়োজন। হিংস্র জন্তু প্রভৃতি হইতে রক্ষিত হইবার জন্যও গৃহের প্রয়োজন। শীত বাতাদিতে কেবল যে শরীর নষ্ট হয় তাহা নহে, এ সকল দেহে লাগিলে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়। তৃতীয় প্রয়োজন দম্পতি-সম্মিলন—

দম্পতি-সম্মিলন না হইলে সৃষ্টিই থাকে না, তাই ঐ মিলনাকাঙ্ক্ষা মনুষ্য-মনে অতিশয় প্রবল। এই কয়েকটি অভাবপূরণ মানবমাত্রেরই প্রয়োজনীয়; বর্ব্বর মনুষ্যেরও এই সকল দুঃখ নিবারণ না হইলে চলে না। যদি এই দুঃখ কয়টি নিবারিত হয়, তাহা হইলে মানুষ ঐহিক দুঃখের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয় বলিতে পারা যায়। তাই যাঁহাদের এই কয়টি বিষয়ে সুখ আছে, তাঁহাদের সকল সুখই আছে মনে করেন। প্রয়োজন মত অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, গৃহ, পরিচ্ছদাদি পাইলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কিন্তু এই সকলের অভাব হইলে যেমন সুখ ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, অতিরিক্ত হইলেও সেইরূপ সুখ ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। আহার অভাবে যেমন দুঃখ জন্মে ও প্রাণনাশ হয়, অতিরিক্ত আহারে এবং কুদ্রব্য আহারেও সেইরূপ দুঃখ জন্মে ও প্রাণনাশ ঘটে। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হইলে যেমন দুঃখ হয়, অতিরিক্ত হইলেও সেইরূপ নানা দুঃখের উদয় হয়। রিপুনিচয় ক্রমাগতই আধিক্যে লইয়া যায়, তজ্জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগে ইচ্ছা হয় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চয়ে ইচ্ছা হয়। শত শতপ্রকার দুঃখ এইরূপ অযথা ব্যবহার হইতে উদ্ভূত হয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের অযথা বর্দ্ধন হেতু মানুষ হিংস্র পশু হইতেও অপকৃষ্ট হয়, এবং নানা দুঃখে জর্জ্জরিত হইতে থাকে; কিছুতেই অভাব মিটে না, সন্তোষ বা শান্তি তাহাদের জন্মেই না। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলেন, তাঁহারা কোন বৃত্তিরই অযথা বর্দ্ধন হইতে দেন না, নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট সকল বৃত্তিরই যথোচিত পরিচালনা করিয়া সর্ব্ববিষয়ে সুখী হয়েন। অল্পেই তাঁহাদের তুষ্টি সম্পাদিত হয়, অভাবজনিত দুঃখ তাঁহাদের নিতান্তই অল্প, এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, বিনয়, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি-জনিত নানা বিমল সুখে সুখী হয়েন। দয়া করিলে, পরের উপকার করিলে যে বিপুল আনন্দ লাভ হয় এবং যশ, মহত্ত্ব, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা

প্রভৃতি হইতে মানুষ যে আনন্দ লাভ করে, তৎসমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রচর্চ্চার ফল। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে এইরূপ কত বিমল আনন্দ যে লাভ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। শরীর ও মন নিয়ত সুস্থ থাকে এবং নানা-প্রকার বিমল আনন্দে হৃদয় নিয়ত পূর্ণ থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে এই সকল বিমল আনন্দ পাইবার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, প্রত্যুত নিয়ত নব নব দুঃখভারে শরীর মন জর্জ্জরিত হয়। নিয়তই নূতন নূতন প্রকারের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, সেই আকাঙ্ক্ষা সকলের পূরণ জন্য নিয়তই পরস্পরের দ্বন্দ্ব হয়, ও অবশেষে আকাঙ্ক্ষার অপূরণ-জনিত দুঃখে এককালে ম্রিয়মাণ হইতে হয়; সঙ্গে সঙ্গে শরীর অসুস্থ ও মন উৎসাহশূন্য হইয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

দেখা যাইতেছে মানব ভোগসুখের আস্বাদসুখের অপেক্ষা সুখের উপকরণ সংগ্রহের দুঃখই অধিক ক্ষণ পায়। এক দণ্ডের মধ্যেই আহার শেষ হইয়া যায়। সুতরাং যত সুরস দ্রব্য আহার কর, তাহার সুখের ভোগ একদণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। ঐরূপ সুমধুর সংগীত শ্রবণ, সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ, সুশোভন দৃশ্য দর্শন, সুস্নিগ্ধ দ্রব্যের স্পর্শ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রিয়তমা রমণীর ক্রীড়া কৌতুক, কিছুই অধিক ক্ষণ ভাল লাগে না। কিন্তু ঐ সকলের প্রাপ্তির জন্য দিবা-নিশি পরিশ্রম করিতে হয়। অর্থের জন্য করিতে না হয় এমন কর্ম্মই নাই। শ্রমজীবিগণ দিবারাত্রি মজুরি করিতেছে, বৃষ্টিতে শীতে কোনও সময়েই বিশ্রাম নাই, নানা কষ্ট সহ্য করিতেছে; শিল্পিগণ শিল্প-কার্য্যে নিয়তই পরিশ্রম করিতেছে; বণিক্‌গণ বাণিজ্যব্যাপারে নিয়তই বিপদে পতিত হইয়া মুমূর্ষু হইতেছে; এই আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় বাল্যকাল হইতে অর্থকরী বিদ্যার উপার্জ্জন-জন্য দিবানিশি পরিশ্রম করি-তেছেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নীরস বিষয় সকল কেবল মুখস্থ করিতেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কি না সেই ভয়ে

কম্পিতকলেবর হইতেছেন, পরে চাকরী গ্রহণ করিয়া প্রত্যুষে উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া কার্য্যস্থলে গমনপূর্ব্বক সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন। এত কষ্টের অর্থ সঞ্চিত থাকিলেও সুখ হয় না; যাহার অধিক অর্থ আছে, তাহার যে কত চিন্তা, কত দুঃখ, তাহার ইয়ত্তা নাই; দস্যু তস্করের ভয় নিয়তই করিতে হয়; আত্মীয় স্বজন, এমন কি, প্রিয়তম পুত্রও অর্থের জন্য শত্রু হয়। অর্থ থাকিলে লোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া এত অপকর্ম্ম করে যে, তাহাতে এককালে স্বাস্থ্যধনে বঞ্চিত হয়, প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। যাহার জন্য মানব এত দুর্বিষহ দুঃখ সহ্য করে, সে অর্থলভ্য সুখ কতক্ষণ ভোগ করে? সুখভোগের সময় কতটুকু? যাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদেরও সুখভোগের সময় অধিক নহে। যে সকল চিন্তাশূন্য যুবক ও ধনিসন্তান কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া কেবল আমোদপ্রমোদ ও ইন্দ্রিয়সেবাতেই সময়ক্ষেপ করেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়েন। এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় মনুষ্যের সুখভোগের সময় অতি অল্প, সুখের চেষ্টাতেই অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহা যদি হইল, তবে অবশ্যই বলিতে হইবে সুখভোগ মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য নহে, কার্য্যই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য। কার্য্য করিতে সুখবোধ করিলেই মানব সুখী হয়, যিনি নিয়ত সুখকর কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তিনিই প্রকৃত সুখী। ফলের জন্য ব্যগ্র হইলে সুখ হয় না,—ফলে প্রকৃত সুখ হয় না। ফললাভ হইলে প্রথমে একটু সুখ হয় বটে, কিন্তু সে সুখ অতি অল্পক্ষণস্থায়ী। তাই গীতা বলিয়াছেন—‘কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’। অতএব যখন কর্ম্মই আমাদের প্রধান অবলম্বনীয়, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যিনি এমন কর্ম্ম করেন যে, সেই কর্ম্ম করিবার সময় দুঃখবোধ না হইয়া সুখবোধ হয়, তিনিই নিয়ত সুখী। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাদের লক্ষ্য যত কর্ত্তব্য

কার্য্যের দিকে, তত ফলের দিকে নহে ; সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যকালে কোনপ্রকার দুঃখই হয় না। ফললাভ হইবে কি না, এ চিন্তায় তাঁহারা জর্জ্জরিত হয়েন না, ফললাভ না হইলেও হতাশ বা দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়েন না, সমান আগ্রহের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। কোন ব্যক্তিই কেবল ভোগসুখের পরতন্ত্র হইয়া অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করিতে পারে না, কিন্তু সাধু ভক্ত যোগী সমস্ত জীবন একই ভাবে থাকিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল পারত্রিক মঙ্গলের নিদান নহে, ইহকালীন সুখেরও একমাত্র নিদান।

অর্থচেষ্টার ফল সেরূপ অবশ্যম্ভাবীও নহে। কত লোক অর্থের জন্য কত কষ্ট করিতেছে, কিন্তু সকলের সে চেষ্টা সফল হয় না, অধিকাংশ লোকে আশাভঙ্গজনিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়। যাহাদের আশা পূর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যেও অনেকের অন্যপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়া সুখের ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মানুশীলনের কষ্ট গ্রহণ করেন, তাঁহাদের চেষ্টা কখনই নিষ্ফল হয় না। ধর্ম্মাচরণের ফল তাঁহাদের নিশ্চয়ই ফলিবে ; অন্ততঃ দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়াই বোধ হইবে না। অনুশীলনের ফলে, অভ্যাসের গুণে তাঁহাদের প্রকৃতি এমন হইয়া যায় যে, দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না। বাল্যকাল হইতে অভ্যাস থাকায় কৃষকের যেমন রৌদ্র বৃষ্টিতে কষ্ট বোধ হয় না, ধীবর যেমন নিয়ত জলমগ্ন থাকিয়া অসুখ বোধ করে না, ধর্ম্মাচরণের অভ্যাসফলে সেইরূপ সাংসারিক সকলপ্রকার দুঃখেরই তীব্রতা নষ্ট হয়।

সত্য বটে, কেবল দুঃখ নিবারিত হইলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না, সুখভোগও স্পৃহনীয়। কিন্তু যে সুখভোগের ফলে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সেরূপ সুখ কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। বিবিধ দ্রব্য আহারসময়ে বেস সুখ হয় বটে, কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক। ক্ষুধা ও স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে শাস্ত্রসম্মত যে

কোনও ভোজ্য ভোজন করিলে সে সুখ লাভ হয়। যে সকল আহার শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, তাহা যদি মুখরোচক হয় এবং তদ্দ্বারা যদি শরীরের পুষ্টি সাধনও হয়, তাহা হইলেও তাহাতে নানা দুঃখের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। শরীর রক্ষা বলিলে ত কেবল বাহ্যশরীর-রক্ষা বুঝায় না, অন্তর্দেহ-রক্ষাও বুঝিতে হইবে। এমন অনেক দ্রব্য আছে, তাহাতে বাহ্য শরীর সবল হয় বটে, কিন্তু মানবীয় অন্তর্দেহ একান্ত দুর্ব্বল হয়। সেরূপ দ্রব্য ভোজনে ক্ষণিক সুখ পাইলেও তদ্দ্বারা মানবত্ব নষ্ট হয় ও বহু কষ্ট পাইতে হয়। যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে ও যেরূপ সময়ে ভোজন করিলে মানবীয় শক্তি-সমূহের বৃদ্ধি হয় ও পাশবিক নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের উত্তেজনা কমিয়া যায়, সেই সকল দ্রব্য সেই পরিমাণে সেইরূপে ভোজন করিলেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়, অর্থাৎ তাহাতে শরীর ও মন সুস্থ থাকে, লোকের প্রিয় হওয়া যায়, যশোলাভজনিত অতুল আনন্দ লাভ হয়, এবং বিবেকের পরিবর্দ্ধন হওয়ায়, যখন যে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহারই অধীনে কার্য্য করিয়া দুঃখ পাইতে হয় না। ঐরূপ আহা-রের নিয়মই শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। তিথ্যাদিবিশেষে যে দ্রব্যবিশেষ ভোজন নিষিদ্ধ ও উপবাসাদির যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতেও ঐরূপ হিত সাধিত হয়। গলাধঃকরণকালে যে একটা ক্ষণিক সুখ হয় এবং লোভ বশতঃ যাহা তাহা খাইবার যে স্পৃহা হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে অনেক সময়ে সে সুখের ও ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় সত্য; কিন্তু কুদ্রব্য ভোজন ও অনিয়মিত আহারে যে পরিমাণ দুঃখ জন্মে, তাহার সহিত তুলনায় ঐ সুখ সুখ বলিয়াই গণনীয় নহে। এককালে মনু-ষ্যত্ব ও স্বাস্থ্য হারাইয়া অতুল দুঃখে চিরনিমগ্ন থাকা অপেক্ষা কি সেই ক্ষণিক সুখ ত্যাগ সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ নহে? ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মানু-সারে আহার করিলে যদি ঐরূপ মহদ্দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে গলাধঃকরণজন্য ক্ষণিক সুখ নাই বা হইল। বস্তুতঃ

গলাধঃকরণকালীন সুখ বৈধ আহারে অধিকই হয়। কারণ শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে ক্ষুধা হয়, ক্ষুধা থাকিলেই সমস্ত আহারীয় দ্রব্যই সুরস বোধ হয়, এবং প্রকৃত সুরস দ্রব্যমাত্রেরই ভোজন ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিত।

ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিবাহপ্রথাও সমূহ সুখের হেতু। যাঁহারা বলেন নিজের ইচ্ছামত স্ত্রী পছন্দ করিয়া না লইলে সুখ হয় না, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সত্য বটে, পূর্ব্বানুরাগ চরিতার্থ হইলে প্রথমে বিলক্ষণ সুখ বোধ হয়, কিন্তু সেরূপ সুযোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে; ঘটিলেও পরিণামে সে সুখ থাকে না, প্রত্যুত অনেক সময়ে সুখের পরিবর্ত্তে বিলক্ষণ কষ্টই পাইতে হয়। অনেক স্থলেই দেখা যায়, যাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে, তাহার অনুরাগ তাহার প্রতি জন্মে না, প্রত্যুত তাহার প্রতি সে নিতান্তই বিরূপ হয়। এরূপ স্থলে প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর দুঃখের সীমা থাকে না। যে স্থলে উভয়ের অনুরাগ জন্মে, সে স্থলে প্রায়ই সামাজিক ও অন্য নানা বাধায় তাহাদের মিলন সংঘটন হয় না। এরূপ অবস্থায় প্রণয়ীর যে কি কষ্ট হয়, ও তাহার পরিণাম-ফল যে কি ভয়ানক হয়, তাহা য়ুরোপীয় প্রেমিক প্রেমিকাগণের বিবরণ ও নাটক নভেলাদির প্রেমবৃত্তান্ত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আবার এরূপ অনুরাগ অনেক সময়ে রূপজই হইয়া থাকে; কাযেই প্রেমিক প্রেমিকার আভ্যন্তরিক দোষ এরূপ স্থলে কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় না। সুতরাং অনেক সময়ে এরূপ মিলনের পরিণাম অতিশয় দুঃখের হয়। এতদ্ভিন্ন বংশজাত পীড়াগ্রস্ত ও নিকট সম্পর্কীয়া রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিলে জাত-সন্তান অনেক অসুখের হেতু হয়। অনুরাগাকৃষ্ট নির্ব্বাচন-জাত বিবাহফলে অজ্ঞ যুবক যুবতীকে এইরূপ অনেক কষ্ট পাইতে হয়। সে সকল কষ্টের সহিত কাব্যগত পূর্ব্বরাগ-জনিত প্রেম-সুখ সুখেরই মধ্যে গণনীয় নহে। অতএব

এরূপ দুঃখ পাওয়া অপেক্ষা, যাহাতে পূর্ব্ব অনুরাগ না জন্মে, তাহা করাই যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহাতে আর ভুল নাই। পিত্রাদিকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী নির্ব্বাচনে এ সকল দুঃখের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। তাঁহারা চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব পরস্পরের সুখের উপযোগী মিলন করিয়া দেন। তবে সকল সময়ে হয় ত ইচ্ছামত সুন্দরী ও গুণবতী নারী না জুটিতে পারে; কিন্তু কোন্ বিষয় সকলের ইচ্ছানুযায়ী হয়? সকলে ত সমান বলশালী, সমান সুন্দর, সমান গুণবান্, সমান ধনসম্পন্ন নহেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, প্রতিবেশী, জন্মভূমি ত সকলে ইচ্ছানুযায়ী পান না; এই সকল বিষয় মানব স্বভাবতঃ যেমন পায়, তাহাতেই যখন সুখী হয়, তখন স্ত্রী বা স্বামী অবস্থানুসারে যেমন পাওয়া যায়, তাহাতে সুখ হইবে না কেন? পতি বা পত্নী ইচ্ছামত না পাইলে যদি তাহাকে ভালবাসা না যায়, তাহা হইলে যে প্রদেশে জন্ম হইয়াছে, সে প্রদেশ যদি ইচ্ছানুরূপ ভাল না হয়, পিতা মাতা ও স্বজাতি যদি ইচ্ছানুরূপ ভাল না হয়েন, তাহা হইলে জন্মভূমি, পিতা মাতা ও স্বজাতি—কাহাকেই ত ভালবাসিতে পারা যায় না। কিন্তু লাপ্‌লাণ্ডবাসীও যখন স্বদেশানুরাগী, তখন কেন তোমার স্বীয় পতি পত্নীতে অনুরাগ জন্মিবে না? সত্য বটে, যাহাকে পাইবার জন্য প্রাণ আকুলিত হয়, তাহাকে না পাইলে অতিশয় কষ্ট হয়, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিলে সেরূপ আকাজ্ক্ষা জন্মে না, তজ্জন্য কষ্টও পাইতে হয় না। কর্ত্তব্যবোধে সেরূপ অনুরাগের পথেই কেহ যায় না; ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ জন্মিবার পূর্ব্বেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। তখন সমস্ত অনুরাগ বিবাহিতের উপরেই পড়ে। পতিপত্নীর মিলন হইলেই মন শান্ত হয়।

এ কথাও মনে করা উচিত যে, প্রণয় তত গভীর হওয়া সুখের নহে, প্রভূত দুঃখেরই হেতু। কেননা যাহাকে না দেখিলে জগৎ অন্ধকার

বোধ হয়, তাহাকে সুস্থ শরীরে বাঁচাইয়া রাখা আমাদের সাধ্যাতীত, এবং তাহাকে চিরকাল অনন্যাসক্ত রাখাও আমাদের অসাধ্য। সুতরাং যাহাকে এত ভালবাসি, তাহার যদি মৃত্যু হয়, অথবা সে যদি অন্যের অনুরাগী হয়, তখন কষ্টের সীমা থাকে না। অতএব ভালবাসা সুখ-কর হইলেও উহার মাত্রা অতিক্রম হইলে ইহকালীন সুখের সমূহ ব্যাঘাত হয়। প্রণয়িযুগলের মিলনে যত সুখ, বিচ্ছেদে তদপেক্ষা অনেক কষ্ট। যত অনুরাগের বৃদ্ধি, বিচ্ছেদে ততই অধিক কষ্ট। বিচ্ছেদের আশঙ্কা যখন আমাদের পদেপদে, তখন প্রেমে এককালে মগ্ন হওয়া দুঃখেরই [illegible]। আবার যে অনুরাগ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরতন্ত্র নহে, প্রবল আকর্ষণই যে অনুরাগের মূল, সে অনুরাগাকৃষ্ট প্রণয় ভঙ্গ হইলে মানুষ এককালে অস্থির হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া ভালবাসিলে, সে ভালবাসার পাত্রের সহিত অতিশয় প্রণয় হই-লেও তাহার অভাবে তাদৃশ কষ্ট হয় না। কেননা যে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া ঐ ভালবাসার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি-রই পরতন্ত্র হইয়া সে শোক সংবরণ করিয়া অন্যপ্রকার কর্ত্তব্যরত হইতে পারা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রের স্ত্রী পুত্র সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তৎসমস্তই সমূহ সুখের হেতু।

ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রতি কতকগুলি কঠিন নিয়ম আছে সত্য; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় সেরূপ না হইলে আরও কষ্টের কারণ হইত। সত্য বটে, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নাই ও বিধবার ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল অবস্থা তাহাদের সুখেরই হেতু। কোন দেশেই স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে; যে সকল দেশে কিঞ্চিৎ স্বাধী-নতা আছে, সে সকল দেশের অনেক স্ত্রীই জীবিকার জন্য সমূহ

কষ্ট পায়, এবং তথাকার স্ত্রীজাতির ব্যভিচার ও বিলাস-বাসনা এত অধিক হয় যে, তজ্জন্য সংসার বিলক্ষণ কষ্টের হইয়া পড়ে। ভারতে সে কষ্ট নাই; ভারতে যেমন বিধবা-বিবাহ নাই, সেইরূপ অবিবাহিতা কুমারী থাকিতে পায় না। বিলাতে বিধবাগণের অধিকাংশের বিবাহ হইলেও বহুতর কুমারীর বিবাহ হয় না। সে সকল চিরকুমারীর কষ্টের সীমা থাকে না, অনেকের উদরান্নও জুটে না, এবং সংযম অভ্যাস না থাকায় তাহারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া এককালে অপদার্থ হইয়া পড়ে। ভারতীয় বিধবাগণ সংসারের অন্তর্গত থাকায় ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা-জনিত কষ্ট ভিন্ন আর কোনও কষ্টই পায় না। ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়জনিত কষ্টও তাহাদের সেরূপ অনুভব হয় না। আধুনিক সভ্যজাতির মতে অবস্থা ভাল না হইলে কাহারও বিবাহ করা উচিত নয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে অনেক নরনারীর পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। তাহাতে যদি সেই সকল অবিবাহিত ও অবিবাহিতা-গণের কষ্ট না হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণা বিধবাদিগের কষ্ট হইবে, তাহার অর্থ কি? যদি বল ব্রহ্মচর্য্যের কষ্ট তাহাদের অধিক, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে না পারিলে মানবের যত কষ্ট হয়, ব্রহ্মচর্য্যের কষ্ট তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প। ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা নিবারণ জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান। পাশ্চাত্য অবি-বাহিতা রমণীদিগের ব্রহ্মচর্য্যের কষ্ট গ্রহণ করিতে হয় না বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও কষ্টদায়ক ইন্দ্রিয়ের তাড়না সহ্য করিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের তাড়না কমাইতে পারিলে যে, ইন্দ্রিয়জনিত কষ্ট মানুষ বুঝিতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসী বা ভৈরবী এবং আধুনিক চিরকৌমারব্রতধারীরা ত ইচ্ছা করিয়াই বিবাহসুখ ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহাদিগকে যদি দুঃখভারাক্রান্ত না বলা যায়, তবে বিধবাদিগকে কেন দুঃখভারাক্রান্ত বলিতে হইবে? সন্ন্যাসী প্রভৃতি যেমন ঈশ্বরপরায়ণ

হইয়া জগতের বিবিধ কার্য্য করিয়া সুখী হয়েন, হিন্দু বিধবাগণও সেইরূপ সংসারের ও জগতের নানাপ্রকার হিতকর কার্য্য করিয়া, ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া সুখী হয়েন। ব্রহ্মচর্য্যের কষ্ট তাঁহাদিগকে ম্রিয়মাণ করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাতে তাঁহারা সুখ বোধ করেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বর্ণবিভাগ ও বর্ণ অনুসারে বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, তাহাতেও আমাদের দুঃখের হ্রাস ও সুখেরই বৃদ্ধি হয়। কেননা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজসেবা, সকল উপায়েই অর্থাগম হয়। নিপুণতা সহকারে যে কার্য্যই করিবে, তাহাতেই প্রভূত অর্থের আগম হইবে। যাঁহার শক্তি, চেষ্টা ও নিপুণতা আছে, তিনি যে কার্য্যই অবলম্বন করুন, তাহাতেই প্রভূত অর্থ ও সম্মান লাভ করিতে পারেন। যাঁহার চেষ্টা, শক্তি ও নিপুণতা নাই, তিনি কোনও কার্য্যেই নিপুণতা লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং যাহাতে কার্য্য-শক্তি, চেষ্টা ও নিপুণতা জন্মে, তাহার উপায় করিতে পারিলেই লোকে স্বচ্ছন্দচিত্তে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা ও আলোচনা হইলেই নিপুণতা জন্মে। শক্তি অনেকটা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, এবং চেষ্টা প্রবৃত্তিমূলক। যে কার্য্য ভাল না লাগে, সে কার্য্য করিতে কেহই ইচ্ছা ও চেষ্টা করে না; প্রত্যুত নিয়তই সে কার্য্য ত্যাগ করিবার চেষ্টা করে। যে কার্য্যের শক্তি নাই, সে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; যে বিষয়ের শক্তি যাহার আছে, তাহাকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিলে যেমন তাহাতে নিপুণতা লাভ হয়, অন্য বিষয়ে সেরূপ হয় না। আবার উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে কোনও কার্য্যেই নিপুণতা জন্মে না; অনেকের ভাগ্যে উপযুক্ত শিক্ষক জুটে না। সাধারণতঃ লোকে পিতার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পৈতৃক কার্য্য সম্পাদনের শক্তি পুত্রের প্রায়শঃ থাকে। বাল্যকালে পিতা পুত্রকে বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য শিক্ষা দেন ও তাহার আলোচনায় নিযুক্ত রাখেন, এবং বাল্যকাল হইতে

পিত্রাদি গুরুজন, সমবয়স্ক ভ্রাত্রাদি আত্মীয়, সকলকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া সেই কার্য্যে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি জন্মে; কাযেই তাহাতে আন্তরিক চেষ্টা হয়। সুতরাং পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিলে সকলেই স্বচ্ছন্দচিত্তে তৎপরায়ণ হয়, ও নিপুণতা সহকারে কার্য্য করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জ্জন করে। পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিলে এ সকলের কোন সুবিধাই থাকে না। কিছু দিন এক কার্য্য করিয়া পরে তাহা আর ভাল লাগে না। অথবা যাহাতে নৈপুণ্য না জন্মে, তাহা ত্যাগ করিয়া আর একপ্রকার কার্য্য আরম্ভ করে। এইরূপে নানা কষ্ট পাইয়া ভাগ্য বশতঃ কেহ বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন, কেহ বা এককালে দীনহীন হয়েন। যাঁহারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদেরও মনে সুখ জন্মে না; পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি জন্মে না, নিয়তই তাহার জন্য কষ্ট পান।

আমাদের আচারপ্রণালী ও পূজাপদ্ধতিও সমূহ সুখের হেতু। হিন্দুগণ প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট আচারসম্পন্ন হইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া পুষ্প-চন্দনধূপাদি লইয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া যখন নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান, জপ, প্রাণায়ামাদি করেন, যখন অঞ্জলি পূরিয়া সুগন্ধি পুষ্প দেবচরণে উপহার দেন, তখন যে তাঁহাদের কি আনন্দ হয়, তাহা তাঁহা-রাই জানেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারি-বেন যে, এরূপ বিমল আনন্দ আর কিছুতেই নাই। আবার পূজা পার্ব্বণ বা ব্রতাদি উপলক্ষে নানাপ্রকার সুখজনক ব্যাপার সংঘ-টিত হওয়ায় কতই সুখ জন্মে। গৃহদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুরভি গন্ধে গৃহপ্রাঙ্গণ আমোদিত, বাদিত্রাদির সুমধুর রবে হৃদয় প্রফুল্ল, মধুর-স্বর-সংযুক্ত মন্ত্রের মধুর ধ্বনিতে হৃদয় বিমোহিত হয়। গৃহের যাবতীয় স্ত্রীপুরুষ সুপবিত্র মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া, সুগন্ধি পুষ্পে

অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ভক্তিভাবে স্বরসংযোগে স্তব পাঠ করিতেছেন, আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বগণ আনন্দিত মনে দেব দর্শন করিয়া পরস্পরের মধুর সম্ভাষণে সুখলাভ করিতেছেন, চারিদিকেই ভোজন-ব্যাপার চলিতেছে, দরিদ্রগণ আহারে প্রীত হইয়া হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছে, রাত্রে আলোকমালায় গৃহ অতুল শোভায় শোভিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীতবিশেষও চলিতেছে, এই সকলের সম্মিলনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হয়, আর কিসে সেরূপ হইতে পারে? তৎকালে কোন প্রকার দুঃখই থাকে না। বস্তুতঃ ধার্ম্মিকগণের সুখের সীমা নাই। যখন তাঁহারা ভক্তিভাবে ঈশ্বরের ধ্যান, পূজা, নামজপ, বন্দনাদি করেন, যখন তাঁহারা পরম পিতার অমৃতোপম প্রসাদ ভোজন ও আশ্বাসবাণী শ্রবণ করেন, যখন তাঁহারা অতিথি অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান, যখন তাঁহারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করেন, যখন তাঁহারা ভক্তি সহকারে পিতা মাতা গুরু প্রভৃতির সেবা করেন, যখন তাঁহারা অপত্যনির্ব্বিশেষে আশ্রিতবর্গের প্রতিপালন করেন, যখন তাঁহারা নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলকে বিবেকের অধীন করিয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তিসকলের প্রয়োজন মত পরিচালনা করেন, যখন তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া স্বজাতিবর্গের সহিত প্রেমালাপ করেন, যখন তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিয়া ভগবানের পরম তত্ত্ব অবগত হয়েন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে যে নির্ম্মল আনন্দলাভ হয়, কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র-অবিশ্বাসীই তাহার কণামাত্র সুখের আস্বাদ পায় না। এইরূপ সুখকর কার্য্যেই তাঁহাদের সময় আনন্দে কাটিয়া যায়। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা করায়, তাহাতেও তাঁহাদের আনন্দ ভিন্ন দুঃখ জন্মে না।

এইরূপে অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তৎসমস্তই আমাদের ইহকালীন

সুখের আকর। সুতরাং পরকালে বিশ্বাস যদি নাও থাকে, ধর্ম্ম-শাস্ত্র যদি ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া বিশ্বাস নাও হয়, তাহা হইলেও উহার অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। যে বিজ্ঞান দর্শনের কথায় আমরা মনুষ্য-কৃত বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, সে বিজ্ঞান দর্শনও ত মনুষ্য-মুখনিঃসৃত। মনুষ্যকৃত বিজ্ঞান দর্শন যদি আমাদের অব-লম্বনীয় হয়, তবে এমন হিতকর ধর্ম্মশাস্ত্র কেন আমাদের অবলম্ব-নীয় হইবে না? অতএব কি আস্তিক, কি নাস্তিক, সকলেরই ধর্ম্ম-শাস্ত্রপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। এ বিশ্বব্যাপারের রহস্য বুঝা, ঈশ্বর-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। অতএব তৎসম্বন্ধীয় তর্কপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন না হইয়া ইহাই দেখা উচিত যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা আমাদের কিরূপ কল্যাণের হেতু। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তাহা হইলে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝি আর না বুঝি, পরকালে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, ঐহিক সুখ সাধনের জন্যও ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলিয়া দেখ, সন্তানগণকে আবাল্য তৎপথে পরিচালিত করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে আমাদের কথা সত্য কি না। কিছুদিন যত্নের সহিত পরীক্ষা করিলেও কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে; অধিক কি, তাহা হইলে পরকালের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ ও ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতায় যে কত আনন্দ লাভ হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কেবল অযথা অবিশ্বাসের বশীভূত হইয়া বা বৃথা তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনতার কর্ম্ম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরেরই প্রণীত।

যত দূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল ধর্ম্মশাস্ত্র সকল মিথ্যা নহে, পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, স্বার্থপরগণের স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে প্রণীতও নহে, এবং ইহাও বুঝা গেল কেবল পরকালের সুখের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন নহে, ঐহিক সুখও ধর্ম্মশাস্ত্রের অবলম্বন ভিন্ন হয় না। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র যে সত্য ও সকলের একান্ত অবলম্বনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলে কেবল যে সুখ লাভ হয় না তাহা নহে, মানবের রক্ষাই হয় না—অস্তিত্বই থাকে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় ভিন্ন মানবের কি মানবজীবন, কি পশুজীবন, কিছুই রক্ষিত হয় না। রক্ষাশাস্ত্র বলিয়াই ইহার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি; যদ্দ্বারা ধৃত বা রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যে আচরণ করিলে যে জীব রক্ষিত হয়, তাহাই সেই জীবের ধর্ম্ম। যাহা মানুষকে রক্ষা করে, তাহা মানুষের ধর্ম্ম। ইতর প্রাণিগণ ঈশ্বরদত্ত সংস্কারানুসারে জন্মমাত্রই আপন আপন ধর্ম্ম অবগত হয়, ও তদনুসারে কার্য্য করিয়া রক্ষিত হয়। যে দ্রব্য ভক্ষণে তাহাদের অনিষ্ট হয়, তাহা দেখিলে বা আঘ্রাণ করিলেই তাহারা বুঝিতে পারে, কোন প্রলোভন বশতঃই তাহারা তাহা ভোজন করে না। কন্দর্পের বশীভূত হইয়া কখন তাহারা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা করে না, সঞ্চয়ের জন্য কোন প্রাণীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয় না, উদর পূর্ণ হইলেই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, আপনার প্রাধান্য স্থাপন জন্যও কোন প্রাণী

কাহারও অনিষ্ট করে না। ঈশ্বর যে জীবকে যে বল দিয়াছেন, সেই বলেরই আশ্রয়ে সেই জীব আত্মরক্ষা করে। কাহারও দন্ত, কাহারও নখ, কাহারও শৃঙ্গ আত্মরক্ষার অস্ত্র; কোন জীবের কেবল দ্রুতগমনশক্তিই আত্মরক্ষার উপায়; শত্রু দেখিলেই তাহারা চিনিতে পারে, এবং দ্রুত গতিতে পলায়ন করে। এইরূপে যে উপায়ে যে জীব রক্ষিত হইতে পারে, ঈশ্বর তাহাকে তৎপরায়ণ করিয়াছেন। কাযেই তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। মানুষের ত সেরূপ নহে; আত্মরক্ষার কোন স্বাভাবিক শক্তিই মানবের নাই; ইতর প্রাণীর ন্যায় তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত প্রভৃতি স্বাভাবিক কোন অস্ত্র নাই; অন্য সাহায্য না পাইলে, ব্যাঘ্র দূরের কথা, কুক্কুরের আক্রমণ হইতেও মানব আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না। শীতাতপ নিবারণের উপযুক্ত দেহ মানবের নয়; কৃত্রিম দ্রব্যের সাহায্য না পাইলে মানব শীতাতপাদি হইতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারে না। কোন্ দ্রব্য মানুষের খাদ্য এবং কোন্ দ্রব্য অখাদ্য, কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ ভক্ষণে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়, ও কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণ ভক্ষণে প্রাণনাশ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, কতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া উচিত, কোন্ দ্রব্য কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুবর্গের অযথা বৃদ্ধি করে, ও কোন্ দ্রব্য বিনয় ক্ষমা ধৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধি করে, কিছুই মানব নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। মানবের এইরূপ লক্ষ লক্ষ-প্রকার জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য আছে। সকল-প্রকার তত্ত্ব নির্ণয় দূরে থাকুক, এক বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব অতি বিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তিও স্থির করিতে পারেন না; মুটে মজুর কৃষক প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকের ত কথাই নাই। সুতরাং মানবহৃদয়ে কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি আছে, তাহাদেরই বশবর্ত্তী হইয়া, পরের ও নিজের অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। পরে হাত ধরিয়া নিবৃত্ত না করিলে কখনই এই সকল অনিষ্ট সাধনে বিরত হয় না। এমন কোন প্রবল বিরোধী

শক্তি নাই যে, তাহার বলে মানব স্বতঃ সে সকল অনিষ্ট নিবারণ করিতে পারে। শিশুগণ যদি পিতা মাতার শিক্ষা ও শাসনাধীনে না চলে, তাহা হইলে যেমন তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না, বয়ঃপ্রাপ্ত মানব যদি পূর্ব্ব-শিক্ষানুরূপ কার্য্য না করিয়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারাও বালকের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকেও নিয়ত পরের নিদেশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। যিনি কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহার সে তত্ত্ব বাস্তবিক তাঁহার নিজের নহে; যে শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সেই শিক্ষা হইতে উৎপন্ন, সুতরাং পরকীয়; সে শিক্ষা যদি ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক হয়, তাহা হইলে সে তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রজাত; আর যদি সে তত্ত্ব বিজ্ঞানশিক্ষাজাত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিজ্ঞানজাত বলিতে হইবে। ঐরূপে কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, সমস্তই অন্যসাপেক্ষ। নিরপেক্ষ নিজের মত কাহারও কিছু নাই।

পরের সাহায্য না পাইলে মানব ইহ জগতে একদিনও তিষ্ঠিতে পারে না। পরস্পরের সহায়তা, পরস্পরের হিতসাধনই মানবের রক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু যখন কোনও মনুষ্যেরই কিছু বুঝিবার শক্তি নাই, তখন কে কাহাকে রক্ষা করিবে? আর মানুষ অন্য মানুষকে বিশ্বাস করিবেই বা কেন? সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষাও যে মানুষ ভয়ানক জন্তু। আকৃতি দেখিয়া যেমন ব্যাঘ্র ও মেষ চিনিতে পারা যায়, ও তদনুসারে ব্যাঘ্র দেখিলে লোকে দূরে পলায়ন করে ও মেষ দেখিলে কোলে তুলিয়া লয়, সেরূপ আকার দেখিয়া ত কোন্ মনুষ্য ব্যাঘ্র-ধর্ম্মাবলম্বী, কোন্ মনুষ্য মেষধর্ম্মাবলম্বী, তাহা চেনা যায় না; একই ব্যক্তি কখনও ব্যাঘ্র, কখনও মেষ হইতেছে দেখা যায়। নীতির আড়ালে থাকিয়া আপনাকে ছাগরূপে প্রতিপন্ন করিয়া কখন্ যে মানুষ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গ্রাস করিবে, তাহা বুঝিবারই উপায় নাই। তবে মনুষ্যরক্ষার উপায় কি? ঈশ্বর সর্ব্বজীবের রক্ষার

উপায় করিয়াছেন, আর মানুষের রক্ষার কোনও উপায় করেন নাই? পশ্বাদি ইতর প্রাণীকে যে Instinct দিয়াছেন, তাহারই সাহায্যে তাহারা খাদ্যাখাদ্যাদি চিনিয়া যথোচিত পরিমাণে ভোজনাদি করিয়া রক্ষিত হয়। মনুষ্যের যখন তদনুরূপ কোন বৃত্তি দেন নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারাই ঈশ্বর মানবরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন। তাহা যদি না বল, তবে মনুষ্যরক্ষার কি উপায় আছে বলিতে চাও?

বিজ্ঞানশাস্ত্রকে রক্ষার উপায় বলিতে চাও? বিজ্ঞানশাস্ত্রপ্রভাবে মনুষ্য গুণ বিচার করিয়া খাদ্যাখাদ্য ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচন করিবে বলিতে চাও? কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র মানব পাইবে কোথায়? উহা ত অলৌকিক নহে,—ঈশ্বরদত্তও নহে। মনুষ্যের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ত বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় নাই; কত পরীক্ষা করিয়া, কত আলোচনা করিয়া, কত কাল পরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রথম পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে। সেই এক পৃষ্ঠায় কয়টী জ্ঞাতব্য বিষয় নির্ণীত হইয়াছে? এই যে এক্ষণে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছে, এখনই আমাদের জ্ঞাতব্য কয়টী বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে? কোন্ দ্রব্য ভক্ষণে মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি হয়, অদ্যাপি তাহা ঠিক হয় নাই। এখনও বিজ্ঞান ঘৃত তৈলের পার্থক্য বুঝিতে পারে নাই; এখনও বিজ্ঞান মানবত্ব ও পশুত্বের ভেদ বুঝিতে পারে নাই; সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তার কোনও সংবাদই বিজ্ঞান লইতে পারে নাই। বিজ্ঞান যে সকল বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছে, তাহার অনেক তত্ত্বই ভ্রান্তিমূলক। যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অলৌকিক জ্ঞান মানুষ লাভ না করিত, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎপত্তিই হইত না। যখন স্বতঃ মানুষ রক্ষিত হইতে পারে না, তখন কিপ্রকারে বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রণয়ন করিবে? বস্তুতঃ মানুষের কৃত বিজ্ঞানে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে না।

দেখা যাইতেছে, শত শত বার পরীক্ষা না করিয়া বিজ্ঞান কোন

তথ্য নির্ণয় করিতে পারে না। 'শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ'। কোন্ দ্রব্য ভক্ষণে মানুষের প্রাণনাশ হয়, তাহা সেই দ্রব্য ভক্ষণে শত শত ব্যক্তির প্রাণনাশ না দেখিয়া বিজ্ঞান স্থির করিতে পারে না। কোন্ দ্রব্য বা বিষয় কোন্ অবস্থায় হিতকর বা অহিতকর, ও কি পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে হিতকর বা অহিতকর হয়, কোন্ দ্রব্য বা বিষয় আপাত-হিতকর, কিন্তু পরিণামে অহিতকর, কোন্ দ্রব্য বা বিষয় আপাত-অহিতকর, কিন্তু পরিণামে হিতকর, কোন্ বিষয় নিজের হিতকর, কিন্তু সমাজের অহিতকর, ইত্যাদি দুরূহ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক মীমাংসা কোটী কোটী লোকের অনিষ্ট দেখিয়াও স্থির করা দুরূহ। এত লোকের প্রাণনাশাদি দ্বারা যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি, সেই বিজ্ঞান আমাদের রক্ষাকারী? যতকাল বিজ্ঞানপরায়ণ হইয়া রক্ষার উপায় জানিতে না পারিবে, ততকাল সমগ্র মানবরক্ষা কে করিবে?

তর্কের খাতিরে যদিও স্বীকার করা যায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল ভ্রমপূর্ণ নয়, সত্য; তাহা হইলেও এ কথা বলিতে হইবে মানবজাতির উন্নতি না হইলে কখনই বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও উন্নতি হয় না। বিজ্ঞানেরই মতে পৃথিবীতে যে কত কাল মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতি অল্প করিয়া দশ সহস্র বৎসর মানব-সৃষ্টিকাল ধরিলেও মানবসৃষ্টির অন্যূন আট হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞা-নের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে বলিতে হইবে। এত কাল মনুষ্য-রক্ষার উপায় কি ছিল? যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারাই মানবরক্ষা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তবে কেন মনুষ্য সেই আদিম কালে বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিতে পারে নাই? সভ্য ও উন্নত জনগণের রক্ষাবিধানই কি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য? অসভ্য ও অনুন্নত জনগণের রক্ষার উপায় তিনি করেন নাই? পশ্বাদি ইতর প্রাণী অপেক্ষাও প্রাচীন কালের মানবগণ এত অনাদৃত যে, পশ্বাদির ন্যায় রক্ষাবিধানও তাহাদের

করেন নাই? লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী লোক অজ্ঞতা নিবন্ধন কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহা দেখিয়া যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইবে, সেই বিজ্ঞানের পরতন্ত্র হইয়া কেবল পরবর্ত্তী লোকেরাই সুখী হইবে? পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা কেবল পরবর্ত্তী লোকের সুখ বিধানের উপকরণ মাত্র হইয়া কেবল কষ্টই পাইবে? এ বিধান ঈশ্বরকৃত বলিবার কি প্রমাণ আছে? যদি বল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রেরই নামান্তর বিজ্ঞান। কারণ প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধী কোন কথাই পূর্ব্বে কেহ সত্য মনে করিত না। সুতরাং প্রাচীনকালের বিজ্ঞান বা সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ সত্য ও ঈশ্বরপ্রণীত। বাস্তবিক সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। বিশ্ব যেমন ঈশ্বরের কৃত, ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ ঈশ্বরের কৃত। বিশ্ব যেমন সনাতন, ধর্ম্মশাস্ত্রও সেইরূপ সনাতন।

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র।

সত্য বটে, ধর্ম্মই মনুষ্যের রক্ষক এবং ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষত্বের হেতু; কিন্তু ধর্ম্ম সকল মনুষ্যের পক্ষে একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের অবস্থা যেমন ভিন্ন ভিন্নপ্রকার, ধর্ম্মও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। দেশ, কাল, অবস্থা ও পাত্র ভেদে যেমন আহার, বিহার, শিক্ষা, কার্য্য, আয়, ব্যয়, সুখ, দুঃখ, সমস্তই ভিন্ন ভিন্নপ্রকার, ধর্ম্মও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। যাহার যেমন শক্তি, যেমন প্রকৃতি, যেমন অভ্যাস, যেমন জ্ঞান, যেমন অবস্থা, তাহার পক্ষে তদনুরূপ অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম। অট্টালিকা, রাজবেশ, পলান্নভোজন রাজারই যোগ্য, দরিদ্র শ্রমজীবীর যোগ্য নহে। পর্ণকুটীর, সামান্য বসন ও পর্য্যুষিত অন্ন দরিদ্রেরই উপযোগী, ধনীর নহে। স্নান আহার শ্রমাদি সুস্থেরই উপযোগী, রোগীর নহে। বিশ্বতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া

জ্ঞানীরই যোগ্য, মূর্খের নহে। মুনিগণই নিমীলিত নেত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ দর্শন করেন, মূর্খ শ্রমজীবী নহে; মাকাল ঠাকুরই তাহাদের ব্রহ্ম। জ্ঞানীই শাস্ত্র আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারেন, মূর্খ তাহা পারে না, তাহার পক্ষে গুরুবাক্যই শাস্ত্র। এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সকলের ধর্ম্ম একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম; সুতরাং যে ধর্ম্মশাস্ত্রে সকল ব্যক্তির ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। খৃষ্ট, মহম্মদীয় প্রভৃতি কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহা নাই। ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে পণ্ডিত, মূর্খ, সুস্থ, রোগী, বলবান্, দুর্ব্বল, ধনী, নির্ধন, ভদ্র, ইতর, সুস্বভাব, কুস্বভাব, বিপন্ন অবিপন্ন, সকলেরই ধর্ম্ম একপ্রকার। কার্য্যবিশেষ সকলের পক্ষে সকল সময়েই কর্ত্তব্য ও পুণ্যজনক, এবং কার্য্যবিশেষ সকলের পক্ষে সকল সময়েই অকর্ত্তব্য ও পাপজনক। কিন্তু সকলের পক্ষে সকল সময়ে নির্দ্দিষ্ট একবিধ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে মানব ও পশুতে ভেদ থাকে না। তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, রাজশাসন, কি বিবেক, কিছুরই প্রয়োজন হইত না। সকল ব্যাঘ্র ও সকল মেষই যেমন নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির (Instinct) অধীন হইয়া চিরজীবন একইপ্রকার কার্য্য করে, সকল মানবেরই যদি সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট একইপ্রকার মানবীয় কার্য্য কর্ত্তব্য হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর পশ্বাদির ন্যায় মানবকেও Instinct বা Instinct এর ন্যায় প্রবল Consience দিতেন। সেই প্রাকৃতিক শক্তির পরতন্ত্র হইয়া সকল মানবই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপরায়ণ হইত। তাহা যখন ঈশ্বর দেন নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, সকলের পক্ষে ও সকল অবস্থায় কর্ত্তব্য একপ্রকার নহে। অতএব খৃষ্ট প্রভৃতির ধর্ম্ম সকলের উপযোগী নহে। কেবল হিন্দুধর্ম্মই সকল লোকের উপযোগী। আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সকল কালেরও ধর্ম্ম একপ্রকার নহে। কালবিশেষে ধর্ম্ম ভিন্নপ্রকার। বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনায় জানা যায়, এই পৃথিবীর অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না; যত প্রাচীন কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, ততই ভিন্নপ্রকার বোধ হইবে। সমাজের প্রথম অবস্থায় মানবের সংখ্যা অল্প থাকে, অভাবও অধিক হয় না; সুতরাং পরস্পর কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। অতি প্রাচীন কালে ভোজ্য ভোগ্য পদার্থ প্রায় একরূপই ছিল; রমণীগণও প্রায় একরূপ সুন্দরী ছিল; সহজে সকলেরই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইত; কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই স্বাধীন ছিল, কাযেই বিবাদের কারণ অল্প ছিল। সুতরাং সে সময় শাস্ত্রীয় বিধির আধিক্যের তত প্রয়োজন ছিল না। কালে যেমন মানবের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবের বৃদ্ধি হইতে থাকে, মানুষের অবস্থার বৈষম্য হইতে থাকে, ভোগ্য দ্রব্যের বৈচিত্র্য হইতে থাকে, তেমনই লোভনীয় বিষয়ের জন্য পরস্পরের বিবাদ হয়, স্বার্থসাধন জন্য অযথা চেষ্টা করিতে যাইয়া লোকে পরপীড়ন করে। তখন মানুষকে নিয়মিত করিবার জন্য নূতন নূতন বিধির প্রয়োজন হয়। অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী ধর্ম্মব্যবস্থা আবশ্যক হয়। কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর একদিনে এক আইন করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই; নিয়তই তিনি যেমন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেছেন, সেইরূপ নিয়ত আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতেছেন। খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সেরূপে উন্নতিশীল নহে; খৃষ্ট এক সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই খৃষ্টধর্ম্ম; মহম্মদ একদিনে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মহম্মদীয় ধর্ম্ম। সেই জন্, লুক্ প্রভৃতি একদিনে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই চিরকালের ধর্ম্ম। একজনের এক সময়ে কৃত নিয়ম ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীর চিরকালের অবলম্বনীয়; সুতরাং এ সকল ধর্ম্মের অবলম্বনে চলিলে সর্ব্বকালের উপযোগী ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া যায় না।

হিন্দুধর্ম্ম একজনের প্রণীত নহে, নির্দ্দিষ্ট কালেরও রচিত নহে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহার উদ্ভব এবং জনগণের অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যুগভেদে হিন্দুর ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। ভিন্ন ভিন্ন বেদ, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ, ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কালের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

> যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
>
> গীতা।

যখনই আবশ্যক হয়, যখনই ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, যখনই কাল-ভেদে অবস্থান্তর হয়, তখনই তিনি তাঁহার সংশোধন করেন—নানা অবতারে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ তাঁহারই অবতার; ঋষিবাক্য তাঁহারই বাক্য; রাজবিধি, সমাজবিধি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত সমস্তই ঈশ্বরের প্রণীত। এইরূপে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র সকল কালেরই উপযোগী।

অন্যান্য দেশে যেমন নির্দ্দিষ্টরূপ উপাসনাপ্রণালী ও কএকটী নীতিবাক্য লইয়াই ধর্ম্মশাস্ত্র, হিন্দুরও প্রথমে সেইরূপ ছিল। সেই প্রাচীন কালের ধর্ম্মশাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের ও বিবাহ্য অবিবাহ্যের কোনও নিয়ম ছিল না; পূর্ব্বকালে ঋষিগণও সুরা পান ও গোমাংস ভক্ষণ করিতেন; যে কোনও স্ত্রীকে ইচ্ছা, বিবাহ করিতে পারিতেন; সে স্ত্রী অন্যের পরিগৃহীত হইলেও কেহ তাহার বাধা জন্মাইতে পারিতেন না; এখন যে সতীত্ব মহারত্নস্বরূপ, তখন তাহার নামও ছিল না। বলপ্রয়োগে, প্রমত্তা বা নিদ্রিতা অবস্থায় শঠতাচরণে, যে কোন রূপেই স্ত্রীপুরুষের মিলন হউক, তাহাই বিবাহ নামে অভিহিত হইত, এবং

যে কোনরূপ বিবাহজাত পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র প্রভৃতি বৈধ পুত্ররূপে গণ্য হইত। শাস্ত্রকার পরাশর কুমারী সত্যবতীর গর্ভে, ও ব্যাস বিধবা অম্বিকা প্রভৃতির গর্ভে শাস্ত্রানুসারে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন। অধিক কি, সে সময়ে আপনার সতীত্ব প্রদান করিয়া অতিথির পরিচর্য্যা করার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। সে সময় মানুষের মনে সেরূপ দ্বিধা ছিল না, উহা লইয়া সমাজে কলহাদি হইত না। কাযেই ঐ সকল কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচলিত ছিল। এখনও পাশ্চাত্য সমাজে সতীত্বের লক্ষণ অন্য-রূপ, অর্থাৎ এক্ষণে ভারতে যেমন স্বামী ভিন্ন একবার মাত্র পুরুষান্তর-স্পর্শ হইলেই সে নারী সতীত্ব হারান, য়ুরোপে সেরূপ নহে। দেশের আইন মানিয়া শত শত পুরুষ গ্রহণ করিলেও তথাকার নারীর সতীত্ব যায় না, আইন-নিষিদ্ধ বিবাহে বিবাহিত পুরুষ গ্রহণেও সতীত্ব নষ্ট হয়। অনেক সময়ে অর্থ দ্বারা সতীত্বনাশের ক্ষতিপূরণ হয়, আইন অনুসারে অর্থ পাইলে অসতী আবার সতী হয়। ফলতঃ এক্ষণে অসভ্য দেশ সকলে ও পাশ্চাত্য সভ্য দেশ সকলে যে সকল রীতি নীতি প্রচলিত আছে, পূর্ব্বে ভারতে তৎসমস্ত এবং তদপেক্ষা শিথিল ভাবাপন্ন রীতি নীতি প্রচলিত ছিল, এবং সে সকল তখন ধর্ম্মবিরুদ্ধ ছিল না; ধর্ম্মশাস্ত্রে সে সকল বিষয়ে কোনও নিয়মই ছিল না।

পুরাকালে হিংস্র পশুর সংখ্যা অধিক ছিল, মনুষ্যের সংখ্যা অল্প ছিল, কাযেই মানুষ হিংস্র পশুকে পারিয়া উঠিত না; এই কারণে ও অন্যান্য কারণে মনুষ্যসংখ্যার বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল; সে জন্যও বিবাহ সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। পরে মনুষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইল। সেই জন্য ও অন্য নানা কারণে অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, জ্ঞাতি-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতির নিষেধ হইল। পূর্ব্বে খাদ্য সামগ্রীর অভাব ছিল না, প্রকৃতিদত্ত পদার্থই অপর্য্যাপ্ত ছিল, দুগ্ধও যথেষ্ট মিলিত, কৃষিকার্য্যের তাদৃশ আবশ্যকতা ছিল না; সুতরাং গোধন কি

ধন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। বিশেষতঃ অতি পূর্ব্ব কালে মাংসই মনুষ্যের প্রধান খাদ্য ছিল, কাযেই অন্যান্য পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় গোমাংসও খাদ্য ছিল। এক্ষণে প্রাণতুল্য দুগ্ধ একান্ত দুষ্প্রাপ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য গোধন একান্ত আবশ্যক; সুতরাং অতি বর্ব্বরেরও উচিত নয়, সেই হিতকারী জীবের লোপ সাধন করা। তখন মানুষ মানুষের শত্রু ছিল না, অন্ততঃ হিংস্র পশ্বাদি হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া থাকিত; তখন ভোগ্য পদার্থের সেরূপ অভাব হইত না, সকলেই অনায়াসে ঈপ্সিত প্রাপ্ত হইত; আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সকলই সুলভ ছিল, কাযেই পরের ভোগ্য অপহরণ করিবার প্রয়োজন অল্পই হইত। সুতরাং স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়নিরোধ প্রভৃতি করিবার উপযোগী কার্য্যাবলীর তত প্রয়োজন হইত না, অল্প চেষ্টাতেই লোকে সংযমী হইত। এক্ষণকার অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষণে দিন দিন মানবের অভাব বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন বিলাসদ্রব্যের বৃদ্ধি হওয়ায় এক্ষণে অন্ন, বস্ত্র ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যমাত্র পাইলেই চলে না; উৎকৃষ্ট গৃহ, সুরঞ্জিত মানসতৃপ্তিকর নানাবিধ বিলাসদ্রব্য, বিবিধপ্রকার রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য, নানাবিধ গৃহসজ্জা ও নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর দ্রব্যের প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মমর্য্যাদা, স্বাধীনতা ও সাম্যভাবেরও প্রয়োজন। কোটী কোটী লোক ইহার জন্য ব্যস্ত, ও তজ্জন্য নিয়ত মানব-মধ্যে কলহ বর্ত্তমান। প্রতিযোগিতায় পরায়ণ হইয়া পরস্পরের অনিষ্ট করিতেছে। কাযেই এখন মানব মানবের পরম শত্রু হইয়াছে। অধিক উপার্জ্জন করিবার জন্য একজন অন্যের অনিষ্ট করিতেছে, এক সমাজ আর এক সমাজকে বিধ্বস্ত করিতেছে। এই মহৎ অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য মানুষকে অধিক সংযত করা আবশ্যক। যাহাতে শক্তিশালী শক্তিহীনের প্রতি অত্যাচার না করে, যাহাতে তাঁহাদের সে প্রবৃত্তি না জন্মে, তাহার উপায় করা উচিত; এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে

মানবসমাজের শক্তি বৃদ্ধি হয়, মানব-সমাজ উন্নত হয়, তাহার উপায় বিধানও অত্যাবশ্যক। তাই হিন্দু-শাস্ত্রে আচারধর্ম্মাদির বিধি হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্নরূপ বৃত্তি অবধারিত হইয়াছে; অভ্যাস ভিন্ন সংযম হয় না বলিয়া অনুষ্ঠানপ্রণালীর এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে; দুষ্টের দমন ও অন্যায়কারীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বিধি সকলের সন্নিবেশ হইয়াছে। এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম সকল অবস্থার ও সকল কালের উপযোগী, সুতরাং সনাতন।

খৃষ্ট ও মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে ঈশ্বর সম্প্রদায়-বিশেষের, অর্থাৎ খৃষ্টান বলেন খৃষ্টের উপাসনা ভিন্ন মানবোদ্ধারের উপায়ান্তর নাই; মুসলমান বলেন অন্য সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণ কাফের, তাহাদের উদ্ধারের উপায় নাই, অধিকন্তু তাহারা ঈশ্বরের পরম শত্রু, তাহাদের প্রাণনাশই পরম ধর্ম্ম। সুতরাং উহা সীমাবদ্ধ স্থানের ও নির্দ্দিষ্ট কালমাত্রের উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্র। কেননা খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্ম অতি অল্পকাল পূর্ব্বে সীমাবদ্ধ সামান্য স্থানে প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে অনন্ত কোটী লোক জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, এবং খৃষ্টজন্মের পর যে সকল লোক অন্যান্য দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের জন্য এ ধর্ম্ম নহে। যদি পরকালের উদ্ধারের জন্য ঐ সকল ধর্ম্ম সকলেরই একান্ত প্রয়োজনীয় হইত, তাহা হইলে যাহাতে সর্ব্বকালের ও সর্ব্বদেশের লোকে ঐ ধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে, তাহার উপায় ঈশ্বর অবশ্যই করিতেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল ধর্ম্ম প্রণীত ও সকল দেশে প্রচারিত হইত। তাহা যখন ঈশ্বর করেন নাই, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, উহা সকল মানবের ধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র সেরূপ নহে; হিন্দুধর্ম্মের মতে পিতৃ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মের অবলম্বনেই মুক্তি হয়, যে যেভাবেই তাঁহার উপাসনা করুক, কালে সকলেই মুক্ত হইবে, সকলেই ব্রহ্মে

লীন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিবে। সুতরাং ইহা সার্ব্বজনীন সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র—

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
গীতা।

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আর একটী মহৎ দোষ এই যে, তৎসমস্তের বিধানের সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিগণ সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনে চলিতে পারেন না। মূর্খগণ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তদনুসারে চলিয়া থাকে। জ্ঞানপিপাসা তিরোহিত হইতে পারে, এমন কোন বিষয়ই ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া কোনপ্রকার তর্কযুক্তি খাটে না। অ[illegible]াস-পরায়ণ না হইলে কেহই তৎসমস্ত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। খৃষ্টধর্ম্মের মতে ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, অথচ ছয় হাজার বৎসর মাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং অনন্ত কাল ঈশ্বর কার্য্যশূন্য হইয়া জড়বৎ ছিলেন। ইহা যেমন অসম্ভব, তেমনই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। আধুনিক ভূবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন, পৃথিবীর এক একটি স্তর হইতেই কত কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মের মতে আত্মা অনন্তকালস্থায়ী; কিন্তু মনুষ্যজন্মের পূর্ব্বে সে আত্মার স্থিতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব্বজন্ম বা কোনরূপে আত্মার পূর্ব্ব স্থিতির কথা স্বীকার করেন না, কেবল মৃত্যুর পরে থাকার কথাই বলেন। তাহাও সে আত্মা কোন কার্য্য করেন না, কেবল বিচারদিনের অপেক্ষায় হাজতে থাকেন মাত্র। অনন্তকালস্থায়ী চৈতন্যময় আত্মা চিরকাল জড়ভাবেই অবস্থিতি করেন, কয়েক দিন জড়দেহ ধারণ করিয়া কিছু কার্য্য করেন মাত্র। বিচারেও ঈশ্বর আশ্চর্য্য ন্যায়পরতার পরিচয় দেন। এক-

দিনেই সমস্ত পাপীর বিচার হইবে, কাযেই কেহ সহস্র সহস্র বৎসর বিচারের অপেক্ষায় হাজতের কষ্ট ভোগ করিবে, কাহারও এক দিনও হাজতের কষ্ট পাইতে হইবে না। সৃষ্টির অব্যবহিত পরে যাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং বিচারদিনের পূর্ব্ব দিনে যাহার মৃত্যু হইবে, একই দিনে তাহাদের বিচার হইলে ইহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ (Almighty) অথচ তিনি সাত দিনে সাত প্রকার দ্রব্যের সৃষ্টি হউক বলিয়াই এত পরিশ্রান্ত হইলেন যে, রবিবারে বিশ্রামের আবশ্যক হইল। এবং সয়তানকে তিনি পারিয়া উঠেন না। সমস্তই তাঁহার সৃষ্ট, শয়তান তাঁহার সৃষ্ট নয়? সয়তান যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট না হয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষ হয়, তাহা হইলে আর ঈশ্বর সর্ব্বময় সৃষ্টিকর্ত্তা কি প্রকারে? Almightyই বা কি প্রকারে? যদি সয়তান তাহারই সৃষ্ট হয়, তবে সে এত শক্তি কোথায় পাইল? ঈশ্বরের ইচ্ছা মানবগণ সুখে থাকুক, সয়তান তাহা করিতে দিল না। আদম ও ইব ঈশ্বরের কথা শুনিল না, সয়তানের কথাই শুনিল; ঈশ্বর সয়তানের কিছু করিতে পারিলেন না, আদম ও ইবেরই দণ্ড দিলেন। কেবল তাহাদিগকে দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাদের গর্ভে ও ঔরসে জন্মিয়াছে বলিয়া সমগ্র মানবজাতির দণ্ড বিধান করিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের মতে ঈশ্বর ত্রিমূর্ত্তি—পুত্র ঈশ্বর (God the Son), পিতা ঈশ্বর (God the Father) ও পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তির কার্য্য কি, স্বরূপ কি, তাহা কিছু বুঝাইয়া দেন না। এই মাত্র জানা যায় যে, মহাপাপীও খৃষ্টের শরণ লইলে ঈশ্বর তাহার কিছুই করিতে পারেন না। এইরূপ শত শতপ্রকার যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরোধী কথায় খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ। জ্ঞানবানের হৃদয়ে এ সকল স্থান পাইবে কেন?

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন কথাই নাই।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সকল কথাই দর্শনশাস্ত্রকারেরা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের মতে ঈশ্বর যেমন অনাদি অনন্ত, সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি অনন্ত। আত্মা চিরকাল কোন না কোন দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করে। মায়া মানবগণকে কুপথে লইয়া যায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নহে। মায়াই বৈষম্য ও সৃষ্টির উপাদান। তিনি যেমন মায়া-সংযোগে মানবগণকে দুঃখ দেন, সেইরূপ মায়া-শূন্য করিয়া পরমানন্দময় করেন। সকলেই মায়ামুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগ করে। হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন। যিনি জন্ম দেন, তিনিই সংহার করেন, এ কথা সাধারণের হৃদগত হয় না, এবং এরূপ ঈশ্বরের নিকট কামনা সম্ভবে না, তাই ঈশ্বর ত্রিমূর্ত্তি—তাই তেত্রিশ কোটি দেবতা। এইরূপে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টিপ্রকরণ, ব্রহ্মতত্ত্ব, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ও মুক্তি-তত্ত্ব প্রভৃতি সকল কথাই যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত। সুতরাং পণ্ডিতগণেরও ইহার প্রতি আস্থা জন্মে। নিম্নাধিকারী-দের এ সকল ধারণা হয় না, সেইজন্য তাহাদের জন্য যে সকল বিজ্ঞান ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা আছে, তাহা নিম্নাধিকারীর পক্ষে অসম্ভব নয়, সুতরাং তাহা তাহাদের যুক্তিরও বিরুদ্ধ নহে। সেরূপ কথা খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও যথেষ্ট আছে; সেগুলিকে তাঁহারা Miracle বলেন। আমাদের কৃষ্ণ যেমন দ্রৌপদীর স্থালীস্থিত অন্নকণা ভক্ষণ করিয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসার পারণ করিয়াছিলেন, খৃষ্টও সেইরূপ সামান্য রুটি দ্বারা বহুতর লোককে ভোজনে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা Miracleএ বিশ্বাস করিতে পারেন, কেবল তাঁহারাই ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণ হইতে পারেন; কিন্তু উচ্চশিক্ষা নিবন্ধন যাঁহাদের এরূপ অন্ধবিশ্বাস থাকিতে পারে না, তাঁহাদের বিশ্বাস হইবে কি প্রকারে? সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল মূর্খ সম্প্রদায়ের জন্য। হিন্দু ধর্ম্ম-

শাস্ত্র পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই উপযোগী। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে পদার্থতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, নীতি-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করা যায়, এবং সকলপ্রকার বিজ্ঞান দর্শনে ও যুক্তিপ্রদানে পটুতা লাভ করা যায়। আমাদের নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কত তত্ত্বের আলোচনা করেন, ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণের জন্য তাঁহাদের ন্যায় কোন্ দেশীয় ধর্ম্মযাজকগণ বিদ্যা প্রচার করার অবসর পান?

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক এই দুইটীমাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই দুইটী সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য তাঁহারা করিতে পারেন না। তাঁহারা কেবল পরধর্ম্মের নিন্দা করিতেই পটু। আর যে হিন্দু অশেষ সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, কেহ নিরাকার-উপাসক, কেহ সাকার-উপাসক, কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, কেহ শক্তি, কেহ গণপতির উপাসক—কেহ জ্ঞানের, কেহ ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা সেই সকল সম্প্রদায়েরই সামঞ্জস্য করিয়াছেন; ভিন্ন ভিন্ন বেদ, ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ, ভিন্ন ভিন্নপ্রকার তন্ত্রমতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। চারি আশ্রম ও চারি বর্ণের ভিন্ন ভিন্নপ্রকার ধর্ম্মের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য করিয়াছেন। এবং চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতি নানা দর্শন, নানা বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিলন ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া এরূপ পাণ্ডিত্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণেরই হইতে পারে না। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ, বিজ্ঞানসম্মত, সর্ব্বকালের ও সর্ব্বশ্রেণীর উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্র, সুতরাং সনাতন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মশাস্ত্র উন্নতির বিঘ্নকারক নহে।

এক্ষণে অনেকেই বলেন হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠানপদ্ধতি বহুবিস্তৃত, তদনুসারে চলিতে হইলে মানবকে সর্ব্বকর্ম্ম ও সর্ব্বসুখ ত্যাগ করিয়া কেবল জপ তপ বারব্রত পূজা পার্ব্বণাদিই করিতে হয়, আপনার বা সমাজের উন্নতি বা সুখ বিধান করিবার অবসরই পাওয়া যায় না, সমস্ত অর্থ ও সমস্ত চেষ্টা ঐ সকল বৃথা কার্য্যে ব্যয় করিতে হয়। আমাদের বোধ হয়, এ কথা সত্য নহে। সত্য বটে হিন্দুশাস্ত্রের অনুষ্ঠানপদ্ধতি বহুবিস্তৃত, কিন্তু তৎসমস্তই যে প্রত্যেককে করিতে হইবে, তাহা নহে। বর্ণভেদে, অবস্থাভেদে, শক্তিভেদে, প্রবৃত্তি-ভেদে, জ্ঞানভেদে কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা। খৃষ্টানাদির ন্যায়, ধনী নির্ধন দুর্ব্বল বলবান্ পণ্ডিত মূর্খ, সকলকেই একপ্রকার কার্য্য করিতে হয় না; ব্রাহ্মণের যত করিতে হয়, অন্য জাতির তদপেক্ষা অল্প, শূদ্রের আরও অল্প। আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য-ভেদে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনপ্রকার। কাম্য কর্ম্ম ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা হয়, শক্তি থাকে, কাম্য কর্ম্ম কর; না থাকে, করিও না। নৈমিত্তিক কর্ম্মও নিত্য-কর্ত্তব্য নহে; যখন তাহার হেতু উপস্থিত হয়, তখনই করিতে হয়; তাহাতে লোকের নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হয় না। যাহা নিত্য কার্য্য, তাহা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিতে এত সময় লাগে না যে, তাহাতে বৈষয়িক কার্য্যের ক্ষতি হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুযায়ী বৃত্তিপরায়ণ, তাঁহাদের একটু অধিক

সময় লাগে বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সম্ভাবিত উন্নতির ব্যাঘাত হয় না। সাধারণতঃ নিত্যকর্ম্ম এত অধিক নয় যে, সে সকল সম্পন্ন করিতে হইলে সাংসারিক উন্নতিকর কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। এমন কি, এক্ষণে আফিসে যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারাও সে সমস্তের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ব্যয়ও সকলের সমান করিতে হয় না; যাঁহার যেমন শক্তি, তদনুরূপ ব্যয় করিলেই ফললাভ হয়। ধনী সহস্রমুদ্রা ব্যয়ে দুর্গোৎসব করিয়া যে ফল লাভ করেন, দরিদ্র ২৫ টাকা ব্যয় করিয়া সেই ফল লাভ করেন। অবস্থাবিশেষে কেবল ফুল জল মাত্র দিয়া পূজা করিলেও সেই ফল লাভ হয়। ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিলে মানস পূজাতেও ফল লাভ হয়। ফলতঃ যাঁহার যেমন ধন ও যেমন সময় আছে, তাহাতেই সমস্ত বৈধ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদ্ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রে আপদ্ধর্ম্ম আছে; আপৎকালে নিত্য কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হইলে, বিশেষ দোষের হয় না; এমন কি, আপৎকালে নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে অবৈধ কার্য্য করিয়া পরে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলে সকল দোষ খণ্ডিত হয়; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মানুসারে চলিলে মানবের কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যেরই ক্ষতি করিতে হয় না। এক্ষণে বাবুরা বৃথা গল্প, ক্রীড়া, নবেল পাঠ প্রভৃতি আমোদে এবং সাবান মাখিতে, কেশবিন্যাসাদি করিতে যে সময় ও যে অর্থ নষ্ট করেন, তাহার অর্দ্ধেকও হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হয় না। পাপচিন্তা করিতে, পরানিষ্ট করিবার কৌশল ভাবিতে ও পরকৃত প্রতিশোধভয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে যে সময় নষ্ট করিতে হয়, তাহার অর্দ্ধেক সময়ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্যয় করিতে হয় না। ঐ সকল পাপচিন্তায় ও অসৎ কার্য্যে কেবল যে সময় ও অর্থ নষ্ট হয়, তাহা নহে; তাহাতে মন নিয়তই ভীত ও অপ্রসন্ন থাকে, শরীর রোগগ্রস্ত হয়; এবং পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে না পারায় কার্য্যের নানা

বিশৃঙ্খলা ঘটে। কিন্তু মানবসমাজ যদি ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্টরূপ কার্য্য-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে সে সকল অসুবিধা হয় না। সকলেই দুশ্চিন্তা-শূন্য হইয়া, বিশ্বস্তভাবে পরস্পর মিলিত হইয়া সুখের ও উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ও পর হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে যে সময় নষ্ট হয়, সে সময়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উন্নতিকর কার্য্য করিলে কত উপকার হয়। সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ হইলে সময় ও অর্থের অভাবে সুখ ও উন্নতির ব্যাঘাত হয় না।

কেহ কেহ বলেন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া চলিলে কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তারই পরতন্ত্র হইতে হয়, আধিভৌতিক উন্নতির দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। সকলেই নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মানুসারে জীবিকা অর্জন করিয়া নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন, উচ্চাভিলাষ (Ambition) ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় উন্নতির চেষ্টা আদৌ হইতে পারে না। চেষ্টা না হইলে উন্নতি হইবে কি প্রকারে? সকলেই যদি আপন আপন অবস্থায় তুষ্ট রহিল, তবে উন্নতি হইবে কি প্রকারে? আমাদের অবস্থার সহিত পশ্চিমভূমির অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ের সত্যতা অনুভূত হইবে। আমাদের যে এত অবনতি ও ইয়ুরোপ আমেরিকাবাসীর যে এত উন্নতি, তাহার কারণই এই যে, আমাদের ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই; তাঁহারা নিয়তই চেষ্টা করিতেছেন। পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষণ থাকাতেই ইউরোপের এত উন্নতি হইয়াছে। যদি পাশ্চাত্যগণের ন্যায় আমাদের মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষণ হইত, তাহা হইলে কখনই আমাদের এপ্রকার দুরবস্থা হইত না। তাঁহাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়-গুণে কত কত অত্যাশ্চার্য্য যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; ঐ সকল যন্ত্রের সাহায্যে কতই সুখকর দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, কতই প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। শত লোকে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারে, যন্ত্র দ্বারা তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে সম্পন্ন

হইতেছে। এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে, ছয় মাসে প্রাপ্য সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে পাইতেছে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা ঘরে বসিয়া তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিতেছে; নূতন নূতন চাকচিক্যশালী কত বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে, বিদ্যুতের সাহায্যে অন্ধকারময় রাত্রি আলোকময় হইতেছে ও নির্ব্বাত প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে নিয়ত সুশীতল বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে; রসনার তৃপ্তিকর নানাপ্রকার নূতন নূতন রকমের সুখাদ্য ও সুপেয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়সুখকর নানা ভোগ্য নিয়তই প্রস্তুত হইতেছে। মানবগণ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় বাস, চাকচিক্যশালী সুমনোহর বেশ পরিধান, বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ, হৃদয়বিমোহন গীত বাদ্য শ্রবণ, সুখস্পর্শ সুকোমল শয্যায় শয়ন, এবং অমৃততুল্য রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ ভোজ্য ও পেয় ভোজন ও পান করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিতেছেন। মনুষ্যের যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু প্রার্থনীয়, সকলই পাইতেছে। যদি পাশ্চাত্যগণ ভারতবাসীর ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রের বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাই করিতেন, জাতিবিশেষে কেবল সেই একই প্রকার কার্য্য করিয়া তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের ভাগ্যে এ সকল সুখ হইত না; তাঁহাদের প্রসাদে নিশ্চেষ্ট ভারতবাসীও এক্ষণে নানা সুখ ভোগ করিতেছে। এখনও যদি আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ভাবে উন্নতির চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদেরও ঐরূপ উন্নতি হয়। সমগ্র মানবমণ্ডলী যদি পাশ্চাত্যগণের ন্যায় কার্য্যকুশল হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কালে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে। তখন আর ধর্ম্মশাস্ত্রের কাল্পনিক স্বর্গের আশা করিতে হইবে না; পৃথিবীতে বসিয়াই সকলে স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল কথা যদি সত্য হয়, যদি বাস্তবিকই ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এবংবিধ উন্নতির পথে বিচরণ করিলে সত্য সত্যই মানব পৃথি-

বীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারে, তাহা হইলে আমরাও বলিব এই দণ্ডেই ধর্ম্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বাস্তবিক এ সকল কি সত্য? মানবগণ কি পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক সুখী হইয়াছে? সত্য সত্যই কি এই সকল উপকরণ পাইয়া মানব দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে? কৈ কাহাকেও ত প্রকৃত সুখী দেখা যায় না। বাহ্য অবস্থা দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে কিয়ৎ পরিমাণে সুখী বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোককেই দুঃখের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখা যায়। যাঁহাদিগকে বিলাসমগ্ন দেখিয়া সুখী মনে করা যায়, তাঁহাদের দুঃখের ইয়ত্তা নাই। রোগে শোকে দুশ্চিন্তায় তাঁহাদের শরীর জরজর হইয়াছে, অপরিমিত ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত থাকিতেও অনেকে তাহা ভোগ করিতে পারেন না। ভোগ করিবার শক্তিই অনেকের নাই। বিলাসের অত্যধিক পরিচালনায় ক্ষুধা, ইন্দ্রিয়শক্তি ও স্বাস্থ্য সমস্তই তাঁহারা হারাইয়াছেন। কত কত মহাধনবান্‌কে সাগু মাত্র খাইয়া জীবন ধারণ করিতে দেখা যায়।

যদিও স্বীকার করা যায়, ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি লোক ভোগ-বিলাস-সুখে সুখী থাকেন, কিন্তু দরিদ্র সমাজের যে দুঃখের সীমা নাই! যে সকল ভোগ্য উপাদানের সৃষ্টি নিবন্ধন পৃথিবী স্বর্গ নামে অভিহিত হইতেছে, সে সকল দ্রব্য তাহাদের ভাগ্যে ত কখনই জুটে না; অধিকন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্ন পানীয়ও তাহাদের জুটে না। অথচ ঐ সকল লোভনীয় পদার্থ নিয়ত তাহাদের জ্ঞানগোচর থাকায়, সে সকল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ মাত্রায়ই রহিয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস ও সাম্যবাদে পূর্ণ বিশ্বাস থাকায়, সেই সকল প্রাপ্তির আশায় না করে এমন কষ্টই নাই, এমন অকার্য্যই নাই। তাহাদের অবস্থা দেখিলে মানবজন্মের প্রতি ঘৃণা জন্মে। ধনী সম্প্রদায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিতেছেন বটে;

কিন্তু দরিদ্র সম্প্রদায় যেরূপ অস্বাস্থ্যকর জঘন্য গৃহে বাস করে, তাহা পশুবাসেরও অযোগ্য। ধনী সম্প্রদায় স্বর্ণ-হীরকাদি-খচিত মনোহর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইতেছেন বটে; কিন্তু দরিদ্রগণ যেরূপ ছিন্ন মলিন অস্বাস্থ্যকর বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহা দেখিলে ঘৃণার উদয় হয়। ধনী সম্প্রদায় রসনাতৃপ্তিকর নানাবিধ ভোজ্য ভোজন করিতেছন বটে; কিন্তু দরিদ্র সম্প্রদায় যে সকল দ্রব্য ভোজন করে, তাহা দেখিলে বমির উদ্রেক হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রভূত শিক্ষা লাভ করিয়া নানা বিদ্যার আলোচনা ও নানা বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া এবং নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়া জনগণের ভক্তি আকর্ষণ করেন বটে; কিন্তু মূর্খ সম্প্রদায়—য়ুরোপীয় সেলর, সৈনিক ও মজুর শ্রেণীর জনগণ যেরূপ বীভৎস ও নির্ঘৃণ অমানুষ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে মানব-নামে ঘৃণা হয়। মধ্যশ্রেণীর অর্থাৎ ভদ্রশ্রেণীরও দুর্দ্দশা অল্প নহে। এই শ্রেণীর জনগণ নিম্নশ্রেণীর ন্যায় ঘৃণিত ও বীভৎস না হইলেও ইহা-দের দুঃখের পরিমাণ নিম্নশ্রেণীর জনগণ অপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প নয়। সুতরাং যদিও স্বীকার করা যায়, ধনী সম্প্রদায়ের সুখের উপ-করণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে মানবজাতির উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি হইয়াছে বলিব কি প্রকারে? কয়েক জন ধনীর সুখ হইলেই কি মানব-জাতির সুখ হইল বলিতে হইবে?

অভাব নিবারণ না হইলেই মানুষের দুঃখ হয়; কিন্তু সুখকর দ্রব্য না পাইলে মানুষের সুখই হয় না, দুঃখ পাওয়ার কারণ নাই। সুখের অপ্রাপ্তি ও দুঃখ এক কথা নহে। পলান্ন ভোজন, সুন্দর গীত শ্রবণ, শোভনীয় চিত্রাদি দর্শন, সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ ও সুখস্পর্শ দ্রব্যাদির স্পর্শনে সুখলাভ হয় বটে, কিন্তু সে সকল না পাইলে দুঃখ হয় না। যাহাদের ঐ সকলের অস্তিত্বজ্ঞান নাই, বা থাকিলেও যাহারা সে সকলের রসজ্ঞ নয়, তাহাদের ঐ সকল, অভাব বলিয়াই বোধ হয় না, সুতরাং না পাইলে দুঃখও হয় না।

যাঁহারা ঐ সকলে অভ্যস্ত, যাঁহারা মনে করেন ঐ সকলের অভাবে জীবন বৃথা, এবং যাঁহারা মনে করেন ঐ সকল পাওয়ার অধিকার আছে, চেষ্টা করিলেই পাওয়া যায়, তাঁহারাই ঐ সকলের অভাবে দুঃখ পান। ধর্ম্মশাস্ত্রে ও অদৃষ্টে বিশ্বাস এক্ষণে কাহারও নাই; প্রত্যুত অযথা সাম্যবাদে বিশ্বাস থাকায়, সকলেরই সমান হইবার অধিকার আছে, চেষ্টা করিলেই সর্ব্বপ্রকার সুখই পাওয়া যায়, ইহাই সাধারণের বিশ্বাস; কাযেই একদল যে সুখভোগ করে, অন্যে সেইরূপ সুখের উপকরণ পাইবার জন্য লালায়িত হয়। ধনী, দরিদ্র, সকলেরই ইচ্ছা উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিব, নব নব পরিচ্ছদ পরিধান করিব, সর্ব্বদা সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিব, নিত্য নিত্য নূতন প্রকারের ভোজ্য পানীয় পান ভোজন করিব, রাজ-উপাধিতে ভূষিত হইয়া সকলের উপর আধিপত্য করিব, অনুপমা প্রেমময়ী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করিব, যখন যে ইন্দ্রিয় ও মনোমোহকর দ্রব্য দর্শন করিব তাহাই ঘরে আনিব। অবস্থা বিবেচনা নাই, সকলেই এইরূপ ও অন্য নানাপ্রকার সুখভোগের অভিলাষ করে। কিন্তু কয় জনের এই সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে? মানুষ যতই চেষ্টা করুক, সকলের অবস্থা কখনও সমান হইতে পারে না; এবং যত কলই প্রস্তুত হউক না কেন, মুটে, বেহারা, মজুর, মেথর, মুদ্দফরাস প্রভৃতি ইতর লোকের কার্য্য কখন উঠিবে না; বড় জোর কৃষকের কোন পুত্র উকীল হইবে, ও উকীলের কোন পুত্র কৃষক হইবে; তাহাতে আর সাম্য হইল কৈ? তাহাতে সকলেরই ভোগসুখ হইবে কি প্রকারে? প্রত্যুত ইহাতে দুঃখ বাড়ে মাত্র। পিত্রাদির অবস্থা ভাল থাকিলে পুত্রগণ সুখভোগে অভ্যস্ত হয়; এমন অভ্যস্ত হয় যে, অন্ন পানীয়াদির অভাব হইলে যেপ্রকার দুঃখ হয়, ঐ সকল সুখকর দ্রব্যের অভাবে তাহা অপেক্ষাও অধিক দুঃখ বোধ করে। অভ্যাস হইলে বিলাসদ্রব্যের অভাবজনিত দুঃখ

প্রাকৃতিক অভাবজনিত দুঃখ হইতেও অধিক হয়। তাই অনেকে পায়ের বালিশ না পাইলে মাথার বালিশ টানিয়া পায়ে দেন। অহিফেনসেবী অহিফেন খাইতে একটু বিলম্ব হইলেই এককালে জড়ভাবাপন্ন হয়। মদ্যপায়ীরা ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মদ্যাভাবজনিত দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; যেরূপে হউক খোঁয়ারি ভাঙ্গিতেই হইবে। বিলাসদ্রব্যের অভাবে কেবল যে কষ্ট হয় তাহা নহে, পীড়াও হয়। যাঁহারা জামা মোজা পরা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহার অভাবে অল্পক্ষণ মধ্যেই শরীর অসুস্থ হয়। এইরূপে যিনি যেরূপ অভ্যাস করিয়াছেন, সেই অভ্যাসের একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই অসুস্থ হয়েন। সুতরাং যাহাদের অবস্থা মন্দ হইতেছে, তাহাদের কষ্টের সীমা নাই; বড় ঘরে জন্মিয়া যাঁহারা বাল্যকাল হইতে নানা সুখকর দ্রব্যের উপভোগ অভ্যাস করিয়াছেন, অবস্থা মন্দ হইলে তাঁহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন অবস্থার পরিবর্ত্তন এক্ষণে নিয়তই হইতেছে। অনেকে উকীল, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি হইয়া উচ্চ চা'লে চলেন, তাঁহাদের অনেকেরই সন্তান সন্ততিগণ সে পদ প্রাপ্ত হয়েন না, সেরূপ উপার্জ্জনও করিতে পারেন না; কিন্তু পিতৃসহবাসে উচ্চ চা'লে চলা অভ্যস্ত হওয়ায় অর্থাভাবে সে চা'ল রাখিতে না পারিয়া শেষে সমূহ কষ্ট পান।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যতই সুখকর দ্রব্যের আধিক্য হইতেছে, ততই লোকের অভাব বাড়িতেছে, এবং সেই সকল অভাব পূরণ না হওয়ায় দুঃখ বাড়িতেছে। যাঁহারা ঐ সকল ভোগ্যপদার্থের উপভোগ করিতে পারেন, তাঁহাদেরও প্রকৃত প্রস্তাবে সুখ হয় না। কারণ অভ্যাস হইলে, পরে সে সকল সুখের সামগ্রী আর সুখের বোধ হয় না, তখন তাহার অভাবেই কষ্ট হয়, প্রাপ্তিতে সুখ বোধ হয় না। অভ্যাস হইলে যেমন অহিফেন, মদ্য প্রভৃতির গুণ কমিয়া যায়, ও সুখাভিলাষে ক্রমেই মাত্রা বাড়াইতে হয়, সকল দ্রব্যেরই সেইরূপ।

প্রথমে যখন গ্যাসের আলো হইল, তখন নগরী দিবালোকের ন্যায় আলোকিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাড়িতালোকেরও সেরূপ দীপ্তি নাই। প্রথম যখন কলের জল হইল, তখন এত বড় সহরে একদিন এক-জনেরও মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে প্লেগেই প্রতিদিন কত লোক মরিতেছে। আর কিছুকাল পরে, পূর্ব্বে প্রদীপের আলো দ্বারা যেরূপ কার্য্য হইত, বাষ্পীয় ও তাড়িতালোকের দ্বারা তাহার অধিক কার্য্য হইবে না, অথচ তদভাবে কার্য্য চলিবেই না; আর কিছুকাল পরে পুষ্করিণ্যাদির জল কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না। অথচ কলের জলের এ উপকারিতা থাকিবে না। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে বরফে আর পিপাসা মিটে না, অদ্ভুত পিপাসা বাড়ে। কালে বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে আর শরীর জুড়াইবে না। হয় সকল বিষয়েরই মাত্রা বাড়া-ইতে হইবে, অথবা নূতন প্রকার উপায়ের উদ্ভাবন করিতে হইবে।

এই ত চিকিৎসাশাস্ত্রের এত উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমা-দের কি উপকার হইয়াছে? পূর্ব্বাপেক্ষা কি এক্ষণে রোগের ও রোগীর সংখ্যা অধিক নহে?' রোগ নাই, এমন লোকই ত এখন দেখিতে পাওয়া যায় না; অধিকাংশ লোকই শীর্ণ, দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন। নূতন নূতন ঔষধ ও নূতন নূতন চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ভয়ানক নূতন নূতন রোগের উৎপত্তি হইতেছে। নিয়তই মানব মৃত্যুভয়ে কম্পান্বিত। যে সুমধুর বসন্ত ও শরৎকাল আসিলে মানবগণের আনন্দের সীমা থাকিত না, সেই বসন্ত ও শরৎকাল এক্ষণে নিতান্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে; প্রতিবৎসরই মানবগণ এই দুই কাল আগত হইলে নিয়ত প্রাণভয়ে শশব্যস্ত থাকে। কোন কালেই মনুষ্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; মস্তকোপরি বৃহৎ পাষাণ ঝুলিয়া থাকিলে যেরূপ শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়, সেইরূপ নিজে ও প্রিয় পুত্র পরিবারগণ কখন কোন্ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইবে, এই ভয়ে

সর্ব্বদা সকলকেই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিতে হয়। সামান্য একটি পীড়া হইলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্ব্বে যে সময়ে চিকিৎসার এরূপ উন্নতি হয় নাই, সে সময়ে চিকিৎসার ব্যয় ছিল না বলিলেই হয়; এক্ষণে চিকিৎসার ব্যয়ে লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, অথচ তাহাতে কাহারও তৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ সুচিকিৎসা করা হইয়াছে, এ বিশ্বাস কাহারও জন্মে না। এক্ষণে চিকিৎসাপ্রণালী শত শত, চিকিৎসকও সহস্র সহস্র। কেহ মনে করেন য়্যালোপ্যাথি ভাল, কেহ বলেন হোমিওপ্যাথি ভাল; কাহারও মতে কবিরাজি ও কাহারও মতে হাকিমি চিকিৎসা উৎকৃষ্ট; কেহ বলেন অমুক ডাক্তার ভাল, কাহারও মতে তিনি ভাল নহেন, আর এক জন ভাল; এইরূপ সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মত। যাঁহাদের পরামর্শে কার্য্য করিতে হইবে, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মত, নিজেরও মতের স্থিরতা নাই; সুতরাং যোল টাকা ভিজিট দিয়া চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইলেও সুচিকিৎসা হইয়াছে ভাবিয়া দরিদ্রও শান্তিলাভ করিতে পারে না। অনেক রোগী চিকিৎসা-বিভ্রাটেই মারা যায়। অনেকে প্রতিদিনই চিকিৎসক ও চিকিৎসাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন, কাযেই প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। আবার কেবল চিকিৎসা করিলে হইবে না, স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করিতে হইবে। কাহারও মতে মধুপুর, কাহারও মতে দার্জ্জিলিং, কাহারও মতে সিমলায় গিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপে পরিবারস্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য প্রভূত ধনবান্‌ও সর্ব্বস্বান্ত হয়েন। মধ্য শ্রেণীর অনেকেই এই বিপদে এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। অনেকের এমন অবস্থা ঘটে যে, একটি পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য নিঃস্ব হইয়া পরিশেষে অন্যান্য পুত্রের পীড়া হইলে সামান্য চিকিৎসাও করাইতে পারেন না। যখন চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন উন্নতিতেও আমাদের দুঃখ বাড়িল ভিন্ন কমিল না, তখন সংঘর্ষণজাত উন্নতিতে লাভ কি?

রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিপ্রভাবে কৃত্রিম মণিমুক্তা, কৃত্রিম স্বর্ণরৌপ্য ও নানাপ্রকার মনোবিমোহন ক্রীড়নক, চিত্র ও বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ দূরে থাকুক, বরং আমরা সর্ব্বস্বান্তই হইতেছি। সামান্য গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। পূর্ব্বে প্রায় সকলেই অবস্থানুসারে স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত অলঙ্কার, পিত্তল-কাংস্যাদি-নির্ম্মিত বাসন ব্যবহার করিতেন; দরিদ্রগণও কষ্ট করিয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করিতেন। আপৎকালে সেগুলি বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া আপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেন। এক্ষণে কৃত্রিম দ্রব্যের মোহিনী শক্তিতে ভুলিয়া যে সকল কৃত্রিম চাকৃচিক্যশালী দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহার মূল্য পরে এক কপর্দ্দকও থাকে না। সুতরাং আপৎকালে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়েন। এই যে ফটোগ্রাফ-যন্ত্র দ্বারা সুন্দর চিত্র উঠিতেছে ও ফনোগ্রাফ-যন্ত্র দ্বারা স্বর রক্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের লাভ কি? মৃত মনুষ্যের আকৃতি ও স্বর রাখিলে জগতে কাহার কি উপকার হয়? আমোদ চরিতার্থ করা ভিন্ন কি ফল লাভ হয়? প্রত্যুত ঐ সকল দ্রব্য সংরক্ষণের স্থান দিতে গিয়া অনেক সময় প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উপকরণ রাখিবার স্থান সংকুলান হয় না। এই দেখ না কেন, যাঁহারা মৃতদেহ ভূমিসাৎ করেন, তাঁহারা মৃত ব্যক্তির স্মরণচিহ্ন জন্য বহু ব্যয়ে তদুপরি মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করান; কিন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা কি ফল প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাহাতে জগতেরই বা কি হিত সাধিত হয়? যে সকল ভূমির উপর ঐ সকল স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহাতে যদি শস্য বপন করা হইত, তাহা হইলে কি তদ্দ্বারা বহু লোকের প্রাণরক্ষা হইত না? চিরকালই যদি সকল জাতি ঐরূপে স্মৃতিরক্ষা করিতে থাকে, তাহা হইলে কালে মৃত মনুষ্যই যে সমস্ত ভূমি অধিকার করিবে, জীবিতের অন্নসংস্থান হইবে কি প্রকারে?

ফলতঃ যে সকল শিল্প ও যন্ত্রাদির এক্ষণে উন্নতি হইতেছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমস্তেরই পরিণাম-ফল ঐরূপ।

সত্য বটে, যন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, ময়দা, তৈল, সুরকী প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে; ষ্টীমার, রেলওয়ে প্রভৃতি দ্বারা যাতয়াতের ও বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইতেছে; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁ প্রভৃতির সাহায্যে সংবাদ আদান প্রদান প্রভৃতির অনেক সুবিধা হইতেছে; এবং মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সহজে সর্ব্বত্র জ্ঞানধর্ম্ম বিস্তৃত হইতেছে; কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় এ সকলেরও ইষ্টকারিতা অপেক্ষা অনিষ্টকারিতা অল্প নহে। এই সকলের দ্বারা কত কত লোক যে বৃত্তিহীন হইয়া হাহাকার করিতেছে, কত কত গ্রাম নগর ও দেশ যে প্রবলের অত্যাচারে ও বাণিজ্যকারীর শোষণে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, ও কত লোক যে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ হিংসা করিয়া মনুষ্যত্ব হারাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যন্ত্রাদির বহুল প্রচলনে মানবগণ যে কেবল বৃত্তিহীন হইতেছে, তাহা নহে; যে স্বাধীনতা আধুনিক সমাজের মতে মানবের প্রধান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য, সেই স্বাধীনতাধন মানবগণ এককালে হারাইতেছে। পূর্ব্বে অধিকাংশ লোকেই স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, দাসের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। কেননা তখন তন্তুবায় স্বাধীন ভাবে বস্ত্র বয়ন করিত, কর্ম্মকার লৌহদ্রব্য প্রস্তুত করিত, তৈলকার তৈল প্রস্তুত করিত, নাবিকগণ নৌকা বাহন করিত, সকলেই স্বাধীন ভাবে স্বস্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; এক্ষণে যন্ত্রের উন্নতি হওয়ায় প্রায় সকল কার্য্যই যন্ত্রসাহায্যে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং স্ববৃত্তি অবলম্বনে কাহারই অন্নসংস্থান হয় না, সকলেই আপন আপন স্বাধীন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। অল্প টাকায় যন্ত্রের কার্য্য চালাইতে পারা যায় না, এমন কি, বড় বড় ধনীরাও একাকী কল চালাইয়া ফললাভ

করিতে পারেন না; সেই জন্য দশজনে মিলিত হইয়া কল কারখানা করেন। আজি কালি সভ্য সমাজে মিলিত কোম্পানীই অধিকাংশ ব্যবসা করিয়া থাকেন। কৃষি বাণিজ্য শিল্প সকল প্রকার কার্য্যই তাঁহারা করিয়া থাকেন; সুতরাং কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। সেইজন্য যতই যন্ত্রের উন্নতি হইতেছে, যতই কোম্পানীর সৃষ্টি হইতেছে, ততই স্বাধীন ব্যবসায়ের লোপ হইতেছে, দাসত্ব অবলম্বনেই এক্ষণে প্রায় সকলেই জীবিকানির্ব্বাহ করেন। মজুরের সংখ্যাই অধিক; কেহ লিখিয়া পড়িয়া মজুরি করেন, কেহ বা মাথায় মোট করিয়া মজুরি করেন, এই মাত্র প্রভেদ। চাকুরী ভিন্ন আর লোকের গত্যন্তর নাই। ক্রমে কৃষকগণকেও সামান্য বেতন মাত্র গ্রহণ করিয়া কোম্পানীর অধীনে মজুরী করিতে হইবে। এখনও অধিকাংশ লোকে বড় বড় কল কারখানায় মজুরি করিয়া ও কেরাণীগিরি করিয়া কোন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, সেই জন্য এখনও লোকের এককালীন অন্নাভাব ঘটে নাই; কিন্তু কালে যতই অধিক শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের উদ্ভব হইবে, ততই তাহাতে মনুষ্যের সাহায্য অল্প আবশ্যক হইবে; সুতরাং তখন আর লোকের মজুরীও মিলিবে না, তখন অনশনে লোকে প্রাণ হারাইবে। যে উন্নতি-প্রভাবে মানবগণের স্বাধীনতা এককালে লোপ পাইতে বসিয়াছে, এবং যে উন্নতি-প্রভাবে কালে অধিকাংশ মানব অন্নমাত্রেরও কাঙ্গাল হইবে, তাহার নাম যদি উন্নতি ও সুখসৌভাগ্য হয়, তবে আর অবনতি ও দুঃখ কাহাকে বলে? এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত সকলপ্রকার বাহ্য উন্নতির পরিণামই অতি বিষম। অধিক কি, যে মুদ্রাযন্ত্র অশেষ কল্যাণের হেতু বলিয়া সর্ব্বসাধারণেরই বিশ্বাস, তাহাই নানা অনর্থের মূল হইয়াছে। উহার সাহায্যে যে পরিমাণ জ্ঞান বিস্তার হইতেছে, তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে অজ্ঞানের

বিস্তার হইতেছে। ভাল গ্রন্থ, ভাল সংবাদপত্র অতি অল্পই প্রণীত হয়, তাহার পাঠকও নিতান্ত অল্প; কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক ও অনিষ্ট-কর গ্রন্থেই দেশ ভরিয়া যাইতেছে। এবং প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপন ও পরের কুৎসাদিতে পরিপূর্ণ সংবাদপত্রের সংখ্যাই অধিক। অনেক লেখকের দোষে সমগ্র অধিবাসী রাজার কোপনয়নে পড়িতেছেন। কুশিক্ষার ফলে রমণীগণও ধর্ম্মহীন হইতেছে।

এই ত গেল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কথা। অনিষ্টকর পদার্থের দিন দিন যে কত আবিষ্কার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; মাদক দ্রব্য যে কত প্রকারের হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না; মনুষ্যের প্রাণবধেরই জন্য যে কতপ্রকার বিষ ও অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কোন বিষ জিহ্বাস্পর্শ মাত্রেই মৃত্যু হয়, কোন বিষ ঘ্রাণমাত্রে মৃত্যু হয়; আবার এমন কত প্রকার বিষ আছে যে, সে সকলকে বিষ বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না, হিতকর পদা-র্থের ন্যায় কিছু দিন সেবন করিতে করিতে মানব এককালে অক-র্ম্মণ্য হইয়া যায়, বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন কত কত আগ্নেয় অস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহার সাহায্যে চকিতের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হইতেছে, বড় বড় অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইতেছে, সহস্র সহস্র লোকপূর্ণ বড় বড় জাহাজ মহাসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হইতেছে, বড় বড় নগর নিমেষ মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে; কত কালের মহা অমূল্য কীর্ত্তিমন্দির, কত কালের সংগৃহীত জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থরাশি, অতুল ধনরাশি, অপর্য্যাপ্ত কৃষি ও শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইতেছে। অধিক কি, ফটোগ্রাফ, টেলিফোঁ, টেলিগ্রাফ, বেলুন প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র কেবল কল্যাণকর বলিয়াই সকলের বিশ্বাস, তাহারই সাহায্যে পরস্পর পরস্পরের গুহ্য ব্যাপার অবগত হইয়া পররাষ্ট্রের সংহার সাধন করিতেছে। কোন সাম্রাজ্যই এক্ষণে

চিন্তাশূন্য নহে। নিয়ত পরস্পর সকলেই সকলের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে, যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত ও তাহার উন্নতি কল্পে সকলেই দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত। কোনও স্থানেই শান্তি নাই। নিয়তই মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ চলিতেছে। বড় বড় উন্নত জাতি এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা শত বৎসরের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং মানবের নিয়ত চেষ্টা দ্বারা এক্ষণে যে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মানবের সুখবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতেছে, এ কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। প্রত্যুত এক্ষণে যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে মানবজাতির দুঃখেরই বৃদ্ধি হইতেছে বলিতে হইবে। শরীরের স্বাস্থ্য নাই, মনের শান্তি নাই, দিবানিশি নানা দুঃখে, নানা চিন্তায় জর্জ্জরিত, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণের বশবর্ত্তী হইয়া মানবগণ পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হয় এবং হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করে, সে সকলের কিছুই নাই; মনের তৃপ্তি নাই, আশার শেষ নাই, অনেকের দুঃখ নিবারণ করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতাই নাই, অথচ সকলেই নিয়ত সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। তিলার্দ্ধ কাহারও বিরাম নাই। সকলেরই মুখের বাণী সাম্য ও স্বাধীনতা; কিন্তু কার্য্যে বৈষম্যের চূড়ান্ত ও পরাধীনতার শেষ। কেহ শত কোটী স্বর্ণ মুদ্রার অধিপতি, কাহারও শাক অন্ন মাত্রও জুটে না, কেহ নানা-বিদ্যাবিশারদ, কেহ এমন নিরেট মূর্খ যে, মানবনামেরই যোগ্য নয়। ইংলণ্ডের ধনী সম্প্রদায়ের সহিত দরিদ্র সম্প্রদায়ের তুলনা করিলে, উভয় শ্রেণীকে একই মানব নাম দেওয়া কি সঙ্গত হয়? স্বাধীন বৃত্তি এক্ষণে নাই বলিলেই হয়, অধীনতা অর্থাৎ চাকরী এক্ষণে সাধারণ বৃত্তি হইয়াছে, অথচ প্রভুরা অধীন কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গের প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করেন যে, পশুর প্রতিও সেরূপ করেন না। কুকুরের আদরও তাহাদের অপেক্ষা অধিক। তাঁহাদের অশ্বগণও ভৃত্যগণ অপেক্ষা অনেক

সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে। ভৃত্যগণ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রভু মুখে তাহাদিগকে ধন্যবাদ করেন, কিন্তু সামান্য ত্রুটী বিবেচিত হইলেই তাহাদের প্রতি যে অসদাচরণ করেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে উন্নতিতে লক্ষ লক্ষ লোক অত্যাচারিত, জর্জ্জরিত ও নিতান্ত দুঃখমগ্ন হয় ও দুচারিজন বিলাস-চাকচিক্যশালী হয়, তাহাকে মানবীয় উন্নতি বলিতে হইবে? না, শত শত সমাজের ধ্বংস সাধন করিয়া সমাজবিশেষের কিছু উন্নতি হইলে, তাহাতে মানবের উন্নতি হইল বলিতে হইবে? উন্নতি বলিলে কিয়দংশ মানবের উন্নতি বুঝায়? না, সমগ্র মানবজাতির উন্নতি বুঝায়?

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ হইয়া কার্য্য করিলে কি পরের কায করা যায়? নিজের উন্নতিই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য নহে? অন্য অপেক্ষা আমি বড় হইব, ইহাই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য নহে? এই যে পশ্চিম-ভূমে দিন দিন কলকারখানার উন্নতি হইতেছে, ভিন্ন দেশের অর্থ আকর্ষণই কি তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? আমরা যে ঐ সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে কি আমাদের তন্তুবায় শ্রেণীর সমূহ কষ্ট হইতেছে না? দেশের কি যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে না? প্রভূত ধন দেশ-বহির্গত হইয়া যাওয়ায় দেশ কি এককালে দরিদ্র হইতেছে না? নিজের উন্নতি করিতে হইলে যদি এইরূপে পরের অনিষ্ট করিতে হইল, তবে তাহাতে মানবজাতির উন্নতি হইবে কি প্রকারে? যদি বল, আমরা যদি তাঁহাদের মত চেষ্টা করিয়া দেশে ঐ সকল যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে আমাদের দেশের ধন দেশে থাকিবে, আরও কত ধন বিদেশ হইতে আনিতে পারিব। কিন্তু এ কথা কি সত্য? যদি সকল দেশেই ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্রবলে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তবে অন্য দেশের লোকে তাহা লইবে কেন? এত যন্ত্র চলিবেই বা কি প্রকারে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য ত কেহ

লইবে না। তাহাতে হইবে এই, সকল দেশেই শিল্পব্যবসায়ী ও মজুর-শ্রেণীর লোকের কষ্টের সীমা থাকিবে না। এখনই বিলাতে দুই এক দিন কল বন্ধ থাকিলে মজুরদলের যে দুরবস্থা হয়, তাহা কাহার জানা নাই? এখনই কতকগুলি দেশে যন্ত্রাদির বাহুল্য হওয়ায় তত্তৎ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকসমূহের সমূহ কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। তখন যে সকল দেশেরই অবস্থা ভয়ানক হইবে, বৃত্তি অভাবে যে বার আনা লোক প্রাণ হারাইবে, যথেষ্ট খাদ্য মজুত থাকিতেও যে লোকে অন্ন পাইবে না, অথবা ভিক্ষুকেই পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে। ভিক্ষাই বা দিবে কে? ভিক্ষা দিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া এখনই ভিক্ষা দেওয়া অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। কাযেই তখন 'অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে নাই,' এই নীতি অবলম্বন করিয়া বৃত্তিহীন-গণের উচ্ছেদ সাধনের উপায়ই করিতে হইবে। এক্ষণে যেমন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বধ সাধন করিয়া মানবগণ নিরাপদ্ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য অশ্ব প্রভৃতিকে গুলি করিয়া মারিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, তখন সেইরূপে বৃত্তিহীন মনুষ্যগণের নিপাত করিয়া নিরাপদ্ হইতে হইবে। যদি এরূপ উন্নতিকে উন্নতি বলিতে হয় ও সকলেরই ঐ পথের পথিক হওয়া কর্ত্তব্য বলিতে হয়; তাহা হইলে দস্যুতাই মানবের প্রধান অবলম্বন বলিতে হয়; কারণ যাহারা নিরীহ দুর্ব্বল সাধু, দস্যুগণ যেমন তাহাদেরই ধন লুণ্ঠন করিয়া ধনসম্পন্ন হয়, অন্য দস্যুর ধন অপহরণ করিতে পারে না, সেইরূপ যে দেশে যন্ত্রাদির সৃষ্টি হয় নাই, সেই সকল দেশের অর্থ যন্ত্রশালীরা অপহরণ করেন। সেই অপ-হরণ নিবারণ জন্য যন্ত্রশালী হওয়াও যেরূপ, দস্যুর অনুকরণে দস্যু হওয়াও সেইরূপ। দস্যু হওয়া যদি মানবের উন্নতি হয়, তাহা হইলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাজাত উন্নতিকে মানবীয় উন্নতি বলিতে হইবে। এই জন্যই কি মানব সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ? ব্যাঘ্রাদির ন্যায়, নিরীহ

জীবের প্রাণনাশের শক্তি লাভ করাই কি মানবের মানবত্ব? তাহা যদি হয়, তবে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য এই দুইটী শব্দেরই বা সৃষ্টি কেন? ফলতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা কামনারই পরিবর্দ্ধক। কামনা মানুষকে বিনাশের পথে লইয়া যায়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গীতা।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া লোকে না করিতেছে কি? এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে কত প্রতারণা বাড়িয়াছে, তাহা মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। কত কৃত্রিম উপায়ে অনিষ্টকর দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সস্তা করা হইতেছে, অদ্ভুত কৌশলে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণকে প্রতারিত করা হইতেছে, এবং নানাপ্রকার কুদ্রব্য-মিশ্রিত করিয়া খাদ্যদ্রব্য অখাদ্য করা হইতেছে। ঐ সকল ভক্ষণ করিয়া জনগণ যে এককালে স্বাস্থ্য হারাইয়া অকর্ম্মণ্য হইতেছে, এ কথা কেহ ভাবেন না। আজ কাল বাজারের দ্রব্য খাইলেই অসুখ হয়। আমি কৃত্রিমতা করিয়া যেরূপ পরের অনিষ্ট করিতেছি, পরে যে সেইরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিবারও অবসর কাহারও নাই। তুমি ঘৃতে অখাদ্য চর্ব্বি মিশাইয়া আমাকে দিলে, আমি সরিষার তৈলে পোস্তর তৈল মিশাইয়া তোমাকে দিলাম; আর একজন ময়দায় পাথরের গুঁড়া মিশাইয়া দিল, একজন তূলায় পাট মিশাইয়া কাপড় করিল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইতেছে ও পরস্পরের অনিষ্ট করিতেছে। চা-করগণ আপনাদের উন্নতির জন্য কুলি মজুরদিগকে কি না যন্ত্রণা দিতেছেন! অধিক পরিমাণে চা বিক্রয়ের উপায় করিবার জন্য তাঁহারা যে

সকল কৌশল অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে কি আমাদের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে না? তাঁহারা চায়ের নানা গুণ বর্ণনা করিতেছেন; সহজে সকলে যাহাতে তাহা পায়, তাহার নানা উপায় করিতেছেন; এমন কি, গরম গরম চা ঘরে ঘরে পাঠাইয়া দিতেছেন। দেশ শুদ্ধ লোকে চা ধরিয়াছে। স্বীকার করিলাম, চা পানে উপকার আছে; কিন্তু অপকার কি কিছুই নাই? সে অপকারের কথা তাঁহারা কাহাকেও বলেন কি? আর চা পান না করিলে যে, বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? দরিদ্র ভারতবাসীর এইরূপ একটা রোগ জন্মাইয়া দিলে যে, ঘোর অনিষ্ট হইবে, তাহা জানিয়াও তাঁহারা কেবল আপনাদের উন্নতির জন্য সে কথা একবারও ভাবেন না। যাঁহারা বার্ডসাই প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা কি জানেন না যে, ছেলে বুড়া ধনী দরিদ্র সকলেই এই বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে? জানিয়াও কেন তাঁহারা ইহার প্রচারবৃদ্ধির চেষ্টা করেন? পরের যতই অনিষ্ট হউক, আমার উন্নতি হইলেই হইল, এই বিশ্বাসই কি তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়-বদ্ধ নয়? সুসভ্য ইংরাজরাজ আমাদের রক্ষাবিধান জন্য নানা চেষ্টা করিতেছেন, সকলেরই প্রতি সমান দৃষ্টি দিতেছেন, বল-প্রয়োগে কাহারও অনিষ্ট করেন না; কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যে এই সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না। প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ বজায় রাখা কর্ত্তব্য, এই বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ থাকায় আমাদর দেশ হইতে নিয়তই যে নানা দেশের লোকে তণ্ডুল গোধূমাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেছে ও তাহার পরিবর্ত্তে নানা দেশ হইতে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য রাশি রাশি বিলাসদ্রব্য দিয়া যাই-তেছে, এবং তাহারই ফলে যে ভারতবাসীর দিন দিন হীনাবস্থা হইতেছে ও দুর্ভিক্ষ মহামারী নিয়ত লাগিয়া আছে, এ কথাও তাঁহারা ভাবেন না।

এইরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে উন্নতি হয়, সে উন্নতি অন্তঃসারশূন্য বাহ্যচাকচিক্যময়। যেমন 'দূরতঃ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে'। বড় বড় সহর, বড় বড় বাড়ি, বড় বড় জাহাজ, নানা কল কারখানা, বড় বড় বাজার, রাশি রাশি ভোজ্যদ্রব্য বস্ত্র অলঙ্কারের একত্র সন্নিবেশ, লক্ষ লক্ষ লোকের একত্র সম্মিলন, রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতিতে নিয়ত লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম, সভা, সমিতি, স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, মিউনিসিপালিটি, ইউনিভার্শিটি, সঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিত বেশ্যা, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, থিয়েটার, সার্কাস, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, গরম গরম চা, সুশীতল কাফি প্রভৃতি লম্বশাটপটাবৃত সমাজ দেখিয়া মনে হয়, না জানি সভ্যজাতি কত সুখে আছে; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, সমস্তই ফক্কিকার, সুখের, মানবত্বের কিছুমাত্রই নাই; অযথা কামনার জ্বালায়, হিংসা দ্বেষাদির তীব্র বিষে নিয়তই জর্জ্জরিত। ইহা 'দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া ও পস্তায়া, যো না খায়া ও বি পস্তায়া'। অতএব ইহার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতার সুখ ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নয়। যখন বিষয়ে সুখ নয়, মনের সুখই সুখ, তখন বিষয়ের লোভে সুখ ত্যাগ করা উচিত নয়। তাহা হইলে বলিতে হইবে 'কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া'।

ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণতাই প্রকৃত উন্নতির উপায়।

তবে কি মানব শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি করিবে না? আমাদের বোধ হয় এরূপ প্রশ্নের কোন কারণই নাই। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া কার্য্য করিলে যে শিল্প বিজ্ঞানাদির উন্নতি হয় না, এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা না করিলে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে যে উন্নতি হইতে পারে না; তাহার অর্থ কি? তবে প্রাচীন ভারতে এত উন্নতি হইল কি প্রকারে? ধর্ম্ম-

মাত্রজীবী ব্রাহ্মণের এত উন্নতি হইল কি প্রকারে? শারীরিক-বলহীন ধনহীন ভিক্ষামাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ এত কাল সমাজের শীর্ষস্থানে রহিলেন কি প্রকারে? প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণও নিয়ত তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতে ব্যস্ত কেন? কোন্ দেশে ব্রাহ্মণের ন্যায় বলবীর্য্যধন-হীন সম্প্রদায় এরূপ উন্নতির জন্য সম্মান লাভ করিয়াছে? কোন্ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ ভিক্ষামাত্রোপজীবী সম্প্রদায়ের পদানত হইয়াছেন? যদি ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে উন্নতি না হয়, যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিলে উন্নতি না হয়, তবে কোন্ বলে নির্বীর্য্য নির্ধন ব্রাহ্মণের এত শক্তি হইল? যে বেদাদি বিদ্যাপ্রভাবকে ব্রাহ্মণের উচ্চতার কারণ মনে করেন, সেই বেদাদি বিদ্যাসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের নিকট'ও ত এ সম্মান পাইতেন। যদি নিয়ত স্বার্থরক্ষার চেষ্টা না করিলে উন্নতি না হয়, তবে স্বার্থশূন্য ব্রাহ্মণের এত উন্নতি কেন হইল? বেদ, বেদান্ত, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, ইতিহাস, কৃষি, বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিদ্যা, কোন্ বিষয়ের চরম উন্নতি তাঁহারা না করিয়াছেন? গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানেরই বা কম উন্নতি কি করিয়াছেন? কেবল যে ব্রাহ্মণের উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নহে; সর্ব্ববর্ণেরই সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন সমরকুশল ক্ষিপ্রহস্ত যোধবীর পৃথিবীর আর কোন্ দেশে ছিল? বৈশ্যের ন্যায় কৃষি-বাণিজ্যাদি-নিপুণ ধনরত্নাদি-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন জাতিই বা কোন্ দেশে ছিল? শূদ্রাদির ন্যায় শিল্প স্থাপত্যাদি বিষয়ে কার্য্যকুশলই বা কোন্ দেশে ছিল? ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরী শাল প্রভৃতির ন্যায় সূক্ষ্ম শিল্প কোন্ দেশে ছিল? ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, মূর্ত্তিগঠন, চিত্রাঙ্কন, স্বর্ণমুক্তাহীরকাদি-খচিত বস্ত্র বয়ন, স্বর্ণালঙ্কার, বেশভূষা, গন্ধদ্রব্য, অর্ণবপোতাদি প্রস্তুত করণ, কোন্ বিষয়ে তাঁহারা উন্নত ছিলেন না? অতএব প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বনে সন্তুষ্ট

চিত্তে কার্য্য করিলে যে উন্নতি হয় না, এ কথা একান্ত অশ্রদ্ধেয়। প্রত্যুত ঐরূপে যে উন্নতি হয়, তাহাই প্রকৃত উন্নতি; তদ্দ্বারা সর্ব্ব-সাধারণের হিত সাধিত হয়, এবং সেই উন্নতি স্থায়ী হয়।

ধর্ম্মপথে থাকিলে দুশ্চিন্তা অনেক অল্প থাকে, এবং হৃদয়ের বল যথেষ্ট থাকে। নিয়ত দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বৃথা কাল হরণ ও চেষ্টার অপব্যয় করিতে হয় না। কায়মনোবাক্যে বাল্যকাল হইতে নিয়ত কার্য্যরত থাকে। সে কার্য্যে আনন্দ জন্মে, কাযেই কায়মনো-বাক্যে তাহার উন্নতি করিতে থাকে। সেরূপ উন্নতিতে অন্যের অনিষ্ট হয় না, সর্ব্বসাধারণেরই উন্নতি হয়; সুতরাং কেহই তাহাতে বাধা দেয় না, প্রত্যুত পরস্পর পরস্পেরর সহায়তা করে। এইরূপে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে থাকে, তাহাতে প্রয়ো-জনীয় সমস্ত দ্রব্যেরই উন্নতি হইতে থাকে, প্রয়োজনীয় সকল অভাবই নিরাকৃত হয়, এবং বিমল আনন্দ লাভ করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থক হয়। সকল মনুষ্যই অবস্থার অনুরূপ অভাব নিরাকরণ করিয়া তৃপ্ত হয়। যদি এই ভাবে সর্ব্বদেশেরই উন্নতি হইত, তাহা হইলে আজি সমগ্র পৃথিবীই কি সুখের স্থান হইত!

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

গীতা।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনীয় না হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই থাকে না।

বাস্তবিক যদি পাশ্চাত্যগণের ন্যায় উন্নতি হয় না বলিয়া হিন্দুর আধ্যা-ত্মিক পথ অপকৃষ্ট ও পাশ্চাত্য আধিভৌতিক পথ উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে স্বার্থপরতাই শ্রেষ্ঠ, পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার সুখ সাধনই প্রধান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কেবল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র

নয়, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই মিথ্যা। কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র সকল মিথ্যা নয়, নীতিশাস্ত্রও মিথ্যা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই মিথ্যা। কেননা সকল শাস্ত্রেরই মতে— সকল নীতিশাস্ত্রেরই মতে স্বার্থপরতা নিন্দনীয়। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের ও নীতিশাস্ত্রের মতে সদা সত্য কথা কহিতে হইবে, পরহিংসা পরদ্রব্যহরণ করিতে নাই, পরের হিতসাধন করা ও স্বদেশের হিতের জন্য প্রাণ-পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নীতির অনুসরণ করিলেও পরের অনিষ্ট করিয়া উন্নতি করা যায় না। সাম্য, স্বাধীনতা, সামাজিক ও জাগতিক উন্নতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে আপনার সুখের দিকে তাকাইতে পারা যায়।

আশ্চর্য্য এই যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পথের নিন্দা করেন, তাঁহাদের অনেকেই বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যাদির যথেষ্ট প্রশংসা করেন। খৃষ্ট চৈতন্যাদির নিদেশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে কি পাশ্চাত্যগণের ন্যায় উন্নতি হয়? তাহা হইলে তাঁহারা কি শত শত দেশের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আপনাদের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেন? তাহা হইলে যে হিন্দুর ন্যায় আপন অবস্থাতেই তুষ্ট থাকিয়া সমস্ত জগতের হিতসাধন-কার্য্যে ব্যস্ত হইতে হইত, ব্রাহ্মণের ন্যায় নিস্পৃহ হইয়া কেবল পরেরই কার্য্য করিতে হইত। বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, সকলেই যে ব্রাহ্মণের মত সংসারবিরাগী, স্বার্থত্যাগী, পরহিতৈকব্রতী ছিলেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যে তাঁহারা নিস্পৃহ ছিলেন; ব্রাহ্মণেরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যাদি সন্ন্যাসী ছিলেন। বুদ্ধ রাজপদ ত্যাগ করিয়া, চৈতন্য মাতা স্ত্রী ত্যাগ করিয়া কেবল যে পরেরই কার্য্য করিয়া সুখ বোধ করিতেন। যদি হিন্দু-পথ নিন্দনীয়, তবে বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্যের এত প্রশংসা কেন? তাঁহারা আদর্শপুরুষ কেন? যদি পাশ্চাত্য পথ শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ত সেকন্দর, বোনাপার্ট, আলাউদ্দীন, বাবর, দুর্য্যোধন, রঘু ডাকাত প্রভৃতিকেই আদর্শপুরুষ বলিতে হইবে। অতএব যদি খৃষ্ট

চৈতন্যাদির প্রশংসা কর, তবে কেন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের গুণ কীর্ত্তন করিবে না? মুখে নীতি নীতি শব্দ উচ্চারণ করিবে, খৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্যকে আদর্শপুরুষ বলিবে, আর কার্য্যে করিবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! ফলতঃ যদি হিন্দুর আধ্যাত্মিক পথ ও পরার্থপরতা নিন্দনীয় হয়, এবং পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পথ ও ভোগলালসা চরিতার্থ করাই প্রশংসনীয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে আত্মসুখসাধন চেষ্টা ভিন্ন মানবের আর কোনও উদ্দেশ্যই নাই। তাহা হইলে নাস্তিকেরা ও বিধর্ম্মীরা যেমন বলিয়া থাকেন ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসাধন উদ্দেশেই যজ্ঞাদি করাইয়া মূর্খদিগের নিকট হইতে অর্থ অপহরণ করেন, দুর্নীতিপরায়ণেরা কেন সেইরূপ বলিবে না যে, বুদ্ধিমান্ শক্তিসম্পন্নগণ নীতির ধুয়া ধরিয়া অক্ষম মূর্খগণের হাত পা বাঁধিয়া অর্থ শোষণ করেন? ফলতঃ যদি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দনীয় ও অনবলম্বনীয় হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নাই, সুনীতি দুর্নীতি নাই। মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। যাহাতে নিজের সুবিধা হইবে, তাহাই করিবে, অকর্ত্তব্যাচারী বলিয়া কেহ কাহারই নিন্দা করিতে পারেন না। তাহা হইলে কেবল হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা নহে, ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রই মিথ্যা, নীতিশাস্ত্র মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, সমস্তই মিথ্যা।

দশম পরিচ্ছেদ

হিন্দুর অবনতি হইল কেন ?

এক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে এবং বাস্তবিক হইয়াও থাকে যে, যদি হিন্দুর ধর্ম্ম ও কার্য্যপ্রণালী এত উৎকৃষ্ট, তবে হিন্দুর এরূপ অবনতি হইল কেন ? এবং পাশ্চাত্য ধর্ম্মপ্রণালী যদি অপকৃষ্ট, তবে তাঁহাদের এত উন্নতি হইল কি প্রকারে ? আজি পাশ্চাত্যগণ জগতের রাজা, আমরা তাঁহাদের নগণ্য প্রজা ; তাঁহারা ধনকুবের, আমরা অতি দীনহীন ; তাঁহারা দেবতুল্য, আমরা নিতান্ত হেয় ; তাঁহাদের নগরী অমরাবতীতুল্য, তাঁহাদের নরনারী ত্রিদিববাসী দেবদেবীর সমান, আমরা অসভ্য নিগার, তাঁহাদের সেবাতেই নিযুক্ত। ইহার কারণ কি ? কেন এমন উন্নত ভারত এরূপ অবনত হইল ? সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল আমরা পরাধীন, তাহার জন্য কেবল ঐহিক সুখই নষ্ট হইতেছে না, পারত্রিক সমূহ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। মুসলমান-অধিকারে কত লোকের অনিচ্ছায় ধর্ম্মনষ্ট হইয়াছে, কত দেবদেবী-মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে লোকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে, দেবদেবীর অযত্ন করিতেছে। যদি হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, তবে কেন এরূপ হইল ? কেন পূজ্যতম ব্রাহ্মণের, বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয়ের, ধনকুবের বৈশ্যের এরূপ পতন হইল ?

ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই বিবেচনা করিতে হইবে, স্বভাবতঃ মানবের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলই প্রবল ; সুতরাং নিকৃষ্টবৃত্তিপরায়ণ লোকের সংখ্যাই অধিক। প্রবল অধিক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির মধ্যে দুই একটি

উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রবল থাকিলেও যেমন উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরাজয় হয়, সেই-রূপ অধিকতর নিকৃষ্টবৃত্তিপরায়ণ লোকের মধ্যে দুই এক জন ধর্ম্মপরায়ণ লোক থাকিলে সে ধর্ম্মপরায়ণের পরাজয় হয়। যদি কোন ধনবান্ কর্ত্তব্যপরায়ণ সাধু পরিবার দুর্দ্দান্ত প্রতিবেশি-গণে বেষ্টিত থাকেন, তাহা হইলে সে সাধু পরিবার কি সুখে থাকেন? না উন্নতি করিতে পারেন? প্রতিবেশবাসী দুর্দ্দান্তগণ সে সাধুর সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তাঁহার পুত্র কন্যাগণের সংহার সাধন করে এবং হয় ত তাঁহার সাধ্বী রমণীরও সতীত্বরত্ন অপহরণ করে। আবার পতিব্রতা যদি সমধিক রূপবতী হয়, শত শত চক্ষু তাহার দিকে প্রসা-রিত হয়, কিসে তাহাকে হস্তগত করিবে, শত শত ব্যক্তির সেই চেষ্টা; সুতরাং কতদিন সে সুখে থাকিতে পারে? তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে সাধুর সাধুত্ব ও পতিব্রতার পাতিব্রত্যই তাহার অনিষ্টের কারণ? কথা এই যে, মানব একা উন্নতি করিতে পারে না, স্বজাতির উন্নতি না হইলে কোনও মানবেরই প্রকৃত উন্নতি হয় না। যে সমাজে দস্যু তস্করের দল অধিক, সে সমাজে দস্যু তস্করেরই উন্নতি ও সাধুর অবনতি হয়। এবং যে সমাজে সাধুর সংখ্যা অধিক, সে সমাজে সাধুর উন্নতি হয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যে নিয়ম, সমাজের পক্ষেও সেই নিয়ম। যে সময়ে ভারতের উন্নতি হইয়াছিল, সে সময়ে মানবসমাজে দস্যু-সংখ্যার আধিক্য ছিল, কিন্তু তাহারা দূরতর দেশে বাস করিত বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া ভারত-সমাজের তাদৃশ অনিষ্ট করিতে পারিত না। কালক্রমে সেই সকল দস্যুসমাজ ভারতে আপতিত হইয়া ভারতের শান্তি নষ্ট করি-য়াছে, উন্নতির পথ রোধ করিয়াছে। আমাদের অবনতির ইহাই প্রধান কারণ। সমগ্র-সমাজের অন্ততঃ অধিকাংশের উন্নতি না হইলে মানব জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। যে সময়ে ভারত ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত হইতেছিল, সে সময়ে ভারত ভিন্ন আর সকল সমাজেই

মানুষে যে পশুত্ব আছে, সেই পশুত্বেরই উন্নতি করিতেছিল। কাযেই ইতর প্রাণীর মধ্যে যাহারা বলবান্ ও যাহাদের নখদন্তাদি তীক্ষ্ণ, তাহারা যেমন নিরীহ জীবগণের প্রাণনাশ করিয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে, সেইরূপ পশুবলে বলবান্ মনুষ্যগণ নিরীহ সংযমী ধর্ম্মপরায়ণ মানবের অনিষ্ট করিয়া আপনাদের পশুজীবনের উন্নতি করিয়াছে। কিন্তু এ পাশব উন্নতিতে মানবের সুখ নাই, এরূপ উন্নতি স্থায়ীও হয় না। মিসর, আসিরিয়া, গ্রীস, রোম প্রভৃতি কোনও উন্নত জাতিরই এক্ষণে অস্তিত্ব নাই, এবং এক্ষণে যে সমস্ত জাতি উন্নতি করিতেছে, তাহাদের কাহারই স্থায়িত্ব হইবে না। ভারতবাসী পরাধীন বটে, নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত বটে, কিন্তু এখনও ভারতবাসীর অস্তিত্ব আছে, এখনও ভারতবাসীর অন্তরে যে সুখ ও তৃপ্তি আছে, কোনও সভ্যদেশবাসীর সেরূপ নাই।

সকল দেশেরই ইতিহাস কাব্য নাটকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, ধার্ম্মিকগণ অধার্ম্মিক কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, নল প্রভৃতি মহাত্মগণ কি না কষ্ট পাইয়াছেন ? এবং দুর্য্যোধন, রাবণ প্রভৃতি দুরাত্মগণ কি ঐশ্বর্য্য ভোগ না করিয়াছেন ? তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে, ধর্ম্মপথ মানবের অবলম্বনীয় নয় ? তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে, যুধিষ্ঠিরাদির কার্য্যপ্রণালী মন্দ, ও দুর্য্যোধনাদির কার্য্যপ্রণালী উৎকৃষ্ট ? যতদিন সমগ্র মানবসমাজ ধর্ম্মপরায়ণ না হইবে, ততদিন ধর্ম্মপরায়ণ-গণকে মধ্যে মধ্যে এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যখন মনুষ্যের স্বভাবতঃ নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও স্বার্থসাধনেচ্ছা প্রবল, তখন যতদিন ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য না হইবে, ততদিন পশু-প্রকৃতির প্রাধান্য থাকিবে, কাযেই পশু-প্রকৃতি মনুষ্যের পাশব উন্নতি হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের আলোচনা হইতে থাকিলে শেষে পশু-প্রকৃতির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের জয় হইবে ; তাই শেষে রাবণ দুর্য্যোধনাদির পরাভব ও রাম যুধিষ্ঠিরাদির জয়

হইয়াছিল। তবে আজিও যে হিন্দুর দুর্গতির মোচন হইতেছে না, ধর্ম্মপথ ত্যাগ করাই তাহার কারণ। যদি হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননা না করিতেন, যদি হিন্দু রাম যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই এ দুর্দ্দশা থাকিত না, প্রত্যুত ভারত সকল দেশের শীর্ষ-স্থানীয় হইত, সকলেরই গুরুস্থানীয় হইত। ভারতীয় ঋষিগণের প্রসাদে আমাদের সে ভাগ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মবলের শিথিলতা হইল।

ভারত ভিন্ন সমগ্র দেশই তখন পশুবলপ্রধান অসভ্যে পরিপূর্ণ ছিল, সেই সমস্ত জাতি শান্তিপথাবলম্বী ভারতবাসীর উপর বার বার আপতিত হইয়া শান্তির বিঘ্ন করিতে লাগিল। তখন ভারতে ক্ষত্রিয়বলের অভাব হয় নাই, তাই ভারত সে সকল দস্যুর দমন করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল অধার্ম্মিক বিদেশীয়গণের সম্মিলনে কতক কতক ভারতবাসীর মনে ধর্ম্মবিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রের ও ঈশ্বরের সত্তা বিষয়ে অনেকের সন্দেহ জন্মিল ; সেই সন্দেহ হইতে চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতির উদ্ভব হইল। কতকগুলি আস্তিকদর্শন প্রণীত হইয়া চার্ব্বাকদর্শনের নাস্তি-কতাবাদ খণ্ডিত হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিল। ধর্ম্মশাস্ত্রবিশ্বাস সম্পূর্ণভাবে সকলের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে না হইতেই সমাজের বিপ্লব উপস্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম সমাজশৃঙ্খলা এক কালে ভগ্ন করিয়া দিল। ব্রাহ্মণের জ্ঞানে, ক্ষত্রিয়ের বলে, বৈশ্যের ধনে ও সর্ব্বসমাজের ধর্ম্মে বাধা পড়িল। নির্ব্বাণের দিকেই সকলের ঝোঁক পড়িল। এ সংসারে কেবলই দুঃখ, সুখ বিন্দুমাত্র নাই, সুখের আশা বৃথা, ইত্যাকার বাক্যে অনেকের বিশ্বাস জন্মিল। ঈশ্বরবিশ্বা-সের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিকতা, ঐহিকতা একেবারে উঠিয়া গেল। ভিক্ষুকের দল বাড়িয়া গেল, জীবহিংসাভয়ে সম্মার্জ্জনী হস্তে লোক পথ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ জ্ঞানের চেষ্টা, ক্ষত্রিয় বলের চেষ্টা, বৈশ্য ধনের চেষ্টা

ছাড়িয়া নির্ব্বাণের পথে অগ্রসর হইল। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন, কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিবেন, সেই দিকেই তাঁহা-দের দৃষ্টি পড়িল, প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি রহিত হইল। স্বধর্ম্মানুরত ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ক্ষত্রিয়গণ স্বজাতিবিদ্রোহে, অর্থাৎ স্বজাতীয় বৌদ্ধরাজগণের দমনে আপনাদের বলক্ষয় করিতে লাগিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুকের ভরণপোষণেই বৈশ্যগণের ধন ক্ষয় হইতে লাগিল। একা ব্রাহ্মণই ভিক্ষাজীবী ছিলেন, এক্ষণে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাজীবী হইলেন, বৌদ্ধসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরাই পালিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণপোষণ কে করে ? কাযেই ব্রাহ্মণ বৃত্তিহীন হইলেন, কাযেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করিয়া আপদ্ধর্ম্মের ব্যবস্থা অনুসারে নিম্ন বৃত্তি কৃষিপ্রভৃতির অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সকল জাতিরই অবনতি হইল, সকলদিকেই অবনতি হইল, সমস্তই বিশৃঙ্খল হইল। এই বিপদ্ না মিটিতেই পার্শ্ববর্ত্তী যবনাদি জাতিগণ ভারতের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতি ঈর্ষা দৃষ্টিপাত করিল। তখন তাহাদের সভ্যতার প্রথম অবস্থা, শারীরিক বলে তাহারা বিলক্ষণ বলীয়ান্, প্রবল বেগে তাহারা ভারতে পতিত হইল। ছিন্নভিন্ন ভারতসমাজ কিরূপে সেই ভীষণ বেগ সহ্য করিবে ? ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই, ক্ষত্রিয়ের সে বল নাই, বৈশ্যের সে ধন নাই, কি প্রকারে নববলে বলীয়ান্ নবোৎ-সাহে উৎসাহিত পশুবলপ্রধান দয়াশূন্য প্রবল দস্যুর হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবেন ? সুতরাং ভারতলক্ষ্মী তদবধি ক্রমাগতই দস্যুর করকবলিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান গেল, ধন গেল, বল গেল, ধর্ম্ম গেল, কি লইয়া হিন্দু উন্নতি করিবেন ? অসভ্য কালের সে বল আর নাই, ধর্ম্মাচরণ-প্রভাবে তাঁহাদের প্রকৃতি শান্ত হইয়া মানবীয় মৃদুভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, কি প্রকারে পশুবলে পশুস্বভাব দস্যুর সমকক্ষতা করিবেন ? কাযেই হিন্দু দিন দিন দস্যুহস্তে নিপাতিত হইতে লাগিলেন।

ঈশ্বরপ্রণীত বা অপৌরুষের বেদ বা বেদোৎপন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রই সত্য, ও তদবলম্বনে কার্য্য করিলে মানবের ধর্ম্মাচরণ হইবে, এই বিশ্বাস সকল ভারতবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম সে বিশ্বাস মানবের মন হইতে অপসারিত করিল, অথচ বৌদ্ধগণ যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে সকলের বিশ্বাস থাকিল না। কিছু দিন পরেই সকল লোকের মন হইতে বৌদ্ধধর্ম্মবিশ্বাস দূরীভূত হইল। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্ববৎ বিশ্বাস আর হইতে পারিল না। একবার বিশ্বাস গেলে তাহাতে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মান সহজ নহে। তখন, কতক বিশ্বাস-স্থাপনের উপায় বিধান জন্য, কতক স্বেচ্ছাচার জন্য শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধী হইল, স্বজাতিবিদ্রোহ বাড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ উন্নতির চিন্তা ত্যাগ করিয়া, সকল সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য-কার্য্যেই সকল শক্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে বিজ্ঞ লোকের মধ্যে কতকটা একতা সম্পাদিত হইলেও, অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে পরস্পরের অন্ধবিশ্বাস-জনিত বৈর-ভাব দূর হইল না। দিন দিন ধর্ম্মবিবাদ বাড়িতেই লাগিল। কিছুদিন-পূর্ব্বকার শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদ ও আধুনিক হিন্দু-ব্রাহ্ম-বিবাদ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পশ্চিম দেশীয় একদল রাম-উপাসক কৃষ্ণের এত নিন্দা করে যে, শুনিলে কর্ণে হস্ত প্রদান করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাষাভেদ হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে সংস্কৃতই সমগ্র ভারতের সাহিত্যের ভাষা ছিল। বৌদ্ধগণ মূর্খদলে স্বধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া বৈষ্ণবেরাও দেশপ্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্নপ্রকার সাহিত্যের ভাষা হইল। সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনের ভাষাও অধিক বিকৃত হইতে লাগিল। পরস্পরের কথিত ও লিখিত ভাষা এত ভিন্ন হইল যে, এক প্রদেশবাসী অন্য প্রদেশ-

বাসীর কথোপকথন বা পুস্তক কিছুই বুঝিতে পারেন না। এক প্রদেশের ভাষাকে অন্য প্রদেশবাসিগণ ঘৃণা করিতে লাগিলেন। পরস্পরের জন্মস্থানের মধ্যে বহুতর নিবিড় জঙ্গল, পর্ব্বত ও বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় পরস্পরের মিলনের সম্ভাবনা অল্পই ছিল, কাযেই পরস্পরের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে অনেক ভিন্নতা হইল। এইরূপ নানা কারণে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি থাকিল না; প্রত্যুত ভাষা ও আচারাদি-ভেদ জন্য পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমরা যেমন বলি, 'হিন্দুস্থানী কাঠ-খোট্টা' এবং 'বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু', সকলেই সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কাযেই হিন্দুর একতা নষ্ট হইল, পরস্পরের মধ্যে মনোবাদ জন্মিতে লাগিল, পরস্পর পরস্পরের শত্রু হইল, কার্য্যশৃঙ্খলা এককালেই দূরীভূত হইল। জ্ঞান, বল, ধন, সমস্তই নষ্ট হইল; কি প্রকারে হিন্দুর উন্নতি হইবে? যে জাতি নবীন নহে, সুতরাং পাশব বলে বলীয়ান্ নহে, যে জাতির প্রকৃতি ধর্ম্মশাসনে ও জ্ঞানপ্রভাবে বিনম্র হইয়াছে, সুতরাং উদ্ধত নহে, তাহারা ধর্ম্মহীন হইলে কি প্রকারে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? কি প্রকারে দস্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে? তাই যে জাতি পৃথিবীর শিক্ষাগুরু, যে জাতির কল্যাণে সকলেরই মানব নাম সার্থক হইবার কথা, সেই জাতি আজি সকলের পদদলিত, একান্ত নগণ্য ও মৃতপ্রায়। যদি বৌদ্ধধর্ম্ম উত্থিত হইয়া ভারত-সমাজ বিশৃঙ্খল না করিত, তাহা হইলে কখনই ভারতের এরূপ অবনতি হইত না, প্রত্যুত তাহা হইলে ভারতবাসী উন্নতির চরম সীমায় উঠিতেন; ভারত সমগ্র পৃথিবীর গুরু হইতেন। কেবল ভারতেরই উন্নতি হইত তাহা নহে, সমগ্র পৃথিবীই এতদিন সুখ-সাগরে ভাসিত। যদি বৌদ্ধেরা সম্প্রদায়-ভেদের সূত্রপাত না করিতেন, তাহা হইলে সম্প্রদায়ভেদে মানবজাতির যে ভয়ানক অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে পারিত না; কারণ সে সময় পৃথিবীর কোন দেশেই ধর্ম্ম-

শাস্ত্র ছিল না, খৃষ্ট মহম্মদের ধর্ম্ম আধুনিক; সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব না হইলে সমগ্র মানবজাতি সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মানব নাম সার্থক করিত। সকলেই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পরস্পরের হিত সাধন করিয়া মানব নাম সফল করিত। সমগ্র পৃথিবীরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইত। ধর্ম্মবিশ্বাস যে পরিমাণে হিতকর, সেই পরিমাণেই আবার অহিতকর, অর্থাৎ সুধর্ম্ম-বিশ্বাস যেমন হিতকর, কুধর্ম্ম-বিশ্বাস তেমনই অহিতকর। সুধর্ম্ম-পরায়ণেরা সকলকেই সমান দেখেন, কুধর্ম্ম-পরায়ণেরা বিধর্ম্মি-গণের নাশ করিয়া কেবল আপনাদের সুখবিধানে তৎপর। অনেকে বিধর্ম্মীর সমূলে উৎপাটনকেই পরম কর্ত্তব্য মনে করেন। মুসলমানগণ কাফেরের প্রাণবধ করাকে একান্ত কর্ত্তব্য মনে করেন। ঐ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা হিন্দুর কি অনিষ্ট না করিয়াছেন? সভ্য ইংরাজও ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া কত বালক বালিকাকে কৌশলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আমাদিগকে কত দুর্ব্বল করিতেছেন। এইরূপে সম্প্রদায়ভেদে যে কত অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সকল গৃহবিবাদের মধ্যে যখন বিদেশীয়গণ আপন আপন ধর্ম্মমাহাত্ম্য প্রচার করিতে লাগিলেন, মুসলমানগণ বলপ্রয়োগে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে লাগিলেন, খৃষ্টানগণ মধুর বচনে ও নানা প্রলোভনে হিন্দুকে ধর্ম্মহীন করিতে লাগিলেন, তখন নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইতে লাগিল। নানাপ্রকার পাশ্চাত্য দর্শনের আবির্ভাব হইল, জড়বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রাধান্য হইল, স্ব স্ব যুক্তিই কর্ত্তব্যপথের প্রয়োক্তা হইল, ঐহিক সুখই সর্ব্বস্ব জ্ঞান হইল। সকলেই একবাক্যে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝাইয়া দিলেন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কেবল দুঃখেরই হেতু, উহা ত্যাগ না করিলে আর নিস্তার নাই, হিন্দুর জাতি-ভেদপ্রথা একতার বিশেষ প্রতিবন্ধক, একান্নবর্ত্তিতা ও অন্তঃপুরপ্রথা

উন্নতির একান্ত বিরোধী, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থের অবতার, পূজা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি কেবল তাঁহাদেরই লাভের জন্য; ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় ভারতবাসী নহেন, তাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া পশুবলে নিরীহ আদিম ভারতবাসী শূদ্রের এই দুর্দ্দশা করিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মণাদি শূদ্রের পরম শত্রু। বেদ সেই স্বার্থপর কৃষক ব্রাহ্মণেরই প্রণীত, ঈশ্বরপ্রণীত নহে। কাযেই ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি যে ক্ষীণ বিশ্বাস ছিল, এই সকল শিক্ষা-প্রভাবে তাহাও এক্ষণে গিয়াছে, এককালে আমরা অধঃপতিত হইয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের দোষে যে আমাদের পতন হয় নাই, এ কথা সাবিত্রী লাইব্রেরীর কোন বার্ষিক অধিবেশনে 'হিন্দুর রীতি নীতি হিন্দুর অবনতির কারণ নহে' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছিল, 'সাবিত্রী' নামক পুস্তকে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে, এবং হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা, অন্তঃপুর-প্রথা, বাল্যবিবাহ, ব্রাহ্মবিবাহ প্রভৃতি যে অনিষ্টকর নহে, প্রত্যুত অশেষ কল্যাণের হেতু, তাহা 'মানব-তত্ত্বে' আলোচিত হইয়াছে, এইজন্য সে সকলের পুনরালোচনা করা হইল না। বস্তুতঃ হিন্দুর যে পতন হইয়াছে, সে ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষে নহে, ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে পারে নাই বলিয়া। এবং সমগ্র পৃথিবীবাসী যে কেবল আধিভৌতিক উন্নতি লইয়া ব্যস্ত, সনাতনধর্ম্মের প্রচারে বাধা হওয়াই তাহার কারণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মশাস্ত্র-সমন্বয়।

যখন বুঝা গেল ধর্ম্মশাস্ত্রের অবলম্বনে সকল বিষয়ে মঙ্গল সাধিত হয়, অর্থাৎ যদি পরকালের সুখসাধন মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না; যদি ঈশ্বরের প্রিয় হওয়া প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না; যদি Duty মনে করিয়া কর্ত্তব্য করিতে হয়, তাহা হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র একমাত্র অবলম্বনীয়; যদি বিশ্বের, মানবজাতির, স্বসমাজের বা নিজের ইহকালীন সুখের উন্নতি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়; তখন মনুষ্যপ্রণীত হইলেও মানবকে সম্পূর্ণ ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের পরতন্ত্র হইতে হইবে। যদি মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া মূর্খতার কার্য্য হয়, তাহা হইলে নীতিশাস্ত্র, সামাজিক বিধি, রাজনিয়ম, বিজ্ঞান, দর্শন, যাহারই পরবশ হইবে, তাহাতেই মূর্খের ন্যায় কার্য্য করা হইবে। সমস্তই ত মনুষ্যপ্রণীত। কিন্তু যদি অন্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, যদি বিজ্ঞানদর্শনাদিপ্রণেতাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাকে বিশ্বাস করিতে পারা যাইবে না কেন? ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা যে বিজ্ঞানদর্শনপ্রণেতা বা অন্য মনুষ্যের অপেক্ষা ভ্রান্ত বা স্বার্থপরায়ণ, তাহার অর্থ কি? বস্তুতঃ যদি বিজ্ঞানদর্শনাদি আমাদের অবলম্বনীয় হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রও অবলম্বনীয় হইবে—অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলিয়াও একান্ত অবলম্বনীয় হইবে। এবং যেমন বিজ্ঞানদর্শনাদি সমস্ত শাস্ত্রেরই সামঞ্জস্য করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় করা আবশ্যক, ধর্ম্মশাস্ত্র

সকলেরও সেইরূপে সামঞ্জস্য করিয়া মানবীয় কর্ত্তব্য স্থির করিবার উপায় করা আবশ্যক।

যদি বল আমরা বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতির কথা বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু আমরা সে সকল কথার সত্যতা পরীক্ষা করি। যেটী আমরা ভাল বলিয়া বুঝি, তাহাই গ্রহণ করি; যেটী না বুঝি, তাহা গ্রহণ করি না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির নির্ণীত তত্ত্ব পরের হইলেও তাহা সকলেরই নিজস্ব। কিন্তু পরীক্ষা, সংস্কার ও শিক্ষাসাপেক্ষ। সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের বিচার-শক্তি একপ্রকার নহে। একান্ত অসভ্য উলঙ্গ বর্ব্বর জাতির ও সভ্যজাতির বিচারশক্তি একপ্রকার নহে। শিক্ষিত দুইজন বা অশিক্ষিত দুইজনের বিচারশক্তিও সম্পূর্ণ একপ্রকার নহে। মনোবৃত্তির ও শিক্ষার ভিন্নতা জন্য সকলেরই বিচার করিবার—সত্য বুঝিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্নপ্রকার। সুতরাং কি প্রকারে সকলে বুঝিয়া লইবে, ও কি প্রকারে সকলের বুঝা ঠিক হইবে? শিক্ষার অভাবে পশু, পক্ষী, ইতর প্রাণিগণও যেমন বিচারশক্তিহীন, মানবও সেইপ্রকার। অশিক্ষিত মনুষ্য ও পশুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই বলিলেই হয়। মানুষ যে জ্ঞানী হয়, বিচার-পটু হয়, সে কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে। সুতরাং যদি শিক্ষা না পায়, তবে বালকের ন্যায় যুবা ও বৃদ্ধগণও কোন সত্যের নির্ণয় বা নির্ণীত সত্যের পরীক্ষা করিতে পারে না। ঐরূপ, যাঁহারা কুশিক্ষা বা ভ্রান্তশিক্ষা পান, তাঁহারাও পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে পারেন না। তাই কেহ পরীক্ষা করিয়া বলেন স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি মঙ্গলকর; কেহ বলেন ঐ সকল সমূহ অমঙ্গলের হেতু। যাঁহার যেমন শিক্ষা, যেমন সংস্কার, যেমন প্রবৃত্তি, যেমন বুদ্ধি, সেইরূপই বিচার বিতর্ক করেন। যদি প্রকৃত পরীক্ষা করিতে হয়, তবে যাহার পরীক্ষা করিতে হইবে, অগ্রে সম্যক্ রূপে তাহার শিক্ষা আবশ্যক। বিজ্ঞানের কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে হইলে, বিজ্ঞানে অধিকার থাকা চাই।

ঐরূপ, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের পরীক্ষা করিতে হয়, তবে অগ্রে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা কর, মনোযোগের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা কর, এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদনুসারে কার্য্য কর, তবে বুঝিতে পারিবে ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য কি না।

তাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়াছেন শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে যুক্তি, তাহা যুক্তিই নহে। শাস্ত্র সকলের একতা ও উন্নতি বিধান জন্য শাস্ত্রের অবিরোধী যুক্তিই যুক্তি। মনু বলিয়াছেন—

বেদোঽখিলধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ ॥ ৬৷২

হিন্দু সেই যুক্তিবলে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, সাকারবাদ ও নিরাকারবাদ, সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের সমন্বয় করিয়াছেন। কেহ বলেন মৃত্যুর পর আত্মা কর্ম্মানুরূপ দেহান্তর পরিগ্রহ করেন, কেহ বলেন স্বর্গ বা নরক ভোগ করেন, কেহ বলেন ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়েন, কেহ বলেন পিতৃলোকে বাস করেন, কেহ বলেন ব্রহ্মের সাযুজ্য, সারূপ্য, সালোক্যরূপ মুক্তি লাভ করেন। ইহার কোনও কথাই হিন্দু মিথ্যা বলেন না, অবস্থাবিশেষে সমস্ত অবস্থাই ঘটে, এইরূপে সামঞ্জস্য করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে যেখানে যে বিরোধ দেখিতে পান, যুক্তিপ্রয়োগে তৎসমস্তেরই সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। হিন্দুর বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অঙ্গ। মানবগণ যাহাতে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া সুখী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও উন্নত হয়, তাহারই জন্য যুক্তি বিজ্ঞান দর্শনাদির আবশ্যক; পরস্পরকে পরস্পরের শত্রু করিয়া, পরস্পরের মধ্যে ভেদ সাধন করিয়া দুঃখবৃদ্ধির জন্য আবশ্যক নহে। মনুষ্যধ্বংস অভিপ্রায়ে নানাবিধ বিষ ও আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য, বা মনুষ্যবর্গের বৃত্তি নাশ করিয়া আহারাভাবে প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কলকারখানা করিবার জন্যই বিজ্ঞানের আবশ্যকতা নহে। ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রেম ও মনুষ্যত্ব নাশের জন্য দর্শনশাস্ত্রের

আবশ্যকতা নহে। যাহাতে মানব ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান্ হয়, পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া মানবীয় ভাব প্রাপ্ত হয়, বিজ্ঞান দর্শনাদি যদি তাহা না করিয়া কেবল পশুত্বের বৃদ্ধি করিল, তবে সে বিজ্ঞান দর্শনের প্রয়োজন কি? বস্তুতঃ যদি মানবীয় ভাবের অনুমত করিয়া বিজ্ঞান দর্শনের পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই সমন্বয় হইবে, সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবে, ধর্ম্মদ্বন্দ্ব আর থাকিবে না।

হিন্দু নানা দেবদেবীর পূজা করিলেও সকলেরই এক একটি ইষ্ট দেবতা আছেন। একমনে সেই ইষ্ট দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন। যদি কেবল ইষ্ট দেবতারই উপাসনা করা হয়, অন্য কোনও দেবতার উপাসনা না করা হয়, তাহা হইলে অকর্ত্তব্য বা শাস্ত্রবিরোধী কার্য্য করা হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া শাস্ত্রবিরোধী কোন কার্য্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। শাক্ত যে রক্তবস্ত্র রক্তমাল্য ধারণ করেন, ছাগ বলি দিয়া তৃপ্তির সহিত মহাপ্রসাদ ভোজন করেন, তাহাতে দোষ নাই; কারণ শাস্ত্রমতে তাহা নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু তিনি কোন নিষিদ্ধ মাংস ভোজন বা কোনরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবেন না। বৈষ্ণব যে গেরুয়া বস্ত্র পরেন, তিলক কাটেন, মাংসভোজন ত্যাগ করেন, তাহাতে শাক্ত বা কোন সম্প্রদায়ের বিরোধাচরণ করা হয় না; কিন্তু তাঁহারা যে ছত্রিশ জাতি একত্র হইয়া ভোজন করেন, ১।০ দিয়া বৈষ্ণবী করেন, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ঐরূপ ব্রাহ্ম যে নিরাকার উপাসনা করেন, দাড়ি রাখেন, চসমা পরেন, তাহাতে কোন দোষ নাই; কিন্তু তাঁহারা যে বর্ণভেদ মানেন না, বিধবা-বিবাহ দেন, তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্র-বিরোধী কার্য্য না করিয়া যদি সকলে আপন আপন ইষ্টদেবের পূজা করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব থাকে না; শাস্ত্রের সকল আদেশই যে পালন করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অধিকার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি অনুসারে যেমন সম্ভব, সেইরূপ করিলেই চলিতে পারে; কিন্তু

যেগুলি একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, সেইগুলির অনুষ্ঠান, ও যেগুলি একেকালে নিষিদ্ধ, সেগুলি না করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সেই বিধি নিষেধ মানিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরমূর্ত্তির বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহা হইলে আর ধর্ম্মদ্বন্দ্ব হয় না। প্রত্যুত সকলে মিলিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। বৈষ্ণব বিষ্ণু-পরায়ণ হউন, শাক্ত শক্তি-পরায়ণ হউন, ব্রাহ্ম নিরাকার ভজনা করিতে পারেন করুন, খৃষ্টান খৃষ্টের উপাসনা করুন, মুসলমান আল্লা বলুন; কিন্তু অনুষ্ঠান বিষয়ে সামাজিক কার্য্যসকলে যদি পরস্পর বিপরীত পথ অবলম্বন না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের সামঞ্জস্য মতে কার্য্য করেন, তাহা হইলে কাহারই সহিত মনোবাদের সম্ভাবনা থাকে না। যে সকল অনাচার জন্য হিন্দু অন্য জাতীয়গণকে ম্লেচ্ছ বলেন, সে সকল কি বাস্তবিক পরিত্যাজ্য নহে? খাদ্যাখাদ্য ও উচ্ছিষ্টাদির বিচার করিলে ও সর্ব্ববিষয়ে নিয়মিত হইলে কি মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে? কখনই না। তাহাতে পরকালের মঙ্গলামঙ্গল না হইলেও শরীরের ও মনের যে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। স্বেচ্ছাচারপরায়ণ না হইয়া যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে সকলে চলেন, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহা হইতে পারে।

এই প্রকারে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি যদি সর্ব্বশাস্ত্রের ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিপ্রকরণ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সামঞ্জস্য করিতে পারেন, তাহা হইলে জগতে আর ধর্ম্মবিরোধ থাকিবে না, সকল মানব একপ্রাণে জগদীশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার অনুজ্ঞাপালন করিয়া ইহ ও পরকালে অনন্ত সুখে সুখী হইবেন। পরস্পরের বিবাদে পৃথিবী বৃথা শোণিতে প্লাবিত হইবে না। প্রত্যুত সমগ্র মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের হিতসাধন ও পরম পিতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া মানব নাম সার্থক করিবেন। যে সংসারে ভ্রাতৃগণ পরস্পর একমনে

পরস্পরের প্রতি প্রেমচক্ষে দেখেন ও সকলে মিলিয়া পিতামাতার সেবা ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া একমনে কার্য্য করেন, সে সংসার যে বড় সুখের সংসার, তাহাতে কি আর কোনও সন্দেহ আছে? যে সংসারে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা নাই, ভ্রাতৃগণ পরস্পর পরস্পরের শত্রু, বলবান্ ভ্রাতা দুর্ব্বলের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছে, দুর্ব্বল ভ্রাতা চাতুরী অবলম্বন করিতেছে, নিয়তই কলহ, নিয়তই অশান্তি, সে সংসারে সুখ দূরের কথা, নিয়তই সকলে দুঃখভারে আক্রান্ত। দুর্ব্বলের ত কথাই নাই, প্রবলেরও কিছুমাত্র সুখ নাই, শান্তি কাহারও মনে থাকে না। যদি সুখই না হইল, তবে ধনৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি? বলবুদ্ধিরই বা প্রয়োজন কি? পশ্বাদির ন্যায় নিকৃষ্ট বৃত্তিমাত্রের পরতন্ত্র হইয়া কেবল ভোগসুখে রত থাকিলে, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীতে কি প্রভেদ থাকে? মানুষ যদি মানবত্বের উৎকর্ষ না করিল, সুখশান্তি ভোগ না করিল, তবে আর মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব কি প্রকারে?

পশুশ্রেষ্ঠত্ব ও মানবত্ব কখনও এক কথা নহে। সিংহ সর্ব্বজীবের অপেক্ষা বলবান্, কোন পশুই সিংহকে পারিয়া উঠে না, তাই সিংহ পশুরাজ। মানবের প্রাধান্যও যদি ঐরূপ পশুবলের উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে পশুত্বে ও মানবত্বে প্রভেদ কি থাকে? যেরূপ উন্নতি করিয়া এইরূপে মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিতে হয়, সে ত পাশব উন্নতি। প্রেম, ভক্তি, সৌভ্রাত্র, দয়া, বিনয়, ক্ষমা প্রভৃতির অবলম্বনে পরস্পর সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই মানবীয় উন্নতি হয়। পাশ্চাত্য সমাজ বলেন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিলে আলস্য বৃদ্ধি হয়, তাহাতে উন্নতির ব্যাঘাত হয়, কিন্তু যদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দেওয়া যায়, তবে মানব দয়ার পরবশ হইবে কি প্রকারে? যদি সমাজে অপরাধী না থাকে, তবে ক্ষমার পরিচালনা হইবে কি প্রকারে? যদি পিতা, মাতা, আচার্য্য, পণ্ডিত, বৃদ্ধগণের প্রাধান্য স্বীকার না করা যায়,

তবে শ্রদ্ধাভক্তির বিকাশ হইবে কি প্রকারে? যদি অক্ষমের প্রতি মমতা না থাকে, তবে প্রেমের বিকাশ কি প্রকারে হইবে? ফলতঃ যদি মানুষ হইতে হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বল, নির্ধন, মূর্খ, দুষ্ট, সকলকেই লইয়া থাকিতে হইবে; সকলেই যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, মানবীয় গুণসম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল তরবারি, কামান, বন্দুকের সহায়তায় তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিলে হইবে না। কেহ স্নেহ করিবে, কেহ ভক্তি করিবে, কেহ দান করিবে, কেহ গ্রহণ করিবে, কেহ অনিষ্ট করিবে, কেহ ক্ষমা করিবে, কেহ উদ্ধত হইবে, কেহ বিনীত হইবে; মনুষ্য সমাজের নিয়মই এই। নচেৎ দয়া, ক্ষমা, বিনয় প্রভৃতির প্রয়োজনই থাকে না; যদি বলপ্রয়োগেই দুষ্ট প্রভৃতির দমন করিতে হয়, তাহা হইলে আর মনুষ্যত্ব থাকে কৈ? ক্ষমা প্রভৃতির দ্বারা যে দমন, তাহাই মানবীয় দমন। অতএব প্রতি-দ্বন্দ্বিতা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মানবীয় গুণের উৎকর্ষ হয়, ও সেই উৎকর্ষ হেতু দুষ্ট প্রভৃতি শান্ত হয়, তাহাই করা একান্ত কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে তাহা কখনই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া ঐরূপেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতএব সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণ হইয়া, সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া যাহাতে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের আনুকূল্য করিয়া মানবত্ব রক্ষা করা যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বা স্ব স্ব বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া অন্য ধর্ম্মের অবমাননা করা উচিত নয়। ধর্ম্মের নামে কি অমানুষ ব্যাপার না ঘটিতেছে? মুসলমান কাফেরের প্রাণবধ করিতেছেন, খৃষ্টান পিতা-মাতার ক্রোড় হইতে স্নেহের পুত্তলী কাড়িয়া লইতেছেন, ব্রাহ্ম প্রেমময় পিতামাতার ও স্বজাতির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতেছেন; এইরূপ কত অনিষ্ট যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে অযথা বিশ্বাস নিবন্ধন হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরম হিতকর ধর্ম্মশাস্ত্র একান্ত অহিতকর হইয়াছে।

তাই বলি আর নয়, ধর্ম্ম নাম ও মানব নাম সার্থক কর ; যদি ধর্ম্মও দ্বন্দ্বের বিষয় হয়, তবে আর মানুষ মানুষ হইবে কি প্রকারে ?

বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁহারা এক্ষণে পৃথিবীর উন্নত জাতি, তাঁহারা পশুত্বের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত। এবং যাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানেরা তাঁহাদের অনুকরণে পশ্বাচার-পরায়ণ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সনাতনধর্ম্মের পরিরক্ষণে যত্নশীল হওয়া দূরে থাকুক, বিলোপ সাধনেই সকলে তৎপর। আবার, সুখের বিষয় এই যে, এক্ষণে স্রোত ফিরিয়াছে. সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম এক্ষণে অনেকে বুঝিতে-ছেন ; সুতরাং আশা করা যায় যে, কালে সমগ্র মানব সনাতন ধর্ম্ম অব-লম্বন করিয়া, মানব নাম সার্থক করিবে। মিথ্যা আশা নহে, সত্য সত্যই এ আশা পূর্ণ হইবে। যে পরাৎপর পরমেশ্বর অগ্রে জড়ের সৃষ্টি করিয়া, পরে উদ্ভিদাদি ও তাহারও পরে ইতর প্রাণী ও মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের নিয়মেই মানুষের পরে দেবতার সৃষ্টি হইবে। পশুভাবাপন্ন মানবের পরে দেবভাবাপন্ন মানবের উদ্ভব হইবে। বোধ হয় সেই জন্যই শত শত অত্যাচারেও হিন্দুর লোপ হয় নাই ; শত শত প্রাচীন ও নবীন সভ্য জাতির লোপ হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুর অদ্যাপি লোপ হয় নাই। আমরা এককালে অধঃপাতে গিয়াছি বটে, কিন্তু এখনও আমাদের অস্তিত্ব আছে ; উন্নত জাতিগণের উচ্চ উচ্চ বিজ্ঞান দর্শনের উপরেও এখনও আমরা কথার সুর চড়াইতে পারিতেছি, এখনও আমরা ভারতভূমির গৌরব করিয়া থাকি, এখনও পাশ্চাত্য জাতিগণ আমাদের উচ্চতা স্বীকার করেন। এই সকল ভাবিলে আমাদের আশা হয়, উৎসাহ হয়। শারীরিক বল দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে কোনও স্থানেই আধিপত্য করিবার শক্তি আমাদের না থাকিলেও, ধর্ম্মবলে আমরা যে, সমগ্র পৃথিবীর প্রভু হইতে পারিব, এ আশা আছে। ব্রাহ্মণগণ যেমন প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ের ভক্তিভাজন ছিলেন, সেইরূপ আমরা অন্যান্য-

দেশীয় প্রভৃত বলশালিগণের ভক্তিভাজন হইতে পারিব, এবং তাহার ফলে সমগ্র মানবজাতিকে ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে পারিব। এ আশার আরও কারণ এই যে, যে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রভাবে সনাতনধর্ম্মের এতাদৃশী অবনতি হইয়াছিল, এক্ষণে আর সে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি লোকের, বিশেষতঃ শিক্ষিতগণের সেরূপ আস্থা নাই। যুক্তিই এক্ষণে শিক্ষিতগণের প্রধান অবলম্বন। এক্ষণকার সাধারণ বিশ্বাস এই যে, সুখ স্বাধীনতাই মানবের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না মনে করিয়াই, শিক্ষিতেরা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। যদি এক্ষণে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে সুখী ও স্বাধীন হইব, বল বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন হইব, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারিব, সর্ব্বপ্রকারে ইষ্টসিদ্ধি হইবে ; যদি বুঝিতে পারেন ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত কি নিজের, কি জাতীয় কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি হয় না ; তাহা হইলে সকলেই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যে যুক্তিপথের আশ্রয়ে লোকে এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাসহীন হইয়াছেন, সেই যুক্তিপথের আশ্রয়েই সকলে সনাতনধর্ম্মপরায়ণ হইবেন। কেবল আমাদের নয়, সকল দেশেরই এক্ষণে সমান অবস্থা। কোন দেশেই এক্ষণে আর জাতীয় ধর্ম্মের সেরূপ গোঁড়ামি নাই ; তাই আজি অনেক য়ুরোপীয় থিয়োসফিষ্ট হইতেছেন, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত পতিত হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন। অতএব এ সময়ে চেষ্টা করিলে যে, সমগ্র পৃথিবীবাসিগণ সনাতন-ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখী হইবেন, সে আশা দুরাশা নয়। অতএব বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, যুক্তিপটু পণ্ডিতগণের কর্ত্তব্য, যে প্রকারে হিন্দু পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়াছেন, সেই প্রকারে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া মানবমণ্ডলীকে একতাসূত্রে বদ্ধ ও ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করেন। ইহাই বিজ্ঞানদর্শনাদির চরম উদ্দেশ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না।

যাউক সমগ্র পৃথিবীর কথা, যাউক সমগ্র মানবজাতির কথা, আমাদের পক্ষে স্বধর্ম্ম অবলম্বন শ্রেয়ঃ? না, পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ শ্রেয়ঃ? পরকালের কথা, মোক্ষের কথা না ভাবিয়া, কেবল পাশ্চাত্যগণের ন্যায় উন্নতি করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যদি শিল্পবিজ্ঞান বলধনাদির বৃদ্ধি করিতে হয়, যদি জীবনসংগ্রামে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে? না, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ করিতে হইবে? এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন। এই জড়বিজ্ঞানের প্রাধান্যের কালে কেবল পরকালের ভয় দেখাইয়া লোককে ধর্ম্মপরায়ণ করা অসম্ভব। সেই জন্য দেখা আবশ্যক, আমাদের ঐহিক উন্নতি করিতে হইলে—আমাদের জাতীয় অধঃপতন নিবারণ করিতে হইলে, কোন্ পথের আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে, এত দিন পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমরা উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি। শতবর্ষের অধিক হইল আমরা সুসভ্য ইংরাজরাজের অধীন হইয়াছি, অন্যূন শতবর্ষ আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে আমরা পাশ্চাত্য মতেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছি; আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের রীতিনীতি, সমস্তই কুসংস্কারপূর্ণ জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানপথের অনুসরণ করিতেছি; তাহাতে আমাদের কি উন্নতি হইয়াছে, দেখা আবশ্যক।

সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন এক্ষণে আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে, সুখের নানা উপকরণ আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান; শত বর্ষের পূর্ব্বকালের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে, এমন কি পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনায় এক্ষণে যুগান্তর উপস্থিত বলিতে হয়। পূর্ব্বে দস্যুতস্করে দেশ পরিপূর্ণ ছিল, ধনপ্রাণ লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, এক্ষণে সে ভয় এককালে নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবারই রাস্তা ছিল না, কোন স্থানে যাইতে হইলে কষ্টের সীমা ছিল না, এক্ষণে ভারতব্যাপী রাজপথ, দ্রুতগামী রেলওয়ে, ষ্টীমার, ট্রাম প্রভৃতি হইয়াছে, যেখানে ইচ্ছা অনায়াসেই যাওয়া যায়। ডাকঘরের এমন উন্নতি হইয়াছে যে, এক পয়সা ব্যয় করিয়া অতি অল্প সময়মধ্যে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী আত্মীয়ের সংবাদ পাইতেছি, যত টাকা ইচ্ছা হয় নির্ভয়ে পাঠাই-তেছি, টেলিগ্রাম-সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে বহুদূরবর্ত্তী আত্মীয়ের সংবাদ পাইতেছি। পূর্ব্বে বেশভূষা ও সুখের উপাদান অতি সামান্যই ছিল, এক্ষণে সুখের উপকরণ এত হইয়াছে ও সে'সকল এমন সুলভ যে, পূর্ব্বে রাজরাজেশ্বরগণও স্বপ্নে যে সকল সুখের আশা করেন নাই, এক্ষণে সামান্য গৃহস্থও তদপেক্ষা সুখভোগ্য ভোগ করিতেছেন। এই সকল দেখিলে কে না বলিবে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ সকল বিষয়ে আমাদের কি কৃতিত্ব আছে? এ সকলই ত ইয়ুরোপের প্রসাদেই পাইতেছি। দস্যুতস্কর তাঁহারাই শাসন করিয়া-ছেন। রাজপথ, পোষ্ট-আফিস, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যত কিছু সুখের উপকরণ, সমস্তই ত তাঁহাদেরই মস্তক হইতে উদ্ভূত; আমাদের দ্বারা কি হইয়াছে? আমরা ত কেবল ঘরের পয়সা তাঁহাদিগকে দিয়া সর্ব্ব-স্বান্ত হইতেছি, ও অভ্যাসজনিত কতকগুলি দুঃখেরই সৃষ্টি করি-তেছি মাত্র; তাহাতে আমাদের উন্নতি হইল কিসে? যদি আজ

ইংরাজ আমাদিগকে রাজ্য অর্পণ করিয়া দেশে চলিয়া যান, তাহা হইলে আমাদের এ সুখ সম্পত্তি থাকিবে কি? তখন আমাদের এ মৌতাত যোগাইবে কে? তখন দস্যু তস্করের হাত হইতে ও বিদেশীয় আক্রমণ হইতে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? যে সকল শক্তি-বলে ইংরাজেরা এই সকল উন্নতি করিয়াছেন, আমাদের তাহার কোন্ শক্তির উন্নতি হইয়াছে? পূর্ব্বাপেক্ষা বল, সাহস, একতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, তিতিক্ষা, স্বজাতিপ্রিয়তা কিছুমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে কি? না, পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ধনসম্পত্তি ও শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি হই-য়াছে? যে বিজ্ঞানবলে ইয়ুরোপীয়গণ এই উন্নতি করিয়াছেন, সে বিজ্ঞানের কি কিছুমাত্র উন্নতি আমাদের দ্বারা হইয়াছে? তাহা যদি বাস্তবিক না হইয়া থাকে, তবে আমরা এ শতবর্ষে কি করিলাম? এই শতবর্ষ যে ধর্ম্মত্যাগী হইয়া ইংরাজের অনুকরণ করিলাম, তাহার ফল কি হইল? যদি কিছু ফল না পাইলাম, তবে কিসে বুঝিব পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে?

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, জাতীয় উন্নতি এক দিনে হয় না, বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা না করিলে কোনও জাতির উন্নতি হয় না। সুতরাং শতবর্ষে উন্নতি হয় নাই বলিয়া সে পথের দোষ সপ্র-মাণ হয় না। অধঃপতিত জাতির উন্নতি করিতে বহুশতাব্দী আবশ্যক। বিশেষতঃ আমরা এমন কুপথে চলিতেছিলাম, এমন বিপরীত পথে যাইতে-ছিলাম যে, শতবর্ষে তাহার সংশোধন হয় না, সুতরাং ব্যস্ত হইলে চলিবে না; এইরূপে কার্য্য করিতে থাকিলে কালে নিশ্চয়ই ফল ফলিবে। কিন্তু আমরা ত আণ্ডামান দ্বীপবাসী নহি, ভীল কুলী প্রভৃতির ন্যায় বর্ব্বরজাতিও নহি, যে, শতবর্ষে আমাদের উন্নতির চিহ্নও পরিলক্ষিত হইবে না। আমাদেরই কবি হেমচন্দ্র যে জাপানকে অসভ্য বলিয়াছেন, ৩০।৪০ বৎসরে সে জাপানের অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে, আর শতবর্ষেও

আমাদের কিছু উন্নতি হইবে না? তবে কিসে বুঝিব যে, এই ভাবে চলিলে আমাদের নিশ্চয়ই কালে উন্নতি হইবে? সে আশা করা দূরে থাকুক, এই ভাবে চলিলে যে অচিরে আমরা এককালে উন্মূলিত হইব না, তাহার প্রমাণ কি পাইয়াছি? শতবর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী, এমন কি আমাদের প্রত্যক্ষীকৃত ৫০ বৎসর পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যে আমরা এককালে দিশাহারা হই! যে গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে গ্রামেই দেখি অর্দ্ধেক মনুষ্য নাই; যাহারা আছে, তাহারা জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল ও ধনহীন; সকলেই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও কুকর্ম্মান্বিত। অধঃপতিত জাতির উন্নতি হইতে বিলম্ব হয় হউক, কিন্তু এরূপ অবনতি কেন?

বঙ্গদেশীয় জনগণই সর্ব্বাগ্রে পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ করেন। বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে পাশ্চত্যবিদ্যা শিক্ষা ও পাশ্চাত্য রীতিনীতির পরতন্ত্র হইয়া রাজ-জাতির প্রিয় হইয়াছিলেন। সেইজন্য বাঙ্গালী, সাহেবের সহকারিরূপে সমগ্র ভারতে পূজিত হইয়াছিলেন, এদেশীয় লোকের প্রাপ্য সমস্ত উচ্চপদ বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল। সংবাদপত্র, পুস্তক, সভাসমিতি কেবল বাঙ্গালীই করিতেন। বঙ্গদেশের ভূমি অতি উর্ব্বরা, সর্ব্বপ্রকার শস্য, ফল, মূল, মৎস্য, মাংস, গব্য দুগ্ধ-ঘৃত বঙ্গদেশে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল বঙ্গেই হইয়াছে। রাজধানী কলিকাতা বঙ্গে অবস্থিত। বুদ্ধি ও বিদ্যাতেও বাঙ্গালী ভারতীয় সর্ব্বজাতির শ্রেষ্ঠ। বঙ্গই ভারতবাসীর গৌরব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সকল প্রদেশীয়েরাই বাঙ্গালীর অনুকরণ করেন। সেই বঙ্গবাসীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই যে, আমরা এককালে ম্রিয়মাণ হই।

সত্য বটে বঙ্গবাসী চিরকালই বলবীর্য্যবিহীন, কিন্তু এক্ষণকার ন্যায় কাপুরুষ বলবীর্য্যহীন ত কখনই ছিল না। প্রাচীনকালের বিজয়-সংহ প্রভৃতির কথা বলিতে চাহি না; মুসলমান রাজ্যশাসন-সময়ের

প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, মোনা হাতি প্রভৃতির কথা বলিতে চাহি না; ইংরাজের প্রথম সময়ের দস্যু রঘুনাথ প্রভৃতির কথাও বলিতে চাহি না; রামকমল বাবু প্রভৃতির শুনা কথাও বলিতে চাহি না; আমরা স্বচক্ষে যে সকল বড় বড় পালোয়ান, লাঠিয়াল প্রভৃতি দেখিয়াছি, সেরূপ একজনও ত এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাজলক্ষ্মীর রঘুদয়াল কবির কল্পনা নহে; আমরা স্বচক্ষে ঐরূপ কত লোককে রিক্ত হস্তে বন্যমহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে দেখিয়াছি। আমরা এমন লোক দেখিয়াছি যে, তাহাদের চীৎকারধ্বনি শুনিয়া শত শত লোক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; এবং এমন বলবান্ ও খেলোয়াড় লোক দেখিয়াছি যে, তাহা এক্ষণে স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে হয়। দুঃখের কথা কি বলিব, শত গ্রাম খুঁজিয়া এখন এমন একজন লোক পাওয়া যায় না, যাহাকে জমিদারীর পাইকের কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়। আকৃতি দেখিয়া বলবান্ মনে করিয়া নিরীহ নির্বীর্য্য বঙ্গীয় ভীরু প্রজা একটু ভয় পায়, এমন লোক একজনও এখন নাই। বলের সঙ্গে সঙ্গে লোকের সাহসও এককালে গিয়াছে; সামান্য চোর ধরিতে পারে, এরূপ লোক এক্ষণে বিরল; একজন পুলিশ কনেষ্টবল কোন গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামশুদ্ধ লোক পলায়ন করে; যতই অত্যাচার করুক, সকলেই অম্লান বদনে সহ্য করে। ভদ্রসন্তানগণ ত পুরা বাবু হইয়াছেন; মিহি ধপ্‌ধপে কাপড় পরিয়া, স্ত্রীলোকের ন্যায় সিঁতি কাটিয়া গন্ধদ্রব্য মাখিয়া বেড়ান, একটী আঁচড়ও গায়ে সহে না। নিম্নশ্রেণীর জনগণও তাঁহাদের অনুকরণে লম্বাকোঁচা ঝুলাইতেছে। ইতর ভদ্র সকলেরই শরীর শীর্ণ জীর্ণ; রোগবিশেষকে শরীরে আশ্রয় দেন নাই, এমন লোকই বিরল; ডিস্‌পেপ্‌সিয়া এক্ষণে সঙ্গের সাথী, ও ডাইয়াবিটিজ বড়লোকের লক্ষণ হইয়াছে। ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহার পর ম্যালেরিয়া আধিপত্য বিস্তার করে; ক্রমে ডেঙ্গু, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা সাধ্য-

মত আধিপত্য বিস্তার করে; এক্ষণে মহামারী প্লেগের জয়জয়কার। রোগে শোকে সমস্ত বঙ্গ, সমস্ত ভারত জর্জ্জরিত। আহারের শক্তি এক্ষণে মানুষের নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে একজনে যাহা খাইত, এক্ষণে পাঁচ জনে তাহা খাইতে পারে না। আমরা নিজে হাতে করিয়া একটা পাঁঠা, বৃহৎ মৎস্যের মুড়া, একহাঁড়ী সন্দেশ ও তদুপযুক্ত নানা ব্যঞ্জন এক একজনকে খাওয়াইয়াছি; তখন আম্র-দুগ্ধ খাইবার জন্য যে সকল বাটী ছিল, তাহা এক্ষণে গামলার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এখনকার লোক যাহা ভোজন করে, তাহা একান্ত অখাদ্য, তাহা খাইলে অতি বলবান্ লোকেরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস একান্ত দুর্ম্মূল্য; অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহা পায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই দূষিত—সমস্তই বিষতুল্য। সুতরাং কি প্রকারে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে? কি প্রকারে আমাদের বলাধান হইবে? এই ভাবে আর কিছু দিন চলিলে কি আমাদের এককালে ধ্বংস হইবে না? যদি বলই না থাকিল, যদি শরীরই না থাকিল, যদি পরমায়ুর হ্রাস হইল, তবে সে অস্তিত্বে দুঃখভোগ ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে? এইরূপে বলবান্ হইয়া আমরা প্রবল পাশ্চাত্যগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আপন স্বত্ব রক্ষা করিব? পঞ্চাশ বৎসরেই যখন এই দুর্গতি,—এইরূপ বল, সাহস ও স্বাস্থ্যহীন হইয়াছি, তখন কালে আমাদের উচ্ছেদ ভিন্ন আর কি হইবে?

অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ধন বিষয়ে আমাদের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কেননা শতবর্ষ পূর্ব্বে আমাদের যে বাহ্য অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা আমাদের বাহ্য অবস্থা এক্ষণে অনেক ভাল বলিয়া বোধ হয়। সে সময়ে ইষ্টকালয় প্রায়ই ছিল না, অধিক লোকই পর্ণকুটীরে বাস করিতেন; সামান্য মাত্রই প্রায় বসিবার ও শুইবার আসন ছিল; সামান্য কাষ্ঠের সিন্দুক, মাটির প্রদীপ, লেপ, বালিশ, থাল, ঘটী, বাটী মাত্র গৃহোপকরণ ছিল; মোটা-

ধুতি পরিধেয়, খড়ম ও চটীজুতা পাদুকা, সূত্রনির্ম্মিত কাপড় মাত্র অধিকাংশ লোকের শীতবস্ত্র ছিল। শাঁখা, সিন্দুর, মোটাশাটী ও রৌপ্যা-লঙ্কারেই অধিকাংশ স্ত্রীলোকের বেশভূষা হইত। চিড়ে দইয়ের ফলারই সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট ফলার ছিল। পুত্রকন্যার শিক্ষার ব্যয়, চিকিৎসার ব্যয়, বিলাসাদির ব্যয়ও অতি সামান্য ছিল। সকল বিষয়েই তখন ব্যয় অতি অল্প ছিল, সমস্ত দ্রব্যই সস্তা ছিল; কিন্তু এইরূপ সামান্য ব্যয়ে সংসার চালাইয়াও অল্প লোকেরই অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিত। অধিকাংশ লোকের সম্পত্তি ছিল—গরু ও ধান্য। এক্ষণে দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ এক্ষণে অনেকের ইষ্টকনির্ম্মিত সুরম্য গৃহ হইয়াছে, অনেক গৃহই নানা উপকরণে সজ্জিত, বহুমূল্য বেশভূষায় অনেকেই সুসজ্জিত, হীরা-মুক্তা-খচিত স্বর্ণালঙ্কার এক্ষণে ঘরে ঘরে; কেবল অলঙ্কার নহে, বহুমূল্য নানা পরিচ্ছদে এক্ষণকার রমণীগণ ভূষিত; চিড়া দূরের কথা, লুচিরও এক্ষণে আদর নাই। পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা প্রভৃতি ভিন্ন এখন ভোজ দেওয়া যায় না। পুত্রগণের শিক্ষার জন্য এক্ষণে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইতেছে, কন্যার বিবাহে অনেকেই পাঁচ সাত হাজার টাকা ও বহুতর মূল্যবান্ অলঙ্কার বস্ত্র ও নানাবিধ দ্রব্য উপহার বা পণ দিতেছেন; চিকিৎসার জন্য, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যও অনেকে সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। উপাধি আদি লইবার জন্যও অনেককে বহু ব্যয় করিতে হয়। গন্ধদ্রব্য, সাবান, ঘড়ি, চেন, হীরকাঙ্গুরীয়, সোণা রূপার বোতাম প্রভৃতি বিলাসদ্রব্যে যে কত ব্যয়, তাহার নিরাকরণ নাই; তদ্ভিন্ন মাদক দ্রব্য সেবন, অভিনয় দর্শন, বেশ্যা পালন প্রভৃতিতেও যথেষ্ট ব্যয় হয়। এইরূপ অযচ্ছল ব্যয় করিয়াও সকলে কপর্দ্দকশূন্য হয়েন না; প্রত্যুত কেহ কেহ বহু-তর সম্পত্তি ক্রয় করেন, কোম্পানীর কাগজ করেন। পূর্ব্বে ভূম্যধি-কারী ও বণিকেরাই একমাত্র ধনী ছিলেন, মধ্যশ্রেণীর মধ্যে তাদৃশ

আয়সম্পন্ন লোক অত্যন্ত বিরল ছিল; এক্ষণে মধ্যশ্রেণীর অনেকেই প্রভূত আয়বান্। পূর্ব্বে যাঁহার বার্ষিক তিন শত টাকা আয় ছিল, তিনি সম্পন্নমধ্যে গণনীয় হইতেন; এক্ষণে অনেক কেরাণীই দুই শত আড়াই শত টাকা মাসিক বেতন পান, হাজার বার শত টাকা মাসিক বেতনও অনেক কর্ম্মচারী পাইয়া থাকেন, কেহ কেহ তিন চারি হাজার টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন, অনেক উকীল ব্যারিষ্টার ও ডাক্তারের আয় বার্ষিক লক্ষ টাকারও অধিক; মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে এখন কাহারও কাহারও আয় বড় বড় জমীদারের অপেক্ষাও অধিক। সুতরাং কে না বলিবে এক্ষণে বঙ্গের ধন বৃদ্ধি হইয়াছে? কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, এ ধনবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি নহে। নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বে প্রদীপের আলোকের যেরূপ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়, আমাদের এই ধনবৃদ্ধি সেইরূপ নির্ধন হইবারই পূর্ব্বাবস্থা-প্রকাশক। কেননা আমাদের এই যে ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, সে দেশের ধনবৃদ্ধিজন্য নহে, ধনক্ষয়েরই জন্য। বিদেশীয়গণ ভারতের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের সেই লুণ্ঠনকার্য্যে সহায়তা করিতেছি বলিয়া আমরা তাহারই কিছু অংশ পাইতেছি মাত্র। রেসমকর, নীলকর, চাকরগণ দেশের অর্থ শোষণ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের দেওয়ান, আমীন, পাইক প্রভৃতি হইয়া সেই কার্য্যের সহায়তা করিতেছি। দেশীয় উৎপীড়িত দরিদ্রগণকে আরও উৎপীড়িত করিতেছি, তাহারই অংশস্বরূপ কিঞ্চিৎ বেতন পাইতেছি। বিদেশীয় বণিক্ সম্প্রদায় বিদেশীয় অকর্ম্মণ্য বিলাসদ্রব্য আমদানী ও দেশীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের রপ্তানী করিয়া ভারতের অর্থ শোষণ করিতেছেন, আমরা কেহ মুচ্ছুদ্দি, কেহ সদরমেট, কেহ দালাল, কেহ সওদাগর হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করিতেছি, তাই তাহার কিছু অংশ পাইতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে মুচ্ছুদ্দিরাই দেশের প্রধান ধনী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁহারা বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের

উপর কেহ শতকরা এক টাকা, কেহ দুই টাকা মাত্র পাইতেন; তাহাতেই তাঁহারা মহাধনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এইরূপে যত বাণিজ্য, সমস্তই বিদেশীয়গণের হাতে। ভারতব্যাপী রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, ষ্টীমার, সমস্তই তাঁহাদের হাতে; কল কারখানা যাহা কিছু হইয়াছে, তৎসমস্তই তাঁহাদের। পূর্ত্তকার্য্য সমস্তই তাঁহাদের হাতে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতির খনি তাঁহাদের হাতে; অধিক কি, অভ্র কয়লা প্রভৃতির খনিরও অধিকাংশই তাঁহাদের। ভারত আজি তাঁহাদের আফিসে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের আফিস যত বাড়িতেছে, ততই অধিক দেশীয় ধন বিদেশে যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও আনন্দ বাড়িতেছে। আফিসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চাকুরী বাড়িতেছে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছি; কিন্তু আমরা যে সামান্য অর্থের লোভে ভারতের সর্ব্বস্বাপহারীর সহায়তা করিতেছি, এ কথা কিছুমাত্র বুঝি না।

বিলাতী শিক্ষাই এক্ষণে আমাদের প্রধান শিক্ষা, সেই শিক্ষার উপযোগী বিলাতী পুস্তক বিক্রয় করিয়া বিদেশীয়গণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ২।১ খানি দেশীয় পুস্তক লিখিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ পাইতেছি বলিয়া আমাদের বুক ফুলিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কেহ ভাবেন না যে, যত টাকার ইংরাজী পুস্তক এদেশে বিক্রয় হয়, তাহার শতাংশও দেশীয় লোকের পুস্তক বিক্রয় হয় না। বিলাতী ঔষধে দেশ ভরিয়া গিয়াছে; সাহেব ডাক্তার প্রভৃত বেতন ও ফি গ্রহণ করেন, আমরা সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু ফি লইয়া ও তাঁহাদের ঔষধ বিক্রয় করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ লাভ পাইয়া বড়-মানুষ হইতেছি, আর বাহু তুলিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

পূর্ব্বে এ দেশে মোকর্দ্দমার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল, ভূম্যধিকারিগণই প্রজাগণের বিবাদ নিষ্পন্ন করিয়া দিতেন, এবং অনেক মোকর্দ্দমা সালিসিতে মীমাংসিত হইত; সুতরাং কেহ মোকর্দ্দমা করিয়া সর্ব্ব-

স্বান্ত হইত না। ইংরাজরাজ সে প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রজাগণের অর্থে প্রজাগণের সুবিধার জন্য আদালতের সৃষ্টি করিলেন। অনেক হাকিম, ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্নী ও মোক্তারের সৃষ্টি হইল, অনেক আম-লার প্রয়োজন হইল, উচ্চ বেতনের পদগুলি সাহেবেরা লইলেন, অব-শিষ্টগুলি পাইয়া আমরা লাভবান্ হইলাম। বিলাতী ব্যারিষ্টার-গণ লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া গেলেও আমাদের উকিল মোক্তা-রেরাও কম পান না। এক্ষণে উকিল-শ্রেণীই প্রধান সম্প্রদায়। হাই-কোর্টের উকিল ও এটর্নীগণই মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন; জেলার উকিল-গণেরও প্রসার অল্প নহে। আইন বিভাগেই আয় অধিক। কিন্তু ইহাতে দেশের কি দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। দেশের যাবতীয় জমীদার গৃহবিবাদে এককালে অবসন্ন হইয়াছেন। ঘরে ঘরে মকর্দ্দমা; কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই মকর্দ্দমা লইয়া ব্যস্ত। মকর্দ্দমায় সকলেই সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। কাহারও সহিত কাহারই সদ্ভাব নাই; এই উপলক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য, জাল, জুয়াচুরি যে কত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। চিরনিরীহ ধর্ম্মপরায়ণ ভারতবাসী এই মকর্দ্দমা ব্যাপারে এমন ধর্ম্মহীন, এমন কুকর্ম্মানুরাগী, ও এমন স্বজাতিবিদ্রোহী হইয়াছেন যে, মনে করিলে মানব নামে ঘৃণা হয়। ধন, প্রাণ, ধর্ম্ম, শক্তি, সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ ছিল, হৃদয়ের সহিত পরস্পর পরস্পরের হিতসাধন করিতেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরের বিষম শত্রু। ফলতঃ গৃহযুদ্ধে দেশের যে অনিষ্ট না হয়, এই মকর্দ্দমা-প্রিয়তায় তদপেক্ষা অনেক অধিক অনিষ্ট হইতেছে।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর স্বাধীন ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহা-রাও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। তাঁহারা করেন কি? বিদেশীয়গণ যে সকল শিল্পজাত এদেশে বিক্রয় করিয়া এদেশের অর্থ অপহরণ মানসে আফিস করেন, ইহারা সেই সকল আফিস হইতে

বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া কিছু লাভ রাখিয়া বিক্রয় করেন,—বিদেশীয় দ্রব্য সকল সাধারণ্যে প্রচার করেন—দেশী ধন লুণ্ঠনের সাহায্য করেন। কিঞ্চিৎ লাভের লোভে বিদেশীয় দ্রব্যে ভারত ছাইয়া ফেলেন, ও আপনাদিগকে স্বাধীন ব্যবসায়ী মনে করিয়া গর্ব্বিত হয়েন। তাঁহারা কেমন স্বাধীন!!! যাঁহারা চাকরী করেন, তাঁহারা এক মনিবেরই অধীন, চাকরকে একজনের মাত্র মুখাপেক্ষা করিতে হয়, একজনের তোষামোদ করিলেই চাকরের চলে; এই স্বাধীন ব্যবসায়িগণের শত শত মনিব, ইঁহাদিগকে শত শত জনের মুখাপেক্ষা ও তোষামোদ করিতে হয়। কারণ ইঁহারা যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব কিছুই নাই; কি করিলে দ্রব্য ভাল হইবে, কি করিলে দ্রব্য সস্তা হইবে, তাহা তাঁহাদের ক্ষমতাধীন নয়; আফিস হইতে আনিয়া কিছু লাভ রাখিয়া বিক্রয় করাই তাঁহাদের কার্য্য। সুতরাং সকল দোকানেই সমান দরে একইপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়; আমার দ্রব্য ভাল বা সস্তা এ কথা কেহ বলিতে পারেন না, সুতরাং তোষামোদ ভিন্ন ক্রেতাকে তুষ্ট করিবার আর কোন উপায়ই নাই। কাযেই ক্রেতা যেরূপ আচরণই করুন—রূঢ় বাক্য বলুন, অবিশ্বাস করুন, তাগাদায় টাকা না দিন, সকলই অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হয়। নচেৎ তিনি অন্য দোকানে যাইবেন। এইরূপে শত প্রভুর উপাসনা করিয়া দেশের অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া স্বাধীন ব্যবসায়ীর দল আপনাদিগকে স্বাধীন মনে করেন। যাঁহারা চাকরী করেন, তাঁহাদের একটা সময় বাঁধা আছে, এই স্বাধীন ব্যবসায়ীদিগের তাহাও নাই; ইঁহাদের তিলমাত্র বিশ্রাম নাই—পাছে ক্রেতা অন্য দোকানে যায়, সেই ভয়ে ইঁহাদিগকে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দোকানে উপস্থিত থাকিতে হয়; কেবল বসিয়াই থাকিতে হয়, কেননা অধিকাংশ দোকানেই বিক্রয় অতি অল্পই হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত

হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। বিক্রয় হউক না হউক, ক্রেতৃগণকে দ্রব্যসকল দেখাইতে হয়, ও নিজের দ্রব্যের প্রশংসাসূচক ও ক্রেতার মনো-রঞ্জনকর নানাপ্রকার বাক্যব্যয় করিতে হয়। এইরূপ স্বাধীন ব্যবসায়ীর-দলে এক্ষণে দেশ পরিপূর্ণ। সমস্ত গ্রাম নগর এই স্বাধীন ব্যবসায়ীতে পরিপূর্ণ। বিদেশীয় বস্ত্র, কাগজ, কলম, খেলনা, ঔষধ, জুতা, গন্ধদ্রব্য, বিলাসদ্রব্য, কত নাম করিব, সহস্র সহস্র বিদেশীয় দ্রব্যের দ্বারা ইঁহারা ভারত-ভূমি সমাচ্ছন্ন করিতেছেন। এই সকল দোকানে দেশীয় দ্রব্য কিছুই থাকে না। কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্য ব্যতিরেকে এদেশের কোন দ্রব্যই কোন দোকানে বিক্রয় হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কি স্বাধীন ব্যবসায়ী, কি বেতনভোগী, সকলেই দেশের অর্থ বিদেশে পাঠাইবার সহায়তা করিয়া ধন উপার্জ্জন করেন। বিদেশে যাহা পাঠান, তাহার তুলনায় তাঁহাদের উপার্জ্জন নিতান্তই অল্প। সুতরাং এরূপ আয়বৃদ্ধি দ্বারা দেশের ধননাশ হইতেছে না বলিয়া, ধন বৃদ্ধি হইতেছে বলিব কি প্রকারে? যাঁহারা দেশীয় দ্রব্যের ব্যবসা করেন, তাঁহাদের অনেকে প্রয়ো-জনীয় তণ্ডুলাদি বিদেশে পাঠাইবারই সহায়তা করেন। অকর্ম্মণ্য পাট প্রভৃতির ব্যবসায় যাঁহারা করেন, তাঁহাদের প্রতারণাই প্রধান সম্বল। কিনিবার সময়ে ওজন কম করিয়া এবং বিক্রয় করিবার সময় খা'দ ও জল মিশাইয়া যে লাভ করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের প্রাপ্য। প্রতারণা না করিলে এ দলের ব্যবসায়ে কিছুই থাকে না।

কৃষি আমাদের দেশের প্রধান জীবনোপায়; পূর্ব্বে অনেক ভদ্র গৃহস্থ কৃষি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এক্ষণে অনেকেরই সে বৃত্তি লোপ হইয়াছে। এক্ষণে উহা মজুরেরই বৃত্তি হইয়াছে। কারণ দিন দিন ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি কমিয়া যাইতেছে; যে সামান্য শস্য জন্মে, তাহাতে ব্যয় সংকুলান হয় না। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় সেই যৎকিঞ্চিৎ শস্য বিক্রয় করিয়া শ্রমজীবী শ্রেণীর বেতন মাত্র উঠে। যাঁহারা

স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে না পারেন, তাঁহাদের কিছুই থাকে না, নানা দৈব বিঘ্নবশতঃ তাঁহাদিগকে অনেক সময় সমূহ ক্ষতিই সহ্য করিতে হয়। কল-কারখানা, রেলওয়ে প্রভৃতির প্রাচুর্য্য বশতঃ মজুরের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে, কাযেই এক্ষণে মজুরের মূল্য বাড়িয়াছে। ভাল গরু এখন মিলেই না বলিলে হয়; যাহা পাওয়া যায়, তাহারও মূল্য অনেক। এই সকল কারণে ভদ্র-বংশীয় জনগণের কৃষিকার্য্যে কিছুমাত্র আয় হয় না। যাহা কিছু হয়, তাহাতে গরুর খোরাক ও মজুরের বেতনই পোষায় না। অর্থাভাবে বড় বড় কৃষিক্ষেত্র করিবার শক্তি প্রায় কাহারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই; সে সকল সাহেবদিগেরই একচেটিয়া, এবং তাঁহাদের যে তাহাতে লাভ হয়, সে কেবল শ্রমজীবিগণের উপর অত্যাচার করিয়া। নিম্নশ্রেণীর জনগণ যে কৃষিকার্য্যের অবলম্বনে যে কোন প্রকারে জীবনোপায় সংগ্রহ করিতেছেন, সে কেবল দেশের অনিষ্ট করিয়া। পাটের চাষই এখন কৃষকগণের প্রধান অবলম্বন। পাটের চাষ করিয়া কিছু পাওয়া যায়, সেই লোভে কৃষকগণ সমস্ত চেষ্টা পাটের চাষেই ব্যয় করে, ধান্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে সেরূপ মনোযোগ নাই। তাহার ফলে আহারীয় দ্রব্য দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে, ও পাট পচানিতে পানীয় জল একান্ত অব্যবহার্য্য হইতেছে। দুর্গন্ধে বায়ু পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে। সহরবাসী যদি এই পাট পচানির সময় একবার পল্লীগ্রাম দর্শন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের কি সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এ সময়ে যদি তাঁহারা এক দিন পল্লীগ্রামে বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিষ্ণুতায় প্রশংসা করিব। সে সময়ে পল্লীগ্রামে এমন একজন গৃহস্থ দেখিতে পাইবেন না, যাহার বাড়ীতে দুই চারিজন রোগশয্যায় শুইয়া নাই। অনেক গৃহস্থের এমন অবস্থা ঘটে যে, একটু জল দেয় এমন একজন লোক থাকে না। এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এক্ষণে আমাদের যে ধন বৃদ্ধি হইতেছে, সে

কেবল আপনাদেরই অনিষ্ট করিয়া। কেহ স্বদেশের ধন বিদেশে পাঠাইবার সাহায্য করিয়া কিছু পাইতেছেন, কেহ দেশীয়গণকে বিবাদপ্রিয় করিয়া কিছু পাইতেছেন, কেহ রোগে শোকে মহামারী ও দুর্ভিক্ষাদিতে দেশ উৎসন্ন দিবার সহায়তা করিয়া কিছু পাইতেছেন, ও কেহ মনুষ্যত্বে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া কিছু পাইতেছেন।

এ ঘৃণিত পথও আমাদের যে আর অধিক দিন থাকিবে না, এক্ষণেই তাহার বিলক্ষণ সূত্রপাত হইয়াছে। পূর্ব্বে সামান্য ইংরাজি শিখিলেই দুইশত টাকা বেতনের চাকরী পাইত, এক্ষণে বি, এ, পাস করিয়া পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গ ভিন্ন ভারতের আর কোন দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সেরূপ প্রসার হয় নাই, মুসলমান ও ফিরিঙ্গি-গণ বঙ্গবাসীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিতেন না, সেইজন্য বাঙ্গালীই অধিকাংশ চাকরী পাইতেন; এখন আর তাহা হয় না, এক্ষণে সমগ্র ভারত-বাসী হিন্দু মুসলমান ও ফিরিঙ্গি সেই চাকরী ভাগ করিয়া লইতেছেন। ফিরিঙ্গির অংশে এক্ষণে অধিক পড়িবার ব্যবস্থা হইতেছে, অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনের পদগুলি ফিরিঙ্গির অংশেই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে সকল লোকে চাকরীর চেষ্টা করিত না, শিল্পাদির সাহায্যে অনেকে উপার্জ্জন করিত; এক্ষণে দিন দিনই লোকের সে পথ রোধ হইতেছে, বিদেশীয় শিল্পে দেশ পূর্ণ হইয়াছে, ভারতীয় শিল্পের আর কিছুমাত্র আদর নাই। কাযেই বৃত্তি-অভাবে সকলেই এখন চাকরী ও পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাধীন ব্যবসার অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছেন। এত চাকরী কোথায় পাওয়া যাইবে? এত দোকানই বা চলিবে কি প্রকারে? প্রার্থী অধিক হওয়ায় চাকরীর বেতন কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং ব্যবসায়েও আর লাভ নাই, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও এক্ষণে আর লোকে আহার সংস্থান করিতে পারে না। ধনাভাবে শক্তি সামর্থ্য তেজ সকলই যাইতেছে। 'দারিদ্র্যদোষো গুণ-

রাশিনাশী'। কাযেই মানব দিন দিন স্বার্থপর হইতেছে, জাল জুয়াচুরী করিতে শিখিতেছে। আর কিছু দিন এইভাবে চলিলে যে আহার পর্য্যন্ত জুটিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পঞ্চাশ বৎসরে যেরূপ অধঃ-পতন হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে আর পঞ্চাশ বৎসরে যে আমা-দের কিছুই থাকিবে না, তাহা বুঝা যাইতেছে না কি? এইরূপে চলিলে পঞ্চাশ বৎসর পরে ভদ্রবংশের এককালীন লোপ হইবে। অল্প বেতনে চাকুরী, যৎকিঞ্চিৎ আয়ের দোকানদারী ও কৃষিকার্য্য দ্বারা নিম্নশ্রেণীর জন-গণের কোন প্রকারে চলিলেও ভদ্রবংশীয়গণের চলিবার কোনও উপায়ই থাকিবে না। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর জনগণের এককালে লোপ হইবে। এখন যেমন ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে নিম্নশ্রেণীর জনগণের ধ্বংস হই-তেছে, পরে ভদ্রবংশীয়গণ সেইরূপ তাহার কোপে পড়িবেন, সোণার ভারত অনার্য্যে পরিপূর্ণ হইবে। ফলতঃ শারীরিক বলের ন্যায় ধনও আমাদের দিন দিন অল্প হইতেছে।

জ্ঞান বিষয়েও ঐরূপ। জ্ঞানের আলোচনা আমাদের নাই বলি-লেই হয়, যে বিজ্ঞান সভ্য জগতের পরম বিদ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত, যে বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জাতীয়গণের এবংবিধ উন্নতির কারণ বলিয়া স্বীকৃত, সে বিজ্ঞানের ধারও আমরা ধারি না। যে জ্ঞান মানুষকে মানুষ করে, যে জ্ঞান মানুষকে ইহকালে সুখী করে, যে জ্ঞান পরকালের মঙ্গলজনক, সে জ্ঞানেরও আলোচনা আমাদের নাই। চাকরী করিবার জন্য যে বিদ্যার আবশ্যকতা, কেবল সেই বিদ্যামাত্রই আমরা শিক্ষা করি। জাতিনির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে সকলেই ঐ একইপ্রকার বিদ্যা শিখিয়া থাকেন। তাহাতেও আমরা পরিপক্ক হইতে পারিতেছি না। পরীক্ষা-প্রণালীর দোষে আমাদের কোনওরূপ শিক্ষাই ভাল হইতেছে না। পরীক্ষককে কি কৌশলে ফাঁকি দিতে পারা যাইবে, সেই শিক্ষাই হইতেছে মাত্র। ইহার নাম কি জ্ঞানোন্নতি? বিদেশীয় ভাষা,

বিদেশীয় রীতি নীতি ও চাকুরী করিবার উপযোগী শিক্ষা করিলেই কি জ্ঞানার্জ্জনের ফল হয়? এই শিক্ষাপ্রভাবে আমরা পাশ্চাত্যগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব?

অনেকে বলেন আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের সমূহ উন্নতি হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশে সেরূপ হয় নাই বলিয়া অনেকে আপনাদের বড়াই করেন। আমাদের বোধ হয় যাঁহারা এরূপ বড়াই করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমরা বর্ব্বরবংশসম্ভূত নহি; আমাদের পূর্ব্বপুরুষ নাগা, ভীল, কাফ্রি প্রভৃতির ন্যায় নহেন। যদি সেরূপ হইতাম, তাহা হইলে আমরা এ কথা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারিতাম; কিন্তু যে দেশে কাশ্মীরী শাল, ঢাকাই মসলিন, স্বর্ণাদিখচিত নানাবর্ণের সুন্দর বসন প্রস্তুত হয়, সে দেশের কেহ যদি বিলাতী কম্বল বুনিতে শেখেন, তিনি কি বলিতে পারেন, আমি দেশীয় শিল্পের সমূহ উন্নতি করিয়াছি? আমাদের এ বড়াই কি সেইরূপ নহে? স্বীকার করিলাম, আমাদের বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে; স্বীকার করিলাম, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের যাহা ছিল, তাহার তুলনায় এ কি উন্নতি? না, ঘোর অবনতি? জগন্নাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার ভগ্ন ও চূর্ণীভূত কিছু কিছু উপাদান লইয়া কোন প্রকারে সাজাইয়া আমরা বলিতেছি, দেখ আমরা কেমন সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমরা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুন্দর সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া তাহার কতকগুলি বিকৃত শব্দের সহিত নানা বিকৃত ও বিভিন্ন ভাষা-মিশ্রিত করিয়া কথোপকথনের ভাষার একটু উন্নতি করিয়া ভাষার উন্নতি করিয়াছি বলিতেছি। যদি বাস্তবিকই স্বীকার করা যায় যে, এরূপ ভাষার এক্ষণে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা হইলেও এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ভাষার উন্নতি হইয়াছে। ইহাই

বলিতে হইবে যে, আমরা উন্নত ভাষা ত্যাগ করিয়া নিতান্ত অবনত ভাষার আশ্রয় লইয়াছি। হীরা ত্যাগ করিয়া কাচ লইতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা সংস্কৃত। কারণ সাহিত্যের ভাষা চিরকাল সংস্কৃতই ছিল। বাঙ্গালা প্রভৃতি কেবল প্রদেশবিশেষের কথোপকথনের ভাষা মাত্র। সকল প্রদেশের শিক্ষিতগণ সংস্কৃতেরই আলোচনা করিতেন, সংস্কৃতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন, আমরা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বহুজ্ঞানগর্ভগ্রন্থপূর্ণ জাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক কথোপকথনের ভাষায় দুই চারি খানি গ্রন্থ লিখিয়া বলিতেছি, আমরা ভাষার উন্নতি করিয়াছি। ইহার ফলে হইয়াছে এই যে, আমরা সকল স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে ইংরাজি ভাষার অবলম্বনে আমরা হিন্দুস্থান, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের ভ্রাতৃগণের সহিত আলাপ করিতে পারিতেছি; কিন্তু যদি ইংরাজ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন আর আমাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুমাত্র আলাপের উপায় থাকিবে না। সুতরাং বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার এবংবিধ উন্নতি যে আমাদের মহা-অনিষ্টের কারণ, তাহাতে আর কথা কি? যদি বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষার এরূপ উন্নতি না হইত, তাহা হইলে সকল দেশের জনগণই পূর্ব্ববৎ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। তাহাতে যদি সংস্কৃতের উন্নতি নাও হইত, তাহা হইলেও এক্ষণকার অপেক্ষা তাহাতে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল; কারণ তাহা হইলে সমগ্র ভারতবাসী একভাষী থাকিতাম, পরস্পর পরস্পরকে মনোভাব জানাইতে পারিতাম, যে প্রদেশবাসী যে কোন সাহিত্য প্রণয়ন করিতেন সকলেই তাহার রসাস্বাদন করিতে পারিতাম, পরস্পরের জ্ঞান পরস্পরে সঞ্চারিত হইত, এবং ইংরাজি ভাষায় ভাল গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহার যেমন লক্ষ লক্ষ গ্রাহক হয় আমাদেরও সেইরূপ হইত। বাঙ্গালা ভাষা অতি সঙ্কীর্ণস্থানব্যাপী বলিয়া এক্ষণে আমাদের কোন ভাল গ্রন্থই বিক্রয় হয় না, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি যে আমাদের উন্নতি নহে, অবনতি, এবিষয় সাহিত্যসংহিতা

নামক মাসিক পত্রিকায় 'জাতীয় ভাষা' নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

সাহিত্যের উন্নতিও আমাদের ঐরূপ। সাহিত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া যায়, প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায়, এরূপ পুস্তক বাঙ্গালায় কয় খানি আছে? বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম্মকথা আলোচনার উপযোগী কিছুই ত দেখি না, কেবল কতকগুলি অসার পদ্য ও উপন্যাসে আমাদের সাহিত্য পরিপূর্ণ। সে সকল পড়িয়া বালক বালিকা, যুবক যুবতী, এমন কি, বৃদ্ধ বৃদ্ধারও পাপ প্রলোভন বৃদ্ধি হয়। প্রেমই সমস্ত কবিতার, সমস্ত উপন্যাসের সার কথা। সেই সকল পাঠ করিয়া দেশীয় আপামর সাধারণ জনগণ বুঝিয়াছে, প্রেমই এ জগতের সার পদার্থ। ঈশ্বরপ্রেম নয়, পিতৃমাতৃপ্রেম নয়, স্বজাতিপ্রেম নয়, দাম্পত্যপ্রেম নয়, যুবকযুবতীর উচ্ছৃঙ্খল প্রেম—রূপজ প্রেম, পূর্ব্বরাগজনিত প্রেম—যাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, যাহাকে দেখিয়া মদন-শাসনের অধীন হইতে হইয়াছে, সেইরূপ যুবকযুবতীর প্রেম। এই প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য মানব যতই পশুভাবাপন্ন হইবে, যতই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবে, যতই উন্মাদ হইবে, তাহার ততই প্রশংসা। ইহার জন্য যিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, সমাজ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রেমপাত্রকে লইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনিই প্রশংসার্হ। যদি সে প্রেমে বাধা পড়ে, তাহা হইলে প্রেমিক সেই প্রেমের খাতিরে পিতা মাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, জগতের সমস্ত কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া, জীবনের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া আত্মহত্যা করেন, অথবা যাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করেন। জীবন থাকিতে কোনও মতে তাহাকে অন্যের অঙ্কশায়িনী হইতে দেওয়া হইবে না। এইরূপ প্রেমের নাম বিশুদ্ধ প্রেম হইয়াছে, ও এইরূপ বিশুদ্ধপ্রেমপূর্ণ নাটক নবেলাদিতে আমাদের সাহিত্য পূর্ণ বলিলেই হয়। এই জাতীয় প্রেমকে বিশুদ্ধ প্রেম বলা যায় কিপ্রকারে, তাহা কেহ ভাবেন না। যখন দৈহিক মিলন না

হইলে, এ প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না, যখন মদনই এ প্রেমের ঘটক, তখন ইহা বিশুদ্ধ প্রেম হইলে, অবিশুদ্ধ প্রেম কাহাকে বলিব? যদি বুঝিতাম মদনব্যাপার ইহার মধ্যে কিছুই নাই, যাহাকে ভাল বাসিয়াছি তাহার মঙ্গলকামনামাত্রই উদ্দেশ্য, তাহা হইলে ইহাকে বিশুদ্ধ প্রেম বলা যাইতে পারিত। তাহা হইলে বিবাহ এ প্রেমের উদ্দেশ্য হইত না। অন্যের সহিত বিবাহ হইলেও ভ্রাতা ভগিনীকে যেমন চিরকাল ভালবাসা যায়, এ প্রেম যদি বিশুদ্ধ হইত, তাহা হইলে অন্যের সহিত প্রেমপাত্রের বিবাহ হইলে, সেইরূপ চিরকাল ভালবাসা যাইত। কিন্তু যখন বিবাহ না হইলে প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না, তখন তাহাকে মদনজ না বলিয়া কিপ্রকারে বিশুদ্ধ প্রেম বলিব?

এই জাতীয় প্রেম পাশ্চাত্যজাতির কিছু প্রয়োজনীয় বটে, কেননা তাঁহাদের আজীবন বিবাহবন্ধন নাই, বিবাহ বলিতে যে ধর্ম্মসম্মিলন এ সংস্কার তাঁহাদের নাই, তাঁহারা জানেন উহা সামাজিক ব্যাপার মাত্র, রাজার শাসনমাত্র, চুক্তিবিশেষ মাত্র। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিলে পরকালে যে কোনরূপ অসদগতি হয়, এ বিশ্বাস তাঁহাদের নাই। সুতরাং দম্পতীর মধ্যে পরস্পরের প্রণয় না হইলে অন্য কোন উপায়ে দাম্পত্যবন্ধন দৃঢ় হয় না। প্রেম, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগই পরস্পরের দাম্পত্যভাবে মিলিত হইয়া থাকার একমাত্র উপায়। ভালবাসা না জন্মিলে কেহ এক জনকে লইয়া চিরকাল থাকে না। এইজন্য বিলাতে এইরূপ প্রেমের প্রয়োজন, এবং ইহাকে তথায় বিশুদ্ধ প্রেমও বলা যায়। আমাদের ত সেরূপ প্রয়োজন নাই। আমাদের দাম্পত্য অনুরাগ যে প্রাকৃতিকের ন্যায় চিরকালের জন্য দৃঢ়বদ্ধ। সুতরাং বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য পূর্ব্বরাগের কোন প্রয়োজন নাই। প্রত্যুত বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের যুবক যুবতীগণের প্রেম হইলে, বড়ই অশান্তির কারণ হয়। কারণ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে যে, সে পাত্রপাত্রীর মিলন হইতে পারে না। কাযেই প্রায় ই

লোকের প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হইতে পারে না, সেজন্য চিরদিন দুঃখই পায়। যাঁহাদের কাহারও সহিত প্রেম জন্মে নাই, তাঁহারাও এই সকল নবেল পড়িয়া বিবাহিত পতিপত্নীকে ভালবাসিতে চাহেন না। মনে করেন পূর্ব্বানুরাগ না হইলে যেন প্রেম হইতেই পারে না। এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া এক্ষণে অনেক বিবাহিত যুবকযুবতী পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতে শিখিতেছে, পিতামাতা এই প্রেমে বাধা দেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হইতেছে, সমাজ ইহার প্রতিকূল বলিয়া সমাজদ্রোহী হইতেছে, জাতিভেদপ্রথা, অন্তঃপুরপ্রথা ও ধর্ম্মশাস্ত্র ইহার বিরোধী বলিয়া সে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতেছে। নভেল পড়িয়া প্রেমের এমন বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, এক্ষণে বালক বালিকাগণকেও আর এক সঙ্গে থাকিতে বা খেলিতে দেওয়া উচিত নহে। কেননা বালক বালিকারা যাহাদের সহিত ক্রীড়াদি করে, তাহাদের মধ্যে কাহারও না কাহারও সঙ্গে অধিক ভালবাসা জন্মে। পরে যদি তাহাদের যৌবনোদয়ে আলাপাদির সুবিধা হয়, তাহা হইলে বিবাহ হইয়া গেলেও সেই বাল্যকালের বিশুদ্ধ ভালবাসা মদনব্যাপারে পরিণত হয়; চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পুস্তক পাঠে এই ভাবের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বাল্যকালে বরকন্যা সাজা, ফুলের মালায় পরস্পরকে সাজান, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাইয়া গল্প করা প্রভৃতি বাল্যভাব সকল শৈবলিনীর কথার ন্যায় প্রেমের কথা মনে করিয়া, সেই খেলার সাথীকে প্রেমময় ভাবে দেখিতে থাকে, ও ঐ ভাবে পদ্য লিখিতে লিখিতে তন্ময় হইয়া পড়ে। এই জাতীয় নাটক নভেলে আমাদের বঙ্গসাহিত্য পূর্ণ বলিলে হয়। অন্ততঃ সাধারণ যুবক যুবতীগণ কেবল এই জাতীয় সাহিত্য পাঠেই জীবন অতিবাহিত করেন। এতদ্ভিন্ন আধুনিক নাটক নভেলে হত্যা, প্রতারণা, আত্মহত্যা প্রভৃতি পাশবাচারের বর্ণনা যথেষ্ট আছে, এই সকল পড়িয়া কেবল পাপ প্রবৃত্তিরই বৃদ্ধি হইতেছে। সাহিত্য আলোচনা এক্ষণে শিক্ষার জন্য নহে, আমোদেরই জন্য। এই আমোদে মত্ত হইয়া স্ত্রীপুরুষ সকলেই

অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছেন। পড়িবার সময় এত নিবিষ্টচিত্ত হয়েন যে, অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মও ভুলিয়া যান। সুতরাং এরূপ সাহিত্যের উন্নতিতে আমাদের লাভ না ক্ষতি?

আমাদের সাহিত্যের আর একটী উন্নতি এই যে, আমাদের সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা হইতেছে। সেই সকল পাঠ করিয়া আমরা জানিয়াছি, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত নহে, কৃষকের গানবিশেষ; পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত নহে, প্রাচীনও নহে, নিতান্ত আধুনিক; বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের কালই ভারতের উন্নতির কাল, ঐ সময়েই জ্ঞান, ধন, শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সকল বিষয়েই উন্নতি হইয়াছিল; অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্ম অতি অপকৃষ্ট, সেইজন্য যতদিন এ দেশীয়গণ হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, ততদিন ভারতের উন্নতি হয় নাই, পরে বৌদ্ধেরা উন্নতি করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে আবার অবনতি হইয়াছে; আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নিবাস ভারতভূমিতে নহে, কোন পবিত্র বংশেও আমাদের উদ্ভব নয়, তাঁহারা অন্যান্য জাতির ন্যায় ম্লেচ্ছই ছিলেন, অধিকন্তু দস্যুবিশেষ ছিলেন; তাঁহারা পাশব বলে নিরীহ ভারতবাসীকে এককালে বিধ্বস্ত ও তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পর্ব্বতাশ্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, এবং অনুগতগণকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাযেই শূদ্রগণ আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে স্বজাতি মনে করেন না, পরম শত্রু জিত জেতৃ জ্ঞানে অশ্রদ্ধা করেন। এই কুশিক্ষা বশতঃ শিক্ষিত কায়স্থেরও অনেকে ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করেন। এই সকল শিক্ষায় আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস, ঋষিগণে বিশ্বাস, ব্রাহ্মণে বিশ্বাস, আভিজাত্যগৌরব, আত্মগৌরব বসমস্তই নষ্ট হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে। স্বজাতির মধ্যে এরূপ অনৈক্য হইলে সে জাতির কি কখনও উন্নতি হয়?

সত্য বটে প্রত্নতত্ত্ব আলোচনা করিয়া প্রাচীনকালের কিছু

কিছু ইতিবৃত্ত ও কতকগুলি মহাত্মার জন্মস্থানকালাদির বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, কিন্তু সে সকলের এত প্রয়োজনীয়তা কি? জীবনচরিত ও ইতিহাস পাঠের এত কি প্রয়োজন? এই পৃথিবীতে অনন্তকাল যত শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সমগ্র জীবনচরিত মানুষকে পড়িতে হইবে, এই পৃথিবীতে অনন্তকাল যত ঘটনা ঘটিবে তৎসমস্তের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস মানবকে জানিতে হইবে, তাহার কারণ কি? সমস্ত পড়িতে পারিবেই বা কি প্রকারে? যদি এ যাবৎ কালের সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত জীবনচরিত থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে যে লক্ষ লক্ষ বৃহৎ জীবনচরিত, লক্ষ লক্ষ বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক পুস্তক প্রণীত হইত। যদি সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া মানব উহাই অধ্যয়ন করে, তাহা হইলেও কি সমগ্র জীবনে সমস্ত পড়িতে পারে? পরে যখন পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বৎসর হইবে, তখন উপায় কি হইবে? কে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িবে? আর এ সমস্ত জানিয়া লাভ কি? কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে জন্মিয়াছেন, কিরূপভাবে শিক্ষা পাইয়াছেন, কিরূপভাবে ক্রীড়া করিয়াছেন, কিপ্রকারে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা জানিলে কি আমরা তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারি? না, সেইরূপ করিলে সকলের সেইরূপ ফল লাভ হইতে পারে? রণজিৎসিংহ কিছুমাত্র লেখা পড়া না জানিয়াও অশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহার উদাহরণে আমরা কি লেখাপড়া ত্যাগ করিব? না, চৈতন্যদেব বাল্যকালে সকলেরই প্রতি অত্যাচার করিতেন, পিতা মাতার আজ্ঞা উপেক্ষা করিতেন বলিয়া ঐরূপ করিয়া ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা করিতে হইবে? বস্তুতঃ সকল বিষয়ের অনুকরণ সম্ভবে না, করিলেও তাহাতে মানব উন্নত হয় না। কোন মনুষ্যই এককালীন দোষশূন্য নহেন, সুতরাং যে মহাত্মারই জীবনঘটিত সমস্ত ঘটনার বিবরণ লিখিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের দোষের বিবরণও লিখিতে হয়; কাষেই সাধারণের নিকট সে দোষগুলি আর দোষ বলিয়া বিবেচিত হয় না। গুণের অনুকরণ

সহজ নহে, কিন্তু দোষের অনুকরণ সহজ। অনেকে দোষেরই অনুকরণ করে। মাইকেলের ন্যায় কবি হওয়া সহজ নহে, কিন্তু তাঁহার অনুকরণে মদ্যপায়ী সকলেই হইতে পারে। বিশেষতঃ কোনও ইতিহাসই সর্ব্বাংশে সত্য নহে, অধিকাংশ ইতিহাসই মিথ্যা ঘটনায় পরিপূর্ণ। গৃহের পার্শ্বে একটা ঘটনা ঘটিলে তাহারই প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই নানাজনে নানাপ্রকার বিবরণ প্রদান করেন। ইংরাজ-বুয়র যুদ্ধে ও রুষজাপান যুদ্ধের যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কয়টী সংবাদ সত্য? প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ে যখন এইরূপ, তখন পুরাকালের ইতিহাস যে কত সত্য, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। মিথ্যার আশ্রয়ে কখনও প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না। বস্তুতঃ অনাদি বা অনন্তকালব্যাপী সৃষ্টির ইতিহাস ও সৃষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনচরিত জানা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা দ্বারা আমাদের উন্নতির সম্ভাবনাও নাই। তবে মনুষ্যের শিক্ষার জন্য আদর্শ চরিত্র রক্ষা করা আবশ্যক বটে, তাই আমাদের পুরাণে কেবল সেই সকলই চিত্রিত হইয়াছে; স্থান কালাদির বিবরণ ও জীবনবৃত্তান্ত কিছুমাত্র নাই। কাল দেখিয়া গুণের পূজা করিতে হয় না। গীতা যদি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে উহা মূল মহাভারতের অন্তর্গত হউক বা প্রক্ষিপ্ত হউক, প্রাচীন কালের প্রণীত হউক বা আধুনিক গ্রন্থ হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না; উহাকে ভাল বলিতেই হইবে। বরং উহা ঈশ্বরমুখনির্গত বা ঋষিমুখনির্গত জানিলে তৎপরায়ণ হইতে লোকের অধিক আগ্রহ জন্মে। সুতরাং পাশ্চত্যপ্রণালীর ইতিহাস ও জীবনচরিতে আমাদের কোনও প্রয়োজন সাধিত হয় না, প্রত্যুত অনেক স্থলে অনিষ্টই হইয়া থাকে। আর এই যে পুরাতত্ত্বের আলোচনা, ইহাও আমাদের কৃত নহে। পাশ্চাত্যগণ যেরূপ গবেষণা করেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করি। কেহ বলেন আমাদের গীতা বাইবেলের অনুকরণ, রামায়ণ ইলিয়ডের নকল, জ্যোতিষ গ্রীকেরা শিখাইয়াছেন, ভাস্কর্য্য ফিনিশের নিকট

শিক্ষিত, আমাদের নিজের কিছুই নাই। আভিজাত্য ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে গৌরব থাকিলে উন্নতির যে আশা থাকে, আমাদের তাহাই নষ্ট হইতেছে; অতএব এই সকল বিষয়ে যদি দুই এক এক খানি গ্রন্থ আমাদের হইয়া থাকে, তাহাতে আমাদের সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে বলিতে পারা যায় না।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, শিক্ষার উপযোগী কিছুই আমাদের সাহিত্যে নাই। আমরা চিরকাল যে সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনায় বঙ্গসাহিত্য গোষ্পদের সমানও নহে। মহাভারত, রামায়ণ, তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত অশেষ শাস্ত্র, এবং কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি প্রণীত মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি যে দেশের সাহিত্য, সে দেশে এবংবিধ বাঙ্গালা সাহিত্য দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে বলিলে তাহার মত হাস্যাস্পদ আর কি হইতে পারে? যদি পশ্চাত্য বিজ্ঞানাদির ন্যায় কিছু আমাদের ভাষায় প্রণীত হইত, তাহা হইলেও আমাদের সাহিত্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিতে পারিতাম। কয়েক খানি পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন নিম্ন শ্রেণীর স্কুল-পাঠ্য ও কদর্য্য রুচিপূর্ণ নাটক নভেল মাত্র যে সাহিত্যের সম্পত্তি, সেই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া আমরা ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকগণের সহিত সমকক্ষতা করিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিব?

ধর্ম্মশিক্ষা ত আমাদের এককালে নাই, বিশ্বাস না থাকায় ধর্ম্মাচরণ এক্ষণে প্রয়োজনমধ্যেই গণ্য নয়। পাশ্চাত্য সমাজ যে নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক মনে করেন, আমাদের তাহাও নাই। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগ করিলে আমাদের নীতি থাকে না। অন্য ধর্ম্মপরায়ণ-গণের নীতিপরায়ণ হইলেই একরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া হয়, আমা-দের তাহা হয় না। কারণ অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় অনুষ্ঠানপদ্ধতি নাই, নীতিই তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ; সুতরাং যাঁহারা নীতিপরায়ণ, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসবান্ হইলেও কার্য্যে তাঁহারা

ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ। তাঁহাদের আহার বিহার বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, সমস্ত কার্য্যই রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়মের অন্তর্গত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র-অবিশ্বাসীরা তাহার প্রতিকূলাচরণ করেন না; প্রত্যুত রাজনিয়ম ও সামাজিক নিয়ম পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য, এ ধারণা তাঁহাদের মনে দৃঢ় অঙ্কিত থাকায়, তাঁহাদের জাতীয়তা, রীতিনীতি, সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকে। এইজন্য, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী হইলে কেহ তাহা বুঝিতেই পারে না। আমাদের অবস্থা ভিন্নরূপ। আমাদের নীতিশাস্ত্র ও জাতীয়তা সমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুরূপ। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের ও জাতীয়তার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। কাযেই ধর্ম্মশাস্ত্র ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নীতি, সমস্তই ত্যাগ করিতে হয়, স্বেচ্ছাচারই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হয়। যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বা স্বদেশীয় নীতির পরতন্ত্র, তাঁহাদিগকে মূর্খ ও অসভ্য জ্ঞানে ঘৃণা করিতে করিতে আত্মম্ভরিতারই বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহাদের কৃত নিন্দা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না; তাঁহাদের কৃত নিন্দা ও কুকুরের রব একই কথা মনে করি। এইরূপে পিতা, মাতা, গুরু, প্রতিবেশিবর্গ, সকলকেই মূর্খ ও অসভ্য জ্ঞানে অমান্য করি; কাযেই স্বজাতির প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। পাশ্চাত্য নীতিরও সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে পারি না; যে পাশ্চত্য রীতিগুলি আমাদের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তাহার অবলম্বনে আপাততঃ সুখ হয় দেখিয়া, সেইগুলিরই পরতন্ত্র হই; যে সকল মহৎ গুণের আশ্রয়ে পাশ্চাত্যগণ উন্নতি করিতেছেন, তাহার নিকটেও আমরা যাইতে পারি না। এইরূপে আমরা সম্পূর্ণভাবে সুনীতিহীন, ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছি। সংযম আমাদের হৃদয় হইতে এককালে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং কোন বিষয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মিলেও আমরা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না।

যত দূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল পাশ্চাত্যপথের

অনুসরণ করিয়া আমরা সর্ব্ব বিষয়েই অবনত হইয়াছি। বল, ধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সমস্তই হারাইয়াছি; তবে কিপ্রকারে এই পথের অনুসরণ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে? আমাদের ধর্ম্মের দোষে, আমাদের রীতি নীতির দোষে উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে, এ কথা আর এক্ষণে কাহারই বলিবার উপায় নাই। কারণ আমরা এখন ধর্ম্মশাস্ত্র মানি না। সন্ধ্যা, আহ্নিক, বার, ব্রত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে বাধায় উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে বলিতে পারা যায় না। জাতিবিচার নামমাত্র আছে, সকলেই হোটেলে খান, যাহা ইচ্ছা খান; সুতরাং সে বাধাতেও উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে বলা যায় না। একান্ন-বর্ত্তিতাও নামমাত্র আছে, এক্ষণে প্রায় সকলেই স্ব স্ব উপার্জ্জন নিজে ভোগ করেন, কুপোষ্যপালন কাহাকেও করিতে হয় না, বর্ণানুসারে বৃত্তিভাগও আর নাই; যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছে। সুতরাং এসকল বাধাতেও উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে বলিবার উপায় নাই। তবে প্রকাশ্যভাবে পরস্পরের অন্নভোজন ও পরস্পরের মধ্যে বিবাহ হইতেছে না বটে, কিন্তু তাহাও একেকালে বন্ধ নাই। ব্রাহ্ম খৃষ্টান প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট হইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের কি উন্নতি হইয়াছে? স্ত্রীস্বাধীনতা ও বিধবাবিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু স্ত্রী স্বাধীন হইয়া কি উন্নতি করিত? চাকরী করিয়া দশটাকা আনিত? পুরুষেরই যখন কুলাইতেছে না, তখন স্ত্রী চাকরী কোথায় পাইবে? আর বিধবার যে বিবাহ হয় না, তাহাতে কয়েকজন বিধবার পাশববৃত্তি চরিতার্থতারই ব্যাঘাত হইতেছে, দেশের উন্নতির কি বাধা তদ্দ্বারা হইতে পারে? বিধবাদের বিবাহ হইলে কি দেশের বল, ধন, জ্ঞান, ধর্ম্মের উন্নতি হইবে? কৈ ব্রাহ্ম খৃষ্টানাদির কি উন্নতি হইয়াছে? ফলতঃ এক্ষণে যে অবনতি হইতেছে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের দোষে হইতেছে বলিবার হেতুই নাই। অতএব যদি পাশ্চাত্যপথের অনুসরণ

করিলে উন্নতি হয়, তবে তাহা না হইয়া সর্ব্ববিষয়ে অবনতি হইতেছে কেন?

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই; তাই আমরা কিছু করিতে পারি না। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে। ঐক্য আমাদের সম্পূর্ণভাবেই আছে। যদি ঐক্য না থাকিবে, তবে আমরা সকলেই একযোগে স্বেচ্ছাচারী হইয়াছি কি প্রকারে? এককালে সকলেই বিলাতী সভ্যতাপরায়ণ হইয়াছি কেন? সকলেই বস্ত্র, বার্ডসাই, সাবান প্রভৃতি বিলাতী দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছি কেন? সহস্র লোকের মধ্যে একজন পলায়ন করিলে, সকলেই পলায়ন করি কেন? সকলেই স্বধর্ম্ম ও জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিতেছি কেন? যদিঐক্য না থাকিত, তাহা হইলে কথনই ইতর, ভদ্র, দরিদ্র, ধনী, মূর্খ, পণ্ডিত, সকলে এইরূপে একইপ্রকার আচরণ করিত না। অবশ্যই কিছু না কিছু ভিন্নভাবাপন্ন হইত। প্রকৃত কথা এই যে, যাহাদের যেমন জ্ঞান, যেমন প্রবৃত্তি, যেমন শক্তি, তাহারা সেইরূপে একমতে কার্য্য করে। যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সকলেই ধর্ম্মরক্ষার চেষ্টা করে। প্রাণপাত করিয়া উদ্দেশ্য সম্পাদনের চেষ্টা করে। আত্মরক্ষাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, পলায়ন করিয়া সেই আত্মরক্ষা করি। পলায়ন করিবার জন্য ত দল বাঁধিতে হয় না, বাধা দিবার জন্যই দল বাঁধিতে হয়; অর্থাৎ যেখানে সকলেরই উদ্দেশ্য বাধা দেওয়া, সেখানে সকলেই বাধা দিবার জন্য এক-ক্ষেত্রে মিলিত হয়। পলায়ন করিবার জন্য ত সেরূপ মিলিত হইতে হয় না, স্থান ত্যাগ করিলেই পলায়ন করা হয়; আমরা একবাক্যে সকলেই তাহা করি। কোন সাহেব আপনার অধীন কোন কেরাণীকে পদাঘাত করিলে, সে কেরাণী অম্লান বদনে সহ্য করেন। যদি কেহ অভিমান বশতঃ সে কার্য্য ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি সেই কার্য্যের প্রার্থী হয়েন। তাঁহার ভাগ্যে এইরূপ অপমান

ঘটিলে তখন কি করিবেন, এ সকল বিষয় কাহারও মনে উদিত হয় না। এ সকল বিষয়ে আমাদের সকলেরই ঐকমত্য আছে। বস্তুতঃ আমাদের যেমন উদ্দেশ্য, যেমন শক্তি, সেইরূপই একতা আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকায় অদৃষ্টে ও কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা নাই; কাযেই বর্ত্তমান সুখসাধনই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে। কি করিলে আমোদ প্রমোদ করিয়া সুখী হইব, ইহাই সকলের উদ্দেশ্য; সকলে একমতে তাহাই করেন। এখনও মধ্যে মধ্যে গাড়োয়ান, মেথর, বেহারা প্রভৃতিকে ধর্ম্মঘট করিতে দেখিতে পাই। কেননা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস আছে, অদৃষ্টে বিশ্বাস আছে; তাই ঈশ্বরের উপর, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অত্যাচারনিবারণ জন্য তাহারা অনায়াসে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় ত্যাগ করিয়াও একমতে বসিয়া থাকে; শক্তি আছে কি না বিবেচনাও করে না। ধর্ম্মরক্ষার জন্য ঐক্য অবলম্বন করে, তাই তাহার নাম ধর্ম্মঘট। যাহাদের ধর্ম্ম নাই, তাহাদের ধর্ম্মঘট হইবে কি প্রকারে?

পৌরুষের উপরই যাঁহারা নির্ভর করেন, তাঁহারা কি সাহসে শক্তি-সম্পন্নের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন? দুর্ব্বল বলবান্‌কে পারিবে কেন? ধনহীন ধনবান্‌কেই বা পারিবে কেন? যদি কোন বাঙ্গালী কোন অত্যাচারী গোরার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধান, তাহা হইলে তিনি হয় শমন-ভবনে যাইবেন, না হয় অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়া থাকিবেন। যদি দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া গোরাকে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হই-লেও মোকর্দ্দমার খরচে সকলকেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। হয় ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা কারাবদ্ধ হইতে হইবে। গোরারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া হয় ত গ্রাম শুদ্ধই লুণ্ঠন করিবে। এইরূপ দেখিয়া লোকে কি সাহসে আবার এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? ধর্ম্মে ও অদৃষ্টে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, শক্তি আদি আছে কি না ভাবে না; অদৃষ্টে যাহা

আছে, তাহাই হইবে ভাবিয়া কর্ত্তব্যসম্পাদনের চেষ্টা করে; কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর সহায় হইবেন, এ বিশ্বাসেও তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। যদি ঘরে অন্নসংস্থান থাকে, তাহা হইলেও লোকে 'মরিয়া' হইয়া সাহস করিতে পারে; কিন্তু ধন যে কিছুই নাই, মৃত্যু হইলে বা পড়িয়া থাকিলে, পরিজনবর্গের উপায় কি হইবে, এই ভাবিয়া যে সকলে ম্রিয়মাণ হয়েন, ও সমস্ত সাহসই বিনষ্ট হয়। তাঁহার পরিশ্রমের উপরই যে সমস্ত পরিবারবর্গের জীবন নির্ভর করিতেছে; তিনি উপার্জ্জন করিতে না পারিলে যে সকলেই আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে। যদি ধন থাকিত, তাহা হইলেও এরূপ হইতে পারিত না; কেননা যে ধন আছে, আপৎকালে সেই ধনে চলিবে, তাঁহার অভাবে সেই ধন দ্বারাই পরিজনবর্গ পালিত হইবে ভাবিয়াও লোকে 'মরিয়া' হইতে পারে। এখনও এমন অনেক লোক আছেন যে, তাঁহারা প্রাণের মায়া অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু পত্নী পুত্রাদি পরিজনবর্গের ভাবী দুর্দ্দশা ও অপমানের কথা মনে উদিত হইলে ম্রিয়মাণ হয়েন না, এরূপ লোক নিতান্ত বিরল। কাযেই ইচ্ছা না থাকিলেও অনেকে সহ্য করেন। সুতরাং অন্ততঃ যতদিন আমাদের বল ও ধন বৃদ্ধি না হয়, ততদিন আমাদের এরূপ বিবাদে প্রবৃত্তি জন্মিবার ও সেরূপ কার্য্যে একতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কর্ত্তব্যও নয়। কেননা উহা একপ্রকার আত্মহত্যা-বিশেষ। উদ্বন্ধনে, অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করার যে ফল, বলবান্ রাজজাতির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করারও সেই ফল; উভয়েরই ফল আত্মহত্যা মাত্র। সে আত্মহত্যার ফলে দেশের বা পরিবারের অমঙ্গল ভিন্ন কোন মঙ্গলেরই সম্ভাবনা নাই। প্রবল বলসম্পন্ন বুয়রগণেরই যখন এই দশা, তখন আমাদের আর কথা কি? সুতরাং এরূপে আত্মহত্যা করা একান্তই অকর্ত্তব্য; ইহাতে উন্নতি দূরে থাকুক, ক্রমে অবনতি ও ধ্বংসই হইবে। যদি পাশ্চাত্যগণের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উন্নতি করিতে

হয়, তাহা হইলে অগ্রে সেইরূপ শক্তিলাভের উপায় আবশ্যক। যতদিন সে শক্তি না জন্মে, ততদিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে গেলে আমাদের আরও অনিষ্ট হইবে।

অর্থের বলে তাঁহারা সমস্ত শিল্পবাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছেন, বলপ্রভাবে সমস্ত দেশ স্বায়ত্ত করিয়াছেন; আমরা রিক্তহস্তে সহায়শূন্য হইয়া কিপ্রকারে তাঁহাদেরই অবলম্বিত উপায়ে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব? তাঁহাদের নিকট কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিতেছি বটে, কিন্তু কেবল শিক্ষা করিলেই কার্য্য হয় না। শিক্ষা ত তাঁহাদেরও আছে। বল, ধন, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের সমান না হইলে, তাঁহাদের অবলম্বিত পথে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ একান্তই অসম্ভব। জাপানের উদাহরণ আমাদের খাটে না। জাপান উন্নত জাতি না হইলেও স্বাধীন। জাপানের বল ছিল, ধন ছিল, ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল, কেবল শিক্ষারই অল্পতা ছিল। ইয়ুরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়া তাহারা সে অভাব পূর্ণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতা করিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, তাই পাশ্চাত্য-পথের অনুসরণ করিয়া জাপানের উন্নতি হইয়াছে। জাপানবাসী ঘরের লক্ষ্মী বাহিরে যাইতে দেয় না, রাজাজ্ঞা ব্যতীত কিঞ্চিন্মাত্র তণ্ডুলও বিদেশে রপ্তানি হইতে পারে না, কাযেই খাদ্য দ্রব্য সস্তা থাকে; বিদেশীয় অকর্ম্মণ্য দ্রব্য গ্রহণ করে না, বরং নিজেরা বিদেশে পাঠাইয়া তাহার বিনিময়ে অর্থ আনে। এইরূপে সকলেরই ঘরে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, সেই অর্থবলে পাশ্চাত্যগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। আমাদের কি আছে যে, আমরা জাপানের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে উন্নত হইব? আমরা ত বিপরীত পথেই যাইতেছি, আমাদের ধন সমস্তই বিদেশে পাঠাইতেছি, পাশ্চাত্যপরায়ণ হইয়া আমাদের কেবল বিলাসিতারই বৃদ্ধি হইতেছে। দেশীয় দ্রব্য আমাদের পছন্দ হয় না, চাকচিক্যশালী অকর্ম্মণ্য

বিলাতী দ্রব্যই আমাদের প্রিয় হইয়াছে, সেই লোভে সমস্ত অর্থ বিলাতে পাঠাইতেছি। স্বদেশীয়গণ বৃত্তি অভাবে ক্রমে মারা যাইতেছেন, কোন শিল্পীরও আর অন্ন নাই, বিলাতী সূক্ষ্ম বস্ত্র ভাল হয় না বলিয়া এখনও কিছু কিছু দেশী কাপড় বিক্রয় হইতেছে। যেদিন হইতে বিলাতী কলে দেশী কাপড়ের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাপড় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবে, সেই দিন হইতে দেশী কাপড়ের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দেশী সূতার ন্যায় দেশী কাপড়ও আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। চাকৃচিক্যময় লৌহনির্ম্মিত (এনামেল) বাসনের আদর দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে কাংস্যকারের অন্নও অচিরে মারা যাইবে, বিবাহাদি উৎসবে পূর্ব্বে অভ্রের গ্লাসের আলোই ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে তাহার স্থানে এসিটাইটগ্যাস ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হওয়ায়, মালাকারের ব্যবসাও লোপ হইতে বসিয়াছে। এইরূপ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের সমস্ত শিল্পই নষ্ট হইতেছে। পাশ্চাত্য-পরায়ণ থাকলে এখনও যাহা কিছু আছে, তাহাও অচিরে নষ্ট হইবে। পূর্ব্বে যে সকল অর্থ ব্যয় হইত, সে সমস্ত দেশেই থাকিত; পূজা পার্ব্বণ দানাদি সৎ ব্যয়, এবং বাজি পোড়ান প্রভৃতি যে অসদ্ব্যয় হইত, সে সমস্ত অর্থ দেশেই থাকিত, তামসিক সম্প্রদায় দ্বারাও তখন দেশের ধনক্ষয় হইত না, এক্ষণে সমস্তই বিদেশে যাইতেছে; এক্ষণে দুর্গোৎসবের ব্যয় রেলওয়ে কোম্পানীকে দেওয়া হইতেছে, বারব্রতাদির ব্যয় বেশভূষায় দেওয়া হইতেছে, পুরাণপাঠ যাত্রাদির ব্যয় বেশ্যালয়ে ও শুঁড়ির দোকানে দেওয়া হইতেছে, পুষ্করিণী খনন মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠার ব্যয় উপাধি কিনিতে দেওয়া হইতেছে। এইরূপে সকল অর্থই বিদেশে যাই-তেছে, যাহা দেশে থাকিতেছে তাহারও অধিকাংশ দ্বারা অপকার্য্যকারীরই সেবা হইতেছে—বেশ্যা, শৌণ্ডিক প্রভৃতির ঘরেই যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় জাপানের অনুকরণ আমাদের উন্নতি হইবে কি প্রকারে ?

প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে যথেষ্ট মূলধনের প্রয়োজন।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, কল কারখানা—ধন ভিন্ন কিছুই হয় না। এত ধন পাইব কোথায় যে, বড় বড় বিলাতী কোম্পানির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব? দশজনে মিলিয়া কোম্পানি করিব; কিন্তু কয়জনের এমন উদ্বৃত্ত ধন আছে যে, তাহার সমষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য কোম্পানির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারা যায়? যাহাও আছে, এই ধর্ম্মহীন অবস্থায় মায়াত্যাগ করিয়া তাহাই বা পরের হাতে দিব কি প্রকারে? ধর্ম্মের বিমল ভাবপ্রভাবে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব যে মানবের নাই, কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়তা নাই, স্বার্থসাধনই যাহাদের সুখের একমাত্র উপায়, তাহারা যে পরের ধন নষ্ট করিবে না, ভাবিব কিপ্রকারে? কাযেই কিপ্রকারে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যৎ-কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত ধন পরের হাতে দিব? কেহ কেহ যে এরূপ দেন নাই তাহাও নহে; এপর্য্যন্ত আমাদের অনেকগুলি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি হইয়াছে, তাহাতে যাঁহারা যাঁহারা ধন দিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই ধন বিনষ্ট হইয়াছে। কি সাহসে লোক আবার আপন প্রাণ পরের হাতে দিবে? জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানি দূরের কথা, আমাদের দেশে এক্ষণে ভাগের কারবারই চলে না। যাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে, এমন কি পরস্পর পরস্পরকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না, এমন বন্ধু ২।৪ জন মিলিত হইয়াও কারবার করিলে সে কারবারও নষ্ট হইয়া যায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।
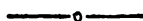
ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে উন্নতি হইবে না।

যত দূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল বল, ধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সমস্তই আমাদের দিন দিন কমিতেছে। বল যায়, যাউক; ইংরাজরাজ আমাদের রক্ষা বিধান করিবেন; দস্যু, তস্কর ও প্রবলের অত্যাচারের হস্ত হইতে রাজা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমাদের এ অবস্থায় বল না থাকাই ভাল; কেননা, বল থাকিলে গোঁয়ারতমি করিয়া কখন কখন পুলিস ও গোরা প্রভৃতির সহিত দ্বন্দ্বাদি করিয়া যে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে, সে অনিষ্টের ভয় আর থাকিবে না। জ্ঞান গেলেও এক্ষণে আমাদের ক্ষতি নাই। কারণ জ্ঞানপ্রভাবেই বুঝিতেছি, এ জগতে অন্যান্য জাতির ন্যায় আমাদেরও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার অধিকার আছে, কার্য্যে তাহা হয় না বলিয়া নিয়ত দুঃখই পাইতেছি; জ্ঞান না থাকিলে সে দুঃখ পাইব না। ধর্ম্ম গেলে পরকালে দুঃখ পাইব; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে ত পরকালের ভাবনা। পরকাল নিশ্চয়ই আছে, এ বিশ্বাসই বা কয়জনের আছে যে, ধর্ম্ম গেল বলিয়া লোকে দুঃখ পাইবে, সুতরাং ধর্ম্ম গেলেও তত দুঃখের বিষয় নহে, বরং এ অবস্থায় ধর্ম্ম না থাকিলে জাল জুয়াচুরি প্রভৃতি করিয়াও উদরান্নের সংস্থান হইতে পারে। কিন্তু ধন ভিন্ন ত চলে না, উদর পূরণ না হইলে যে কিছুতেই স্থির থাকা যায় না। ধন ভিন্ন যে জীবন ধারণ হয় না। আর কিছুদিন পরে যে আমাদের সন্তানসন্ততিগণ আহারাভাবে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইবে, হিন্দুনামেরই লোপ হইবে। সুতরাং যাহাতে ধনাভাবে—আহারাদি জীবনরক্ষার

উপযোগী উপকরণের অভাবে আমাদের লোপ সাধন না হয়, তাহার চেষ্টা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধনবৃদ্ধির চেষ্টাই এক্ষণে আমাদের মুখ্য কার্য্য। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে আমাদের ধনবৃদ্ধির কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ, যখন বুঝা গেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ধনবৃদ্ধির সময় আমাদের নয়, অধিক উপার্জ্জন করিয়া ধন বৃদ্ধি করিবারও শক্তি এক্ষণে নাই, তখন ব্যয় কমাইয়া ধনরক্ষার চেষ্টা ভিন্ন ধনসঞ্চয়ের উপায়ান্তর নাই। বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যে ধনের অপব্যয় করি, যদি আমরা ধর্ম্মপরায়ণ হই, তাহা হইলে সেই ধন নষ্ট না করিয়া সঞ্চয় করিতে পারি। যে সকল বিলাতী দ্রব্য এদেশে আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য। যদি আমরা সংযম-পরায়ণ হই, তাহা হইলে তাহার কোন দ্রব্যেরই প্রয়োজন হয় না। চা, চুরুট, বার্ডসাই, সাবান প্রভৃতি দ্রব্যে আমাদের প্রয়োজন কি? রকম রকম বস্ত্রেই বা আমাদের এত প্রয়োজন কি? আটপৌরে পরিবার জন্য দেশী মোটা কাপড়ই ত ভাল। যে কারণে বস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা, সে প্রয়োজন ত মোটা কাপড়েই সম্পন্ন হয়। কি লজ্জা নিবারণ, কি শীতাদি নিবারণ, মোটা কাপড়েই ত ভাল হয়, এবং মোটা কাপড় টিকেও অধিক দিন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা জোড়ারই বা এত প্রয়োজন কি? আমাদের গার্হস্থপ্রণালী যেরূপ, তাহাতে অতি অল্প ব্যয়েই আমদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। মাদুর, লেপ, কাঁথা, বালিশ হইলেই আমাদের শয়ন উপবেশনের কার্য্য চলে। ধুতি, উড়ানি, খড়ম, চটীজুতা ও মোটা শীতবস্ত্র হইলেই বেশবিন্যাশ ও শীতবাতাদি নিবারিত হয়। অন্ন, শাকসবজী, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ হইলেই আমাদের ভোজনসুখ ও শরীরপোষণ হয়। শাঁখা, শাটী, সিন্দূর ও রৌপ্যালঙ্কার হইলেই স্ত্রীজাতির শোভা হয়। স্ত্রীজাতিরা চিরপ্রথানুরূপ রন্ধন প্রভৃতি গৃহের সমস্ত কার্য্যই করিতে পারেন; অনেক সংসারে দাস দাসীরও প্রয়োজন হয় না। এইরূপে

সকল বিষয়েই আমাদের ব্যয় অল্প। ইংলণ্ডবাসীর স্ত্রীমাত্রের ভরণ পোষণে যে ব্যয় হয়, আমাদের বৃহৎপরিবার পোষণেও তাহা লাগে না। এ অবস্থায় সংযত হইলে আমাদের ধনবৃদ্ধি হইবে না কেন? ধনবৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে বল, জ্ঞান, সমস্তই বৃদ্ধি হইবে।

সত্য বটে আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন, এবং উচ্চ সমস্ত রাজ-কার্য্যই তাঁহাদের নিজস্ব; সেই উপলক্ষে দেশের অনেক ধন তাঁহারা বিলাতে লইয়া যান। কিন্তু তাঁহারা এইরূপে যে অর্থ লইয়া যান, তাহাতে স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ ধনহীন হয় না। বিশেষতঃ ঐরূপে তাঁহারা যে ধন গ্রহণ করিতেছেন, তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু কার্য্য করি-তেছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের দেশে শান্তি সংস্থাপন করিতেছেন; সে বিষয়ে আমাদের কোন চিন্তাই নাই। তাঁহাদের চেষ্টায় আমাদের দস্যু তস্করের ভয় নাই, বিদেশীয় শত্রুর ভয় নাই, স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আমরা শান্তির ক্রোড়ে বসিয়া একাগ্রমনে বল, স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, সকল বিষয়েরই উন্নতিচেষ্টা করিতে পারি। ব্রাহ্মণগণ যেমন ক্ষত্রিয় রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়া-ছিলেন, আমরা সকলেই সেইরূপ ইংরাজরাজের সুশীতল ছায়ায় থাকিয়া নিরুদ্বেগে নানা বিষয়ে উন্নতি করিতে পারি। ভয়শূন্য হইলে, উদ্বেগশূন্য হইলে চতুর্গুণ কার্য্য করা যায়। বস্তুতঃ আমরা যদি মানুষ হই, ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণ হইয়া সংযত হই, তাহা হইলে তাঁহাদের অপেক্ষাও উন্নতি করিতে পারি। আধ্যাত্মিক বলে আমরা চিরকালই বলবান্, তৎসঙ্গে যদি পাশ্চাত্য-গণের নিকট শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মণি-কাঞ্চনে যোগ হয়। তাহা হইলে যেপরিমাণ অর্থ তাঁহারা উক্তরূপে স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন, তাহার চতুর্গুণ অর্থ আমরা উপার্জ্জন করিতে পারি, তাঁহাদেরই দেশ হইতে কত ধন আনিতে পারি। পূর্ব্বে এদেশ হইতে কত বস্ত্র ইংলণ্ডে যাইত, চেষ্টা করিলে আরও অধিক পাঠাইতে পারি। শিল্প

বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও কত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারি। কিন্তু সে চেষ্টা দূরে থাকুক, আমরা হাতে তুলিয়া দেশের সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগকে দিতেছি—কেবল রাজজাতিকে দিতেছি না, পৃথিবীর যাবতীয় লোকেই আমাদের ধন হরণ করিতেছেন। আমরা বিলাসবাসনাপরতন্ত্র হইয়া ইচ্ছা করিয়া যত ধন বিলাতে পাঠাইতেছি, বিলাতবাসী ইংরাজের বেতন, পেন্সন ও অন্যান্য রাজকার্য্যের জন্য তাহার শতাংশও বিলাতে যায় না। বিলাসিতাই আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল। বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সমস্ত টাকা বিদেশে পাঠাইয়া থাকি বলিয়াই আমরা নির্ধন হইতেছি। ধর্ম্মহীনতা হইতে বিলাসের উৎপত্তি, বিলাসাদি হইতেই ধনের ক্ষয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকায় আমরা কেবল ঐহিক সুখেরই অভিলাষী হইয়াছি ; অদৃষ্টের প্রতি কিছুমাত্র বিশ্বাস না থাকায়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অপকৃষ্ট অংশেরই পরতন্ত্র হইয়া নিয়ত মৃত্যুভয় নিবারণের চেষ্টা করি। জামা মোজায় নিয়ত শরীর আবৃত করিয়া রাঁখি। মনে করি, এক পাশ দিয়া একটু হিম লাগিলেই নিউমোনিয়া হইবে। হইতেছেও তাই। এক্ষণে আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছে, এমন নবাবি চা'ল হইয়াছে যে, বাজার করিবারও ক্ষমতা আমাদের নাই ; স্ত্রীলোকেরা রন্ধন করিতে পারেন না, সামান্য গৃহস্থকেও এক্ষণে রাঁধুনি ও দাসদাসী রাখিতে হয়। রৌপ্য অলঙ্কার পরিলে এক্ষণে তাঁহারা লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারেন না, তাই স্বর্ণ মুক্তা হীরা পান্না এখন ঘরে ঘরে। সংযমের অভাবে এইরূপে আমাদের যেমন বৃথা ব্যয় বাড়িয়াছে, সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়াও পড়িয়াছি। অহমিকতাই সর্ব্বস্ব, অযথ সাম্যমন্ত্র হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ হইয়াছে ; অবস্থা বিবেচনা না করিয়া দরিদ্রও ধনীর ন্যায় আচরণ করিতে চান। সকলেই ধনীর ন্যায় পোলাও কালিয়া খাইতে, উৎকৃষ্ট বেশে সজ্জিত হইতে ও গৃহিণীগণকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে চান।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে এত যে ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার কারণও ঐ ধর্ম্মহীন সাম্যভাব। যে সকল পাত্র ধনীর লক্ষ্য, সেই সকল পাত্রে কন্যা-

দানের চেষ্টা সকলেই করেন। একজনকে যদি বহুজনে চায়, তাহা হইলে তাহার দর বাড়িবে না কেন? পাশ করা ছেলে দেখিয়া সকলেই কন্যার বিবাহ দিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। কাযেই তাহাদের দর বাড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষিতের, এমন কি, নিতান্ত অসচ্চরিত্রেরও দর বাড়িয়া গিয়াছে। একজন হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, আর একজন অমনি দুই হাজার টাকা দিবেন বলিলেন। ক্রমে পাঁচ সাত হাজার দর উঠিল। বরপক্ষের অপরাধ কি? ধর্ম্ম ভিন্ন এমন কি কারণ আছে যে, তাহার অনুরোধে ৫। ৭ হাজার টাকার লোভ ত্যাগ করিতে পারা যায়? ৫ হাজার টাকা ত্যাগ করাও যাহা, ৫ হাজার টাকা দান করাও তাই। যে সমাজে অক্ষম ভ্রাতার দারুণ দুরবস্থায় হৃদয়ে দয়া হয় না, পিতার কষ্ট নিবারণে মন যায় না, যে সমাজে উপার্জ্জনকারী একান্নবর্ত্তী ভ্রাতা অক্ষম ভ্রাতার স্ত্রীপুত্রগণকে ছিন্ন বসন পরাইয়া আপন পত্নী পুত্র-গণকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিতে লজ্জা বোধ করেন না, সে সমাজের লোকে নিঃসম্পর্কীয় কন্যার পিতার নিকট হইতে অর্থ লইতে লজ্জা বোধ করিবেন কেন? এমন কি সংযম শিক্ষা করিয়াছেন, এমন কি ধর্ম্মভাব জন্মিয়াছে যে, তদনুসারে সর্ব্বসুখের সারভূত অর্থের মায়া ত্যাগ করিবেন? সুতরাং কেবল বরপক্ষের দোষে এ দুঃখের উৎপত্তি হয় নাই, কন্যাপক্ষেরই যথেষ্ট দোষ। কন্যাপক্ষ যদি অবস্থানুরূপ পাত্র অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ বিপত্তি ঘটে না। কন্যার পিতার মনে করা আবশ্যক যে, যে পাত্র সহস্র মুদ্রা আয়বানের অভীপ্সিত, শত মুদ্রা আয়বান্ তাহাকে পাইবেন কেন? উপকারের আশাতেও লোকে বড়র সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করে। এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি সকলে অবস্থার অনুরূপ পাত্র অনুসন্ধান করেন, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হয়েন, তাহা হইলে কখনই এরূপ বরপণ বৃদ্ধি হয় না। ব্রাহ্ম বিবাহই আমাদের একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী বৈধ বিবাহ। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণ এই—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

মনু—২৭।৩

কেহ কেহ বলেন কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে, এরূপ শাস্ত্রবিধান যদি না থাকিত, তাহা হইলে এ কষ্ট পাইতে হইত না। ভাল পাত্র জুটিত, কন্যার বিবাহ দিতাম, না হয় কন্যা ঘরেই রাখিয়া দিতাম। এ কথা কেহ ভাবেন না যে, অসহায়া রমণীগণের চিরকাল অবিবাহিতা অবস্থায় পিত্রালয়ে থাকা অপেক্ষা দরিদ্র স্বামীর সহবাস শতগুণে ভাল। পিতৃগৃহে চিরকাল থাকিলে কি কন্যা আদর পায়? বিশেষতঃ পিতা মাতার অভাব হইলে যখন ভ্রাতৃবধূ ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির অধীন থাকিতে হয়, তখন যে কষ্টের সীমা থাকে না। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বিধবাগণ যে কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না, অসংযত কুমারীরা সেই কষ্ট সহ্য করিবে? যদি ধর্ম্মভাব থাকে, যদি বিলাস-মগ্ন না হয়, তাহা হইলে স্বামীর সহিত অরণ্যবাসও যে ভাল। ধর্ম্মভাব থাকিলে যে দাম্পত্য-প্রেম জন্মে, সেই প্রেমসুধা পান করিয়াই যে পরস্পর সুখী হয়। তবে, অনেক সময় মদ্যপায়ী লম্পট প্রভৃতির হস্তে পড়িয়া অনেক রমণী দুঃখ পায় বটে; তাহারও কারণ ধর্ম্মহীনতা। যদি দেশে ধর্ম্মচর্চ্চা প্রবল হয়, তাহা হইলে এরূপ দোষবিশিষ্ট লোক অল্পই হয়। যদিও অবস্থাবিশেষে পড়িয়া কুপাত্রে কন্যা দেওয়া হয়, ও তাহাতে কন্যার অতিশয় কষ্ট হয়, তখন তাহাকে পিতৃগৃহে আনিয়া রাখিলেই ত চলিতে পারে; বিবাহ না দিলেও ত পিতৃগৃহে থাকিত। বিবাহ না দিলে কন্যার মনে যত কষ্ট হইত, পিতা মাতার উপর যত অভিমান হইত, ইহাতে তাহা হয় না; প্রত্যুত অদৃষ্টদোষে ঘটিয়াছে মনে করিয়া কন্যা শান্ত থাকে। অতএব শাস্ত্রের ব্যবস্থা দোষের নহে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্র দোষী হইল, কুমারীর বিবাহ বন্ধ হইবার উপযোগী ব্যবস্থা থাকিলে কি শাস্ত্র আরও নিন্দনীয় হইত না? বিধবার পুনর্ব্বিবাহ না হইলে বড়ই কষ্টের কারণ হয়, আর কুমারীর বিবাহ

না হইলে কোন কষ্টেরই কারণ নাই, এ কথার অর্থ কি? বস্তুতঃ যদি কন্যাগণকে সুপথে রাখিতে হয়, তাহা হইলে যথাসময়ে তাহাদিগকে যথাসম্ভব সুপাত্রে প্রদান করা কর্ত্তব্য। সুপাত্র বলিতে ধনসম্পন্ন পাত্রই বুঝায় না, পাশ করাও বুঝায় না। যথাসম্ভব গুণাদিসম্পন্ন চরিত্রবান্ পাত্রই বুঝায়। যাঁহার যেমন অবস্থা, তদুপযোগী পাত্রকেই সুপাত্র বলিতে হইবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি সুপাত্র অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে, সুপাত্রের অভাব হয় না। যদি কন্যাপক্ষ শাস্ত্রপরায়ণ ও সংযমী হয়েন, বরপক্ষও শাস্ত্রপরায়ণ ও সংযমী হইবেন। যিনি উৎকোচ লয়েন, তিনি একা দোষী নহেন; যিনি দেন, তিনিও দোষী; প্রত্যুত তিনিই অধিক দোষী। কারণ তিনিই লোভ জন্মান। বস্তুতঃ লোকে যদি ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হয়, তাহা হইলে কখনই এ শোষণপ্রথা থাকে না। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে এ দোষ যাইবেও না। এক্ষণে অনেকেই এই ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা হয় কৈ? সভা সমিতি দ্বারা এই হইতেছে যে, আইবুড়া-ভাত দেওয়া প্রভৃতি উপলক্ষে যে কিছু দেশী কাপড় দেওয়া হইত, তাহাই বন্ধ হইতেছে—তাঁতির অন্ন মারা হইতেছে মাত্র। বিবাহের পণ ত কমিতেছে না, বিলাতী গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির ব্যয়ও কমিতেছে না।

এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে আমাদের বৃথা ব্যয় অনেক কমিয়া যায়। যে অর্থ আমরা বৃথা ব্যয় করি, তাহার কিয়দংশ ব্যয় করিলে পুষ্টিকর খাদ্যে উদর পূর্ণ করা যায়; শাস্ত্রাচারপরায়ণ হইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, দুশ্চিন্তা জন্য বল ও উৎসাহ কমে না, অযথা ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া রুগ্ন হইতে হয় না, এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও শরীর ক্ষয় হয় না। যাহাতে শরীর পুষ্ট হয়, মানবত্বের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ দ্রব্য ভোজন করিয়া শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি করা যায়। অন্ন ও ঘৃত-দুগ্ধই আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মহীনতার জন্য

সে অন্ন—তণ্ডুল গোধূমাদি ও ঘৃত দুগ্ধ এককালে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তণ্ডুল গোধূমাদিরূপ লক্ষ্মী দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইতেছে, গোধনরূপ ভগবতী অসীম দুর্দ্দশাপন্ন। কেহই আর এক্ষণে গোপালনে যত্নবান্ নয়, বৃষোৎসর্গের হৃষ্ট পুষ্ট ষাঁড় এক্ষণে ময়লার গাড়ী টানিতেছে, ভাল ভাল গো ও গোবৎস কসাইএর হস্তে নিহত হইতেছে। আমরা এ পর্য্যন্ত রাজার নিকট কত আবদার করিলাম, কত রাজনৈতিক আন্দোলন করিলাম, কত সভা সমিতি কংগ্রেস করিলাম, যাহা চাহিবার নয়, অর্থাৎ যেপ্রার্থনা পূর্ণ করিলে রাজার স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, এমন কত প্রার্থনা করিলাম, কত বিষয়ের আন্দোলন জন্য শত শত সভা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছি, টাউন্‌হল্ গড়ের মাঠ লোকে পূর্ণ করিয়াছি, যত ইচ্ছা ব্যয় করিয়া বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছি ; কিন্তু যাহা আমাদের প্রভূত কল্যাণের হেতু, সেই গোজাতির যাহাতে ধ্বংস ও অবনতি না হয়, যাহাতে আমাদের ধান্যাদির অযথা রপ্তানি না হয়, কখনও কি তাহার জন্য মন খুলিয়া নিতান্ত আগ্রহসহকারে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি ? যদি তাহা করিতাম, যদি রাজা বুঝিতেন যে, বাস্তবিক ইহার দ্বারা প্রজার ধর্ম্মহানি হইতেছে, প্রজারা মর্ম্মবেদনা পাইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতেন। যে রাজা প্রজার কল্যাণের জন্য নানা আইন করিয়া ভূম্যধিকারিগণের হস্তপদ সর্ব্ববিষয়ে বন্ধন করিয়াছেন, সে রাজা গোচারণের মাঠ যাহাতে কেহ আবাদ করিতে না পারে, নিশ্চয়ই তাহার উপযোগী আইন করিতেন। কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা কোথায় ? তাহা দূরে থাকুক, আমাদের শিক্ষিতেরা গোমাংস ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ; যাঁহারা গোমাংস ভক্ষণাদি না করেন, তাঁহাদিগকে মূর্খ ও কুসংস্কার সম্পন্ন মনে করিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। সেইসংস্কার বশতঃ সকলের মনের বিশ্বাস অন্যরূপ হইল। সেই শিক্ষারই বশে সেই উদাহরণে হিন্দু গোপগণ অনায়াসে কসাইএর নিকট দেবরূপী গোধন বিক্রয় করে। ইহার জন্য কেবল যে, আমরা অমৃতোপম ঘৃত দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত

হইতেছি, তাহা নহে ; ভাল গরুর অভাবে শস্যও তেমন হইতেছে না। এক সঙ্গে লক্ষ্মী ও ভগবতী উভয়ই কুপিত। গোধন যে দেশের প্রধান ধন ও ভগবতীরূপে পূজিত, গোধনের অপালনে যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে মহাপাপ, সেই দেশে গোধনের এই দুর্দ্দশা! এক্ষণে যে দেশে গোজাতি প্রধান খাদ্য-রূপে গণ্য, সেই দেশের আনীত বিকৃতদুগ্ধে আমাদের দুগ্ধপানের সাধ মিটা-ইতে হইতেছে। ইহা অপেক্ষা অবনতি আর কি হইতে পারে? যদি হিন্দু-জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের এরূপ শিথিলতা না হইত, তাহা হইলে কি এ ব্যাপার হইতে পারিত? ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ভগবতী ও লক্ষ্মীর কৃপাতেই এতকাল সুখে অতিবাহিত করিতেছিলেন ; যদি আবার আমরা গোঁড়া হিন্দুর ন্যায় ভগবতী ও লক্ষ্মীর সেবা করি, যদি সকলেই পূর্ব্বকালের গোঁড়া হিন্দুর ন্যায় প্রতিজ্ঞা করি যে, বিদেশীয় কোন দ্রব্য ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে দেখ দেখি আমাদের ধনবৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় কি না? চীন জাতি বিদেশী দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদেশী লোক পর্য্যন্ত স্বদেশে প্রবেশ করিতে দিত না। তাই এতকাল চীনের অবনতি হয় নাই।

যে কার্য্য করিলে রাজার রাজশক্তির অবমাননা হয়, তাহা করিলেই রাজদ্রোহ করা হয়। যাহাতে ধর্ম্মরক্ষা হয়, লক্ষ্মী যাহাতে দেশবহির্ভূত না হয়, ও ভগবতীর যাহাতে সেবা শুশ্রূষা হয়, তাহা করিলে ত রাজ-বিদ্রোহ করা হয় না। রাজনৈতিক আন্দোলনে রাজা বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু যদি আমরা ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত হইয়া আমাদের ভগবতী, আমাদের লক্ষ্মী পর-হস্তগত না করি, বিদেশীয় অকর্ম্মণ্য দ্রব্য ব্যবহার না করি, ও তাহার জন্য নিয়ত আন্দোলনাদি করি, তাহাতে রাজা আমাদের প্রতি কথ-নই রুষ্ট হয়েন না ; প্রত্যুত আমাদের ধর্ম্মে একাগ্রতা দেখিয়া আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবেন। ধর্ম্মপরায়ণকে সকলেই শ্রদ্ধা করে, ভয়ও করে। আমাদের ধর্ম্ম নাই বলিয়াই আমরা এইরূপ নিগৃহীত। ধর্ম্মবলের তুল্য বল নাই। কারণ ধর্ম্মের জন্য লোকে প্রাণকে তুচ্ছ করে। 'মরিয়া' হইয়া লাগিলে কোন্

কার্য্য সিদ্ধ না হয়? সামান্য একটু ধর্ম্মভাব আছে বলিয়া আমাদের নিম্ন-শ্রেণীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য সিদ্ধ করে ও মুসলমানদিগকে সকলেই ভয় করে। আর আমাদিগকে ভেড়া অপেক্ষা অকর্ম্মণ্য মনে করে। এই যে আমরা কংগ্রেস করিতেছি, প্রতিবাদের জন্য এত সভাসমিতি করিতেছি, আন্দোলনের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতেছি, কেন তাহার কোন ফলই হয় না? আর, এক দিন গাড়োয়ানেরা গাড়ি বন্ধ করিলে চারি দিকে হৈ চৈ পড়ে কেন? কারণ, সকলেই জানে আমরা কেবল বাক্যবাগীশ মাত্র; আমরা যাহা বলি, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের বেগ নাই, মর্ম্মান্তিকতা নাই; এমন কি, যাহার জন্য সকলে গগন বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করেন, সে যে কি, তাহাই সকলে বুঝে না। কি প্রকারে বুঝিবে? সে ত মর্ম্মকথা নহে, মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া ত সকলে মিলিত হয় না; কেহ স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ে, কেহ বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য, কেহ হুজুকে মাতিয়া মিলিত হয়েন। তাহাতে লাভালাভ কি, তাহাই অনেকে বুঝেন না। সুতরাং সভার কার্য্যের বিশেষ কোন ফলই ফলে না। ঘরে আসিয়া যিনি যেমন ছিলেন, তেমনই থাকেন; সংসারের কার্য্য, সামাজিক কার্য্য, রাজকার্য্য যেমন চলিতেছিল, সেইরূপই চলে; সভার সময়ে যে চীৎকার হয়, তাহাই মাত্র, তাহার পরে আর টুঁ শব্দও থাকে না। কাযেই কে ইহার সংবাদ লইবে? যদি সকলের হৃদয়ের ব্যথা হইত, তাহা হইলে কখনই এরূপ হইত না। তাহা হইলে কার্য্য দ্বারা কিছু প্রকাশ হইত, কাযেই রাজার কর্ণে উঠিত। অতএব, যদি আন্দোলনের ফল লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে যাহাতে সর্ব্বলোকের মন আকৃষ্ট হয়, সেইরূপে আন্দোলন কর। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে তাহা হইবে না। দেশের সর্ব্বসাধারণ উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া প্রকৃততত্ত্ব বুঝিবে, এ আশা করা একান্তই অসম্ভব। হইলেও, ধর্ম্মভাব না থাকিলে তাহাতে সকলের হৃদয়ের ভাব একপ্রকার হইতে পারে না। দেখাই ত যাইতেছে,

শিক্ষিতদলের সকলের মত একরূপ নহে। অনেক বিষয়ে পরস্পরের বিপরীত মতই পরিলক্ষিত হয়। একদল স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতির একান্ত পক্ষপাতী, অন্যদলের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন সমগ্র অধিবাসীকে একমতাবলম্বী করিতে পারে না। ইয়ুরোপের উদাহরণ আমাদের খাটে না। তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীন দেশে সম্প্রদায়বিশেষের আন্দোলনেই ফললাভ হয়। আমাদের অবস্থা ভিন্ন, প্রকৃতিও ভিন্ন। ধর্ম্মভাব ভিন্ন আমাদের কিছুই হইতে পারে না। অতএব যদি আমাদের বাহ্যোন্নতি মাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও যাহাতে আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে পারি, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইতে পারে না; বাল্যাবধি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিলে, ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলে, তবে লোকের ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তি হয়; নতুবা ধর্ম্মের কথা কেবল মুখের বাক্য মাত্র। অতএব যাহাতে লোকের অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশের মনে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহার চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে যে কারণে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, সে সকল যাহাতে সন্তান সন্ততিগণকে বিপর্য্যস্ত করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। দেব দেবী সমস্তই রূপক, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের কোন মঙ্গলামঙ্গল করিতে পারেন না, এ সকল আলোচনা এককালে বন্ধ করিতে হইবে। যাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া তদনুসারে চলিতে সকলের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বর্ত্তমানকালের অনুপযোগী নয়।

কেহ কেহ বলেন, এখন যেরূপ কাল ও অবস্থা, তাহাতে এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলা অসম্ভব। এক্ষণে পূর্ব্বকালের সে ব্রহ্মচর্য্যাদি

আশ্রমধর্ম্ম নাই, চতুর্ব্বর্ণধর্ম্ম নাই, যাগযজ্ঞাদিও নাই। বৃদ্ধকালে বান-প্রস্থধর্ম্ম কেহ অবলম্বন করেন না, করিবার শক্তিও নাই। এক্ষণে সমস্তই নূতন প্রকারের হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এক্ষণে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করেন না, ক্ষত্রিয় রাজা নাই, বৈশ্য কৃষি বাণিজ্যাদির পরতন্ত্র নহেন, শূদ্রও ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষামাত্রের পরবশ নহে। চতুর্ব্বর্ণ স্থানে এক্ষণে বহুতর জাতি হইয়াছে। আবার এক এক জাতি নানা প্রত্যন্ত ভাগে বিভক্ত। পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সকলেই এক্ষণে চাকরী ও ব্যব-সায়াদির পরতন্ত্র হইয়াছেন। অধিক কি, ব্রাহ্মণগণেরও এখন চাকরী প্রধান বৃত্তি হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে যে, আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই হইবে না। আমাদের বোধ হয়, একটু চিন্তা করিলেই এ সকল বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বকালের ও সর্ব্ব-অবস্থারই উপযোগী। যুগভেদে, শক্তিভেদে ইহার ধর্ম্মব্যবস্থা। তাৎকালিক তপস্যা, সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ প্রভৃতি এক্ষণে নিষিদ্ধ। তৎপরিবর্ত্তে বার, ব্রত, পূজা, জপ, দান, ধ্যান ইত্যাদি এক্ষণে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এবং নানাপ্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি উৎপন্ন হওয়ায় জাতি-বিশেষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিব্যবস্থা হইয়াছে। আপৎকালে সকলেই যে বৃত্ত্যন্তর অবলম্বন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে আছে। এক্ষণে আমরা পরাধীন ও শক্তিহীন, সুতরাং নিতান্ত বিপন্ন; এক্ষণে স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অসম্ভব হইলে বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ একান্ত অকর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া লোভপরবশ হইয়া বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। সাধ্যমত সকলেরই স্ববৃত্তিপরায়ণ হইবার চেষ্টা করা উচিত। রাজপদ এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার উপায় অনেক ক্ষত্রিয়েরই হইতে পারে। যদি বলবান্ ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া রাজার সৈনিক

ও সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বজায় থাকে, ও ভবিষ্যতে ভারতের আশা থাকে। মুসলমান অধিকার-কালে ঐ উপায়ে অনেক ক্ষত্রিয় স্বজাতীয় ধর্ম্ম পালন করিতেন, ও তাই তখন ভারতে অনেক স্বাধীন রাজা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয় উচ্চ রাজ-পদ গ্রহণ করিয়াও জীবিকার অর্জ্জন করিতে পারেন, উহাও তাঁহাদের স্বধর্ম্ম।

বিজাতীয় রাজা এক্ষণে আর ব্রাহ্মণ রক্ষা করেন না বটে, কিন্তু আমরা যদি ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলেই অনেক ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তির অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণের যে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা পড়িলে দোষ হয়, এমন কথা কোন শাস্ত্রে নাই; প্রত্যুত দেখা যায় পূর্ব্বে অনেক ঋষি ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করি-তেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে অতি হীনের নিকটও শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ যদি সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিদ্যাদি শিক্ষা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায় চিকিৎসাশাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি, ও নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া জীবিকার অর্জ্জন করিতে পারেন। তদ্দ্বারা দেশেরও উন্নতি হয়। স্ববৃত্তি দ্বারা উদরপূরণ করিতে না পারিলে আপদ্ধর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বনও শাস্ত্রসম্মত। শূদ্রবৃত্তি সেবাই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এককালে নিষিদ্ধ, সুতরাং যে সকল চাকরীতে সেবা করিতে হয় না, অর্থাৎ হাকিম, মন্ত্রী, শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক প্রভৃতি-রূপ চাকরী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে আপৎকালে একান্ত অকর্ত্তব্য নয়। অনেক ব্রাহ্মণই ঐ কারণে পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াদির বৃত্তি-পরায়ণ হইয়াছেন। পশ্চিম দেশে অনেক ব্রাহ্মণই বহুদিন হইতে ক্ষত্রিয়কর্ত্তব্য সৈনিকের ও দ্বাররক্ষকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। এবং সকল দেশীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণই কৃষি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ

করিতেছেন। সুতরাং সেই সকল বংশীয় ব্রাহ্মণসন্তানগণ যদি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যপরায়ণ হইয়া ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তি ও সম্ভ্রমজনক চাকরী অবলম্বন করেন, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধী কার্য্য করা হয় না। ১০টার মধ্যে আহার করিয়া চাকরীস্থানে যাইতে হয় বলিয়া নিত্য কার্য্যের কিছুই ব্যাঘাত ঘটে না। ঐ সময়মধ্যে সমস্ত নিত্য কার্য্যই সম্পাদিত হয়। মধ্যাহ্নসন্ধ্যা, প্রাতঃসন্ধ্যার সঙ্গে বা সায়ংসন্ধ্যার সঙ্গে করা যাইতে পারে।

আমাদের রাজজাতি বহির্বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইলেও, বৈশ্যগণ অন্তর্বাণিজ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। মাড়োয়ারী প্রভৃতি তাহাতেই ধনী হইতেছেন। যদি বৈশ্যগণ কৃষির উন্নতিকল্পে ও গোপালনে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলেও স্বর্ণপ্রসূ ভারতে সমস্ত বৈশ্যই সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। ঘৃত দুগ্ধ এক্ষণে যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে এবং হলবাহী গোজাতির যেরূপ অবনতি হইয়াছে, আজ যদি বৈশ্যগণ গোপালনে নিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে দেশের সর্ব্ববিষয়ে সৌভাগ্য হয়, এবং তাঁহাদের অব-স্থারও উন্নতি হয়। যে চা নীল প্রভৃতির আবাদ করিয়া বিদেশীয়গণ ভারতের অর্থ লুণ্ঠন করিতেছেন, যে সকল খনি হইতে অমূল্যরত্ন সকল উদ্ধৃত করিতেছেন, বৈশ্যগণ সে সমস্ত নিজে গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা যদি অপ্রয়োজনীয় বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ করি, ও মা লক্ষ্মীকে দেশান্তরে না পাঠাই, তাহা হইলে বিদেশীয় বণিক্‌গণ এখানে আসিবেনই না, সুতরাং তাঁহারা আমাদের বাণিজ্যের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। বৈশ্যগণ তখন বহির্বাণিজ্যও করিতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতি করিয়া বর্ণসঙ্কর ও অন্যান্য স্বজাতীয়গণের জীবনোপায় বিধান করিতে পারেন। সকল বর্ণের মনুষ্যই স্ব স্ব বৃত্তিপরায়ণ হইয়া জীবিকা অর্জ্জন ও শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই উন্নতি করিতে পারে।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, শাস্ত্রীয় বিধি কোন অংশেই আমা-

দের কালের অনুপযোগী নহে। প্রত্যুত আমরা যদি হৃদয়ের সহিত স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিই হয়।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন শাস্ত্র ও দেশাচার অনুসারে চলিলে, অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। বিলাত যাওয়া আমাদের এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু যাঁহারা দেশের অশেষ কল্যাণের জন্যে এত ব্যয় ও এত শ্রম স্বীকার করিয়া বিলাতে যাইয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা জাতিচ্যুত হয়েন। বিলাত যাওয়া হিন্দু শাস্ত্রমতে কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, সে কথার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, আমরা বিলাত-যাত্রীদিগকে ত্যাগ করিতেছি? না, তাঁহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে-ছেন? তাঁহারা যে জাতিচ্যুত হইতেছেন, সে কি কেবল হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কা-রের দোষে? না, যাঁহারা বিলাত যান, তাঁহাদেরই দোষে? এক্ষণে যাঁহারা বিলাত যান, তাঁহারা কি হিন্দুসমাজের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিয়া বিলাত যান? না, বিলাত হইতে আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন? তাঁহারা কি কেবল দেশের হিতের জন্যই বিলাত যান? না, নিজের অর্থ ও মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য যান? স্বজাতির হিত যদি তাঁহাদের লক্ষ্য হইত, তাঁহারা যদি ধর্ম্মের ও স্বজাতির অনুরোধে একটু কষ্ট স্বীকার করিতেন এবং যদি স্বধর্ম্মের ও স্বজাতির সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা জাতিচ্যুত হইতেন না। বলিতেছ, তাঁহারা কষ্ট করেন। কি কষ্ট করেন? দেশভ্রমণে কি কষ্ট হয়? না, অতুল আনন্দ লাভ হয়। কেবল ঐ আনন্দ লাভের জন্য কত কত ব্যক্তি যে পদব্রজে ভ্রমণ ও স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ পথ পর্য্যটন করেন; তুষারময় উত্তুঙ্গ হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ, প্রচণ্ডসূর্য্য-তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির দাবদাহ ও চিরতুষারা-বৃত হিমপ্রদেশের হিমানীসম্পাতে কষ্টকেও কষ্ট মনে করেন না। বিলাতযাত্রীদিগের এ সকল কষ্ট ত কিছুই নাই। তাঁহারা জাহাজে, লৌহবর্ত্মে ও উৎকৃষ্ট অশ্বযানে আরোহণ করিয়া পরম সুখে ভ্রমণ করেন;

এক পদও হাঁটিতে হয় না। স্বহস্তে পাক করা দূরে থাকুক, স্বহস্তে খাইতেও হয় না। মহাসমুদ্র প্রভৃতির প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানা দেশ ও জনপদের নানা অদ্ভুত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দৃশ্য ও আচারব্যবহারাদি, সভ্যতম জাতিগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ এবং নানা জাতির নানাপ্রকার আমোদ উপভোগ করিতে করিতে তাঁহাদের সময় পরম সুখে অতিবাহিত হয়। নিত্য নব নব প্রকারের সভ্য জগতের উদ্ভাবিত নানা সুরস দ্রব্যে নিয়ত উদর পূরণ করিয়া জীবন সার্থক মনে করেন। কষ্ট দূরে থাকুক, নব নব সুখে তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত হয়। যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা তাঁহাদের পিত্রাদির কষ্টার্জ্জিত, সে অর্থব্যয়ে তাঁহাদের আনন্দ ভিন্ন দুঃখ নাই। অধ্যয়ন জন্য কিছু পরিশ্রম করিতে হয় বটে, কিন্তু দেশে থাকিয়া এম্, এ, বি, এল্, ষ্টুডেণ্টশিপ্ প্রভৃতির পরীক্ষা দিতে যত শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার তুলনায় সে পরিশ্রমও অল্প ভিন্ন অধিক নহে। অথচ দেশে আসিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া চিরজীবন সুখ ভোগে অতিবাহিত করেন। অর্থাগম প্রচুর হয়, অথচ পরের জন্যে তাহার কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। আত্মীয় স্বজনাদির প্রতিপালন করিতে হয় না, ধর্ম্মকর্ম্মেও কিছু ব্যয় করিতে হয় না। সমস্ত অর্থ কেবল আপনারই সুখে ব্যয়িত হয়। ইহাকে যদি আত্মত্যাগ, স্বদেশহিতৈষণা ও কষ্ট বলে, তবে আর কষ্টকর নহে কি? ইহাতে দেশের কি লাভ হইতেছে, যে, তাহারই জন্য তাঁহাদের কৃত সমাজবিদ্রোহ সহ্য করিতে হইবে? যদি বল ঐরূপে শিক্ষা করিয়া আসিলে সাহেবের প্রাপ্য কোন কোন চাকরির আয় দেশীয় লোকের হস্তে পড়ে ও সে অর্থ দেশে থাকে, সুতরাং ইহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহাও নহে। কেননা তাঁহারা সম্পূর্ণ সাহেবী চা'লেই চলেন, সাহেবদের ভোজ্যই তাঁহাদের ভোজ্য, সাহেবদের বেশই তাঁহাদের বেশ, সাহেবদের মুসলমান বাবুর্চিই তাঁহাদের পাচক ও পরিচারক। সুতরাং সাহেবদের দ্বারা এ দেশের যেরূপ অর্থাগম

হয়, তাঁহাদের দ্বারা সেইরূপই হয়। অধিকন্তু তাঁহারা বিলাত-গমন-কালে এদেশের বহু অর্থ কেবল বিলাতেই ব্যয় করেন, এবং মধ্যে মধ্যে বিলাত যাইয়া যথেষ্ট ব্যয় করিয়া আসেন। এই উপকারের আশায় বিলাতযাত্রা অনুমোদনীয় হইবে?

এক্ষণে বিলাতযাত্রা অনুমোদিত হইলে যে আমাদের কি অনিষ্ট হইবে, তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি? বিলাত দেখার সাধ কাহার মনে না হয়? বিলাতে গিয়া নানা দর্শনীয় দর্শন ও বিবিধ আমোদ উপভোগের ইচ্ছা কাহার না হয়? জাতি যায় বলিয়াই লোকে বিলাত যাইতে পারে না। যদি এ বাধা না থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিলেই যে লোকে বিলাত যাইয়া আমোদ প্রমোদ করিবে। ধনবান্ জমিদার ও রাজন্য-বর্গের ত কথাই নাই। কাযেই দেশের সমস্ত অর্থ বিলাতে ব্যয়িত হইবে। অচিরেই ভারত ধনশূন্য হইবে। এই দেশে যে সকল বিলাতী দ্রব্য আইসে, তাহার মায়াই কাটান যায় না, আবার সেখানে গিয়া কত দ্রব্য যে লোকে কিনিবে, তাহার সংখ্যা নাই। যখন এইখানেই ধনি-গণ দুই একজন পদস্থ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতে ২৫।৩০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন, তখন বিলাতে যে কত মহাভোজের আয়ো-জন করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিবেন, তাহার ইয়ত্তা কি? রাজা মহারাজা উপাধির লোভে এইখানেই যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইতেছে, সেখানে গিয়া সেই লোভে যে কত ব্যয় হইবে, তাহা মনে ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই সে দিন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে নিম-ন্ত্রিত হইয়া যাঁহারা বিলাতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের কত ব্যয় হইয়াছিল! যদি শাস্ত্রীয় বাধা না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ উপলক্ষে কত লোক যে বিলাত যাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাতযাত্রা অনুমোদিত হইলে এইরূপে আমাদের সর্ব্বস্ব ক্ষয় হইবে; মিত্ররাজগণও ভিখারি হইয়া পড়িবেন। সুতরাং এক্ষণে বিলাতযাত্রা শাস্ত্র-

নিষিদ্ধ থাকা পরম মঙ্গলেরই কারণ। যাঁহারা মনে করেন বিলাতে গিয়া বাণিজ্য করিলে অর্থাগম হইবে, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রান্তি। বণিক্-প্রবর ইংরাজ জর্ম্মান্ প্রভৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া লাভ করা দূরে থাকুক, লাভে মূলে সর্ব্বস্ব হারাইতে হইবে। এই দেশে যে বাণিজ্য হয়, যে খনি আদি আছে, তাহারই একটা আমরা চালাইতে পারি না—সাহেবেরা নানা উপায়ে কত উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহারই কোন একটা আমরা অবলম্বন করিতে পারি না; আর সেই দেশের লক্ষ লক্ষ সুচতুর অভিজ্ঞ রথ্‌চাইল্ডের ন্যায় ধনকুবেরের সহিত আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিব, সে আশা একান্ত সুদূরপরাহত। এমন দিন যদি আমাদের হয়, যদি আমরা ধর্ম্মপরায়ণ হই, ও প্রকৃত কাযের লোক হইতে পারি, তখন সমুদ্র-গমনে আমাদের জাতিপাত হইবে না। এখনও যদি সেরূপ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও বিলাতযাত্রার বাধা ঘটে না। যদি শিল্প বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য বিলাতে লোক পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ-কেই পাঠাইতে হইবে, তাহার অর্থ কি? বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে হইলে বৈশ্য শূদ্রেরই বিলাত যাওয়ার প্রয়োজন হয়। তাঁহারা যদি সেই প্রয়োজন জন্য বিলাত যান ও হোটেলে না খাইয়া, পশ্চিম দেশের নিয়মানুসারে চৌকা করিয়া তাহার মধ্যে নিজে পাক করিয়া খান, যদি কোনরূপ অখাদ্য ভোজন না করেন, যদি হিন্দুর ন্যায় যথাসম্ভব নিত্যক্রিয়াপরায়ণ ও স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ থাকেন, স্বদেশে আসিয়া পূর্ণভাবে হিন্দু আচারপরায়ণ হয়েন ও বিনীতভাবে সমাজের শরণাপন্ন হইয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা সমাজচ্যুত হয়েন না। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মতে কামকৃত পাপ অপেক্ষা অকামকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক অল্প। যদি ইচ্ছা করিয়া তাঁহারা অনাচার না করেন—অবস্থার গতিকে বাধ্য হইয়া যতটুকু করিতে হয় ততটুকু মাত্র করেন ও তাহা প্রকাশ করিয়া বাহাদুরি না দেখান, তাহা হইলেও তত দোষের হয় না; তাহার

প্রায়শ্চিত্ত আরও অল্প। আধুনিক শিক্ষিতগণের মতে যাঁহারা পাপ গোপন করেন তাঁহারা ভণ্ড, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে পাপপরায়ণদিগের অপেক্ষা অধিক পাপী। সে কথা বাস্তবিক ঠিক নহে। কারণ সমাজদ্রোহী অপেক্ষা ভণ্ড ভাল। বিশেষতঃ প্রকাশ্য ভাবে পাপ করিলে সে পাপ সংক্রামক হয়; তাহার উদাহরণে আর দশ জন সেই পথের পথিক হয়। আর যে পাপ গোপনে থাকে—কেহই জানিতে না পারে, তাহা সংক্রামক হয় না, যিনি পাপ করিলেন তিনিই পাপী হইলেন মাত্র; তাহাতে সমাজের তাদৃশ অনিষ্ট হয় না। তাই হিন্দুশাস্ত্রে রহস্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক অল্প। মনু বলিয়াছেন—

এতে দ্বিজাতয়ঃ শোধ্যা ব্রতৈরাবিষ্কৃতৈনসঃ। ২২৭।১১
অনাবিষ্কৃতপাপাংস্তু মন্ত্রৈর্হোমৈশ্চ শোধয়েৎ॥
খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাৎ তথা দানেন চাপদি॥ ২২৮।১১
কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥ ২৩১।১১

অনেক সময়ে লোকে প্রবল ইন্দ্রিয়বিশেষের অধীন হইয়া ও সংসর্গদোষে পাপ করে, অবস্থায় পড়িয়া সে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না। ভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন—

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

এরূপ অবস্থায় কৃত পাপ গোপনে হইলে, পরে তাহাতে আর আসক্তি না থাকিতে পারে। ভয়শূন্য হইয়া পাপ প্রকাশ করিলে সে আশা থাকে না। আমাদের এই দুর্দ্দিনে কাহার জাতি আছে? হোটেলে না খান কে? অনাচার না করেন কে? যদি এ সকল সমাজকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া কয়া হইত, তাহা হইলে কি আর হিন্দুর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকিত?

বস্তুতঃ সমাজকে অমান্য করিয়া কার্য্য করা ও সমাজকে ভয় করিয়া কার্য্য করার অনেক প্রভেদ। প্রথমোক্তেরা সমাজ ও ধর্ম্মদ্রোহী, এইজন্য ত্যাজ্য; শেষোক্তেরা অক্ষম বলিয়া কৃপার পাত্র।

এইরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত কোন হিতকর বিষয়েরই বাধা হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা হয় না। সত্য বটে, কোন কোন দেশাচার, লোকাচার ও কুলাচার শাস্ত্রাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা কিছু কিছু অনিষ্ট হইতেছে; কিন্তু ঐ সকল দেশাচারাদি বিনা কারণে উৎপন্ন হয় নাই। বিশেষ প্রয়োজন জন্যই প্রচলিত হইয়াছিল। যখন তাহা দ্বারা অনিষ্ট হইতে থাকিবে, তখন অল্প চেষ্টাতেই আপনি উঠিয়া যাইবে। বঙ্গের কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহপ্রথা প্রয়োজন জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইল, তখন তাহা একপ্রকার আপনিই উঠিয়া গেল বলিতে হয়। জাতিভেদের এত কঠিনতা, লৌকিক আচারের এত কড়াকড়ি প্রয়োজন জন্যই হইয়াছিল। এক্ষণে এক এক জাতির মধ্যে নানা অবান্তর ভাগ হইয়াছে। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কান্যকুব্জ, সারস্বত প্রভৃতি নানাসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ বিভক্ত। উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী প্রভৃতি নানা ভাগে কায়স্থ বিভক্ত। প্রত্যেক জাতিই নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বিবাহ হয় না, পরস্পরের অন্নও ভোজ্য নহে। শাস্ত্র এ সকলের পোষক নহে বটে, লোকাচারই ইহার প্রবর্ত্তক। কিন্তু এ সকল লোকাচার অকারণ-সম্ভূত নহে। যদি এ সকল লোকাচার না হইত, তাহা হইলে এতদিনে যে কত অনিষ্ট হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক্ষণে অনেকেরই মতে এক জাতির সকল সম্প্রদায় মিলিত হইলে সমূহ ইষ্ট সাধিত হয়। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা হইবে। কিন্তু এ সময়ে সে সকলের চেষ্টা করিলে ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। কারণ এক্ষণে যাঁহারা সে সকলের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে হিন্দুগণ বিশ্বাসই করেন না। সাধারণের বিশ্বাস তাঁহারা হিন্দু নহেন, পাশ্চাত্য

মতেরই পোষক। তাঁহারা ভাবেন একাকার করিবার উদ্দেশ্যেই এ চেষ্টা হইতেছে—হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে দিবার জন্যই এ উদ্যোগ। তাই তাঁহাদের প্রস্তাবিত কার্য্যসমূহ মঙ্গলদায়ক হইলেও হিন্দু-সাধারণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। এক্ষণে আমরা বাস্তবিকই এককালে অহিন্দু হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা সমস্তই পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে আমাদের সে চেষ্টা করাও উচিত নহে। করিলে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও অশুভকর হইতে পারে। যখন আমাদের দৃষ্টিদোষ দুরীভূত হইবে, যখন আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিব, যখন আমরা প্রকৃত হিন্দু হইব, যখন আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না, তখন আমরা সমস্ত দোষেরই সংশোধন করিতে পারিব। এক্ষণে যদিও কোন কোন বিষয়ের সংশোধন না হইলে কিছু কিছু অনিষ্ট হয়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রে আস্থাশূন্য হওয়ায় যে ক্ষতি হইতেছে, তাহার তুলনায় ঐ ক্ষতি ক্ষতিই নহে। কালে সে ক্ষতির পূরণ হইবে। এক দিনে ভারত-উদ্ধার হইতে পারে না। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে, হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র এ কালের অনুপযোগী নহে। প্রত্যুত হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতা ব্যতীত আমাদের উন্নতির সম্ভাবনাই নাই।

আপাতকরণীয় প্রধান কর্ত্তব্যনিচয়।

সনাতন ধর্ম্মের অনুশীলন ব্রাহ্মণের আশ্রয় ভিন্ন হইতে পারে না। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রত, পূজা, সংস্কারাদি সমস্তই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা করাইতে হয়। ব্রাহ্মণ জ্ঞানসম্পন্ন না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম সকলকে বুঝাইতে ও বুঝিয়া কর্ম্মাদি করিতে পারেন না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন, এমন ব্রাহ্মণের নিতান্ত অল্পতা হইয়াছে। আজি কালি সকলেই ইংরাজী শিক্ষার দিকে মন দিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জ্জনের আশা থাকে। কাযেই সে আশা ত্যাগ করিয়া কদলী ও আতপতণ্ডুলের

আশায় কয়জন ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষায় মনোনিবেশ করিবেন? তাই এক্ষণে উপযুক্ত পুরোহিত পাওয়া যায় না। যাঁহারা এক্ষণে পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই বর্ণজ্ঞানবিহীন বলিলেই হয়। তাঁহাদের মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া শিক্ষিতগণ হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। গুরু পুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে তাঁহার উপদেশে, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকিবে কেন? অতএব স্বধর্ম্মে মতিগতি দৃঢ় করিতে হইলে সুপণ্ডিত গুরু পুরোহিত আবশ্যক। কিপ্রকারে সেইরূপ গুরু পুরোহিত পাওয়া যাইবে? যাঁহারা শিক্ষা দিবার সুযোগ পান, তাঁহারা পুত্রদিগকে ইংরাজী শিক্ষাই দিয়া থাকেন। যাঁহাদের সে সুবিধা ঘটে না, তাঁহারাই পৌরোহিত্য কার্য্য অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিনা ব্যয়ে টোলে পড়িবার সুযোগ পান, তাঁহারা কেহ কেহ টোলে কিঞ্চিৎ পড়িয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণে অধ্যাপকগণের সেরূপ আয় নাই। কাযেই অধ্যাপকগণ ভরণপোষণ দিয়া অধিক ছাত্র পড়াইতে পারেন না।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের ভূমি-বৃত্তি ছিল, রাজসরকারে কবিত্বাদির পুরস্কার ছিল, সভাসদ্ রূপে অনেকে অনেক সভায় বৃত থাকিতেন, সকল ধর্ম্ম-কার্য্যেই নিমন্ত্রিত হইয়া পরিমিত বিদায় প্রাপ্ত হইতেন, এবং প্রায় প্রতি ঘরেই ব্রাহ্মণের বার্ষিক বরাদ্দ ছিল, তদ্ভিন্ন যাজনকার্য্যেও আয় ছিল; এক্ষণে সে সকলের কিছুই নাই। ভূমিবৃত্তি পাওয়া দূরে থাকুক, যাহা আছে তাহাই 'বাজে আপ্ত' হইতেছে। সামান্য কবিতা রচনা দূরে থাকুক, উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিয়াও কেহ কিছু পান না। এক্ষণে আর ধনিসন্তানেরা ব্রাহ্মণ সভাসদ্ রাখেন না। বার্ষিক প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। ক্রিয়াকলাপও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, পিতা মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধও অনেকে করেন না। যাঁহারা চিরকাল দুর্গোৎসব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা মন্দ ও মতিগতি বিকৃত হয় নাই, তাঁহারাই কেবল দুর্গোৎসব করেন; নূতন ধনী হইয়া কেহই প্রায় দুর্গোৎসব করেন না। পুরাণ পাঠ,

কথকতা প্রভৃতি কচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, স্ত্রীলোকদিগের বারব্রত দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। সদক্ষিণ ব্রাহ্মণভোজনও অতি অল্প হইয়া থাকে। পূজা ব্রতাদি যাহা কিছু হইয়া থাকে, তাহা কেবল বঞ্চকতায় পরিপূর্ণ; তাহাতে যে সকল বস্ত্র, মধুপর্কের বাটী, আসনাঙ্গুরীয় প্রভৃতি দ্রব্য দেবোদ্দেশে দেওয়া হয়, তাহা এককালে অব্যবহার্য্য। যে মূল্যে যজমান তাহা ক্রয় করেন, পুরোহিত তাহার সিকিও পান না। কি উপায়ে ব্রাহ্মণের অন্নসংস্থান হইবে? ব্রাহ্মণের অবস্থা এত হীন হইয়াছে যে, অতি নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাও তাঁহাদের অপেক্ষা সঙ্গতি-সম্পন্ন। অতি নিম্নশ্রেণীর জনগণও ইংরাজী শিক্ষা করিয়া মহোচ্চপদ লাভ ও যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতেছে।

এই ত ব্রাহ্মণের আর্থিক অবস্থা। সম্মানও তাঁহাদের সেইরূপ হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণের পদরজঃ পাইবার জন্য মহারাজাধিরাজ পর্য্যন্ত লালায়িত ছিলেন, যে ব্রাহ্মণের কথা মাত্র আশীর্ব্বাদ পাইলে সকলে কৃতার্থ মনে করিতেন, যে ব্রাহ্মণের ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ পাইলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন, এবং যে ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিবার অনুমতি পাইলেও কেহ বসিতে সাহস করিতেন না, আজি সেই ব্রাহ্মণ এক্ষণে অশিক্ষিত দলের অন্তর্গত ও বিদ্রূপেরই পাত্র। কিছু দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সংক্রান্তি ও সং নামে অভিহিত হইতেন, ব্রাহ্মণের টিকী কাটিয়া লইয়া বৈঠকখানার সজ্জা হইত। আজি কালি ব্রাহ্মণের প্রতি সেরূপ অশ্রদ্ধা নাই বটে, কিন্তু এখনও তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিতের ন্যায় সম্মান পান না। সমাজের রীত্যনুসারে এখন অনেকে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন বটে, কিন্তু সে প্রণামের সহিত ভক্তিভাব মিশ্রিত থাকে না, থাকিতে পারেও না। প্রকৃত ভক্তি না থাকিলে কি তাঁহাদের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিতে পারা যায়? কাযেই এরূপ শ্রেণীর লোক যে ধর্ম্মের পরিচালক, সে ধর্ম্মের উন্নতি কি প্রকারে হইবে? ব্রাহ্মণের দিন দিন যেরূপ দুর্গতি আরম্ভ হই-

য়াছে, তাহাতে কালে স্ববৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণের অস্তিত্বই লোপ হইবার সম্ভাবনা। তখন ব্রতপূজাদি সম্পন্ন করিবে কে? কে হিন্দুধর্ম্মের পরিচালক হইবে? অন্যজাতীয়গণ ত ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন না; তাঁহারা যতই উন্নতিলাভ করুন, যতই বেদবেদাঙ্গে শিক্ষিত হউন, তাঁহারা ত ব্রাহ্মণের স্থান অধিকার করিতে পারিবেন না—গুরু পুরোহিতের কার্য্য ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের দ্বারা হইতে পারিবে না। তাহা হইলে ত হিন্দুধর্ম্মই থাকিবে না। অতএব যদি স্বধর্ম্মপরায়ণ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য ও কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে যাহাতে ব্রাহ্মণের রক্ষা হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত বিদ্যার অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহার উপায় সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। অধিকসংখ্যক সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিতে হইলে, যাহাতে চতুষ্পাঠীর সংখ্যা অধিক হয়, এবং যাহাতে অধ্যাপকগণ পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, ছাত্রগণকে অশন বসনাদি দান করিয়া অধ্যয়ন করাইতে পারেন, তাহার উপায় করা আবশ্যক।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ধনিসন্তানেরা স্বধর্ম্মপ্রচার জন্য কোটী কোটী টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। তাই সে দেশে ব্যক্তিগত ধর্ম্মভাব না থাকিলেও ধর্ম্মপ্রচারের ব্যাঘাত হয় না, ও সেই কার্য্যে যাঁহারা বৃত থাকেন, তাঁহাদেরও অর্থকৃচ্ছ্র হয় না। আমাদের স্বর্গগত ভূ-দেব ভূদেব মুখোপাধ্যায় এদেশে সেই উপায়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূদেববাবু তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ—দুই লক্ষেরও অধিক টাকা চতুষ্পাঠীর উন্নতিকার্য্যে ন্যস্ত করিয়া তাঁহার পিতা বিশ্বনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। সেই টাকার সুদ হইতে এক্ষণে ৭৫টী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক বার্ষিক ৫০৲ হিসাবে ও ১৬ জন কাশীস্থ ছাত্র বার্ষিক ৩০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণ যোগ্যপুত্র মুকুন্দদেবের চেষ্টায় ভূদেববৃত্তিনামে আর দুইটী বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে; ঐ বৃত্তি হইতে আর দুইটী ঐরূপ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ৫০৲ টাকা করিয়া পাইতেছেন। ভূদেববাবু যে পথ প্রদর্শন

করিয়াছেন, যদি দেশীয় ধনিগণ সকলেই সাধ্যানুসারে সেই পথের অনুসরণ করেন, যদি সকলেই শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, ও বিবেচনা করিয়া দক্ষিণা দেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের অধঃপতন নিবারিত হইবে। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণ উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া সাধারণের ভক্তিভাজন হইবেন। নিশ্চয়ই সাধারণ জনগণ ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত হইয়া মনুষ্যনাম সার্থক করিবেন।

আমাদের দ্বিতীয় ধর্ম্ম-সাধন গোধন। গব্য দুগ্ধঘৃতাদি ভিন্ন আমাদের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই হয় না। মধুপর্ক, পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য প্রভৃতি, সকল পূজারই প্রধান অঙ্গ। হোম নিত্যকর্ম্ম; চরু ব্যতীত কোন যজ্ঞ, এমন কি, দ্বিজের দ্বিজত্বই হয় না। গোময় পবিত্রতার আধার, স্বাস্থ্যের পরিবর্দ্ধক ও প্রধান ইন্ধন। গোমূত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধেরই উপকরণ গব্য দুগ্ধঘৃত। এমন পুষ্টি-কর, এমন দীর্ঘজীবনকর পদার্থ আর জগতে নাই। শিশুর দুগ্ধই জীবন। দুগ্ধঘৃত আমাদের সকলেরই প্রাণ। গোদুগ্ধজাত ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, ঘোল, দধি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির ন্যায় রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য দ্রব্য জগতে আর নাই। লক্ষ্মীরও উৎপত্তি গোধন হইতে। ধান্য যব তিল গোধূম শাক সবজি প্রভৃতি সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যই গোধনের সহায়তায় উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণেই কামধেনুর এত প্রশংসা। যাহার ঘরে ধেনু আছে, তাহার সবই আছে। বস্তুতঃ গোধন থাকিলে কিছুরই অভাব হয় না। তাই গাভী আমাদের ভগবতী, তাই গোব্রাহ্মণ হরিহরের ন্যায় একত্র মিলিত। এমন হিতকর গোজাতি আজি আহারাভাবে জীর্ণ শীর্ণ এবং কসাইয়ের ভয়ে নিয়ত ত্রস্ত। যে গোধনের সামান্য অপালনে হিন্দু পাপভয়ে কেশ মুণ্ডন করিয়া অনাহারী থাকিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, সেই গোধন এক্ষণে হিন্দু হস্তে করিয়া কসাইয়ের হস্তে দিতেছেন। গোপালনে আমাদের কাহারই যত্ন নাই। গোচারণের মাঠ নাই, ঘাস নাই, খোল

প্রকার খাদ্য নাই, উপযুক্ত সেবাও হয় না, আহার ও সেবার অভাবে গোজাতি দিন দিন রুগ্ন ও ক্ষীণ হইতেছে। বৃষোৎসর্গের সে হৃষ্টপুষ্ট বৃষ আর নাই; নিতান্ত দুর্ব্বল এঁড়েগরুই এক্ষণে গোবংশ বৃদ্ধি করিতেছে। গোপগণ বৎসগুলিকে কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া ফুকা দিয়া গাভী দোহন করে। মা ভগবতীর এই কষ্ট!!! কেবল এই পাপেই যে হিন্দুর এই অবনতি হইয়াছে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? গো-ব্রাহ্মণের অপালনেই ভারতের এই দুর্দ্দশা। ব্রাহ্মণ জ্ঞানধর্ম্মহীন, গোজাতি অমৃতোপম দুগ্ধহীন ও একান্ত শক্তিহীন।

আমাদেরই বাল্যকালে টাকা-মণ চাউল পাওয়া যাইত ও সচরাচর খাঁটী দুগ্ধ ২৲ টাকা মণ, ও তিন সের ঘৃত টাকায় ছিল, এক্ষণে ৪ টাকার কমে চাউল মিলে না, আট টাকা মনের দুগ্ধও খাঁটী নহে, এবং টাকায় অর্দ্ধ সের ঘৃতও সেরূপ উৎকৃষ্ট নহে। যে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি ঘৃত দ্বারা নিত্য হোম করিতেন, সে দেশে এক্ষণে ছিটা দিবার জন্যও একটু ঘৃত মিলে না। এক্ষণে চর্ব্বি-মিশ্রিত মহিষ-ঘৃত দ্বারা ঘৃতের সাধ মিটাইতে হইতেছে। গব্য দুগ্ধ ও ঘৃত ভিন্ন যে আহার, সে আহার যে আহারই নয়, এ কথা এখনকার লোকে জানেই না। দুগ্ধ এখন সখের খাদ্য হইয়াছে, নিত্য খাদ্য নহে; সুতরাং কিপ্রকারে আমাদের শক্তি, সারবত্তা ও ধর্ম্মভাব থাকিবে? আর কিছু দিন এই ভাবে চলিলে আমাদের সর্ব্বস্বধন গোধন এককালে লুপ্ত হইবে, ভগবতীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও অন্তর্হিত হইবেন। একে ত বিদেশীয়গণ নিয়তই আমাদিগকে লক্ষ্মীছাড়া করিতেছেন, সমস্ত শস্যই বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, ও তাহার জন্য নিয়তই দুর্ভিক্ষ লাগিয়া রহিয়াছে; তাহার উপর এরূপে গোধনের দুর্দ্দশা হইলে যে, আমাদিগের চিরদুর্ভিক্ষ ঘটিবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অতএব এখনও ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইয়া, হিন্দুর ন্যায় গোপালনে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি গোরক্ষার জন্য

সমগ্র দেশের যাবতীয় লোককে নগ্নপদে গললগ্নীকৃতবাসে নেত্রজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া রাজদ্বারে সমবেত হইতে হয়, তাহাও আমাদের কর্ত্তব্য। হিন্দুর দেশে চক্ষুর উপর নিয়ত গোহত্যা হইতেছে, এ কথা কি স্বর্গীয় পিতৃগণ বিশ্বাস করিতে পারেন? হায় হিন্দু! তোমার কি অধঃপতন হইয়াছে! আমাদের দেশের মুসলমানগণও গোধনের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। বঙ্গের মুসলমানের অধিকাংশই কৃষিব্যবসায়ী, তাঁহারা কখনই গোহত্যা বা গোমাংস-ভক্ষণ করেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গের কোন মুসলমানই গোহত্যা-পাপে লিপ্ত ছিলেন না। এক্ষণে আমাদের শিথিলতা বশতঃ ও রাজজাতির কূটরাজনীতির উৎসাহ পাইয়াই কেহ কেহ গোহত্যা করেন। এরূপ অবস্থাতেও অনেক সুপণ্ডিত মুসলমান গোবধ নিবারণের চেষ্টা করিতে-ছেন, অনেকে সভা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, গোবধ না করিলে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হয় না। অতএব চেষ্টা করিলে যে সমগ্র মুসলমান শ্রেণী আমাদের সহিত মিলিত হইয়া এক প্রাণে গোরক্ষায় মনোযোগী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণরক্ষার ন্যায় গোরক্ষার জন্যও ধনভাণ্ডার স্থাপন করা আবশ্যক, এবং সকলের পৃথক্‌ভাবে কায়মনোবাক্যে গোজাতির উন্নতিকল্পে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে দিন দিন যেরূপ দুগ্ধ ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইতেছে ও গোমূল্য যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ব্যবসায়বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়াও গোজাতির উন্নতি করিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে বহুপরিমিত ভূমি লইয়া যদি মহাজন-গণ গোচারণস্থান করেন, কতক ভূমিতে গরুর খাদ্য উৎপন্ন করেন, যাহাতে গোধন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তাহার উপযোগী আচ্ছাদন করেন, ও ভাল ভাল গো বৃষ সংগ্রহ করিয়া উত্তম করিয়া খাইতে দেন, তাহা হইলে যথেষ্ট পরি-মাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে ও হৃষ্টপুষ্ট গোবৎস জন্ম গ্রহণ করিবে। সেই দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং হৃষ্টপুষ্ট গো বিক্রয় করিয়া প্রভূত ধন লাভ হয়। ধর্ম্ম অর্থ উভয়ই লাভ হয়। চাকরীপ্রাণ ও বিলাতি দ্রব্যের ব্যবসায়িগণের এ

প্রবৃত্তি হইবে কি? এরূপে গোজাতির উন্নতি হইলে কেবল ঘৃত দুগ্ধাদিই সচ্ছল হইবে না, কৃষির উন্নতি হইয়া ভারত ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইবে। ইহার সঙ্গে লাঙ্গলের একটু উন্নতি করিতে পারিলে, সোণায় সোহাগা হয়। ভগবতী ও লক্ষ্মীর কৃপা হইলে আমাদের সর্ব্বাংশেই মঙ্গল হইবে।

তৃতীয় ধর্ম্মসাধন আমাদের শিল্পোন্নতি। শিল্প না থাকিলে সকলের বর্ণধর্ম্ম রক্ষিত হয় না, এবং প্রয়োজনীয় কার্য্যও চলে না। ভারতে কোন শিল্পেরই অভাব ছিল না; কিন্তু এখন অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েরও যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। এমন অবনতি হইয়াছে যে, বিদেশীয় শিল্প ভিন্ন আমাদের চলেই না। সত্য বটে আমরা যে সকল বিদেশীয় শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য; ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হইলে, তাহার অধিকাংশই ত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু এমন অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে যে, আজিকার কালে তাহা না হইলে চলে না। অধিক কি, আজি যদি আমরা প্রতিজ্ঞা করি বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিব না, সে প্রতিজ্ঞা পালন করা কঠিন হয়। কারণ দেশে এখন এত বস্ত্র প্রস্তুত হয় না যে, তদ্দ্বারা আমাদের সকল অভাব মোচন হয়। যদিও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের বস্ত্রেই আমাদের সংকুলান হইত, ও অনেক বস্ত্র বিদেশে যাইত; কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। বিলাতী বস্ত্র সুলভ হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারিয়া অধিকাংশ তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া দিয়াছে। যে অল্পসংখ্যক তাঁতি জাতীয় ব্যবসায়ের অবলম্বনে চলিতেছে, তাহারা সূক্ষ্মবস্ত্রই প্রস্তুত করে। সূক্ষ্ম বস্ত্র বিলাতে অদ্যাপি ভাল হয় না বলিয়াই দেশীয় তাঁতিগণ পারিশ্রমিক রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারিতেছে। মোটা কাপড়ে বিলাতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা অধিক, সেই জন্য তাহাতে তাঁতির লাভ থাকে না; তাহাতে পরিবার-পোষণ হয় না বলিয়া নিত্যব্যবহারোপযোগী মোটা কাপড় অল্পলোকেই বুনে। কাযেই এক্ষণে নিত্যব্যবহারোপযোগী বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পাইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প;

ঐ কারণে সর্ব্বপ্রকার জামাজোড়ার কাপড়ও মিলে না। যত মোটাই হউক, যত অপকৃষ্টই হউক, তাহাই পারিব, এরূপ সংকল্প করিলে কোনরূপে কিছু-দিন চলিতে পারে বটে; কিন্তু এরূপ ধর্ম্মহীনের কালে আপামর সাধারণের এরূপ একমত হওয়ার আশা নিতান্ত অল্প। হইলেও, অধিক দিন লোকে এরূপ প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে না। অতএব দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে যাহাতে অল্প ব্যয়ে প্রভূত দেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, যাহাতে তন্তুবায়গণ পুনরায় স্ববৃত্তিপরায়ণ হইয়া পরিবার পালন করিতে পারে, তাহার উপায় করা আবশ্যক। বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে এ প্রয়োজন সাধিত হইবে না। তাহা হইলে বর্ণধর্ম্ম পালিত হইবে না, তাঁতির অন্নও হইবে না; ধনবান্‌দিগেরই ধন বৃদ্ধি হইবে মাত্র, বৈষম্যই বাড়িবে মাত্র। বর্ণধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, দেশের দারিদ্র্য নিবারণ করিতে হইলে; যাহাতে তাঁতের উৎকর্ষ হয়, চরকার উৎকর্ষ হয় ও দেশে উৎকৃষ্ট তূলা জন্মে, তাহার উপায় করিতে হইবে। যদি দেশীয় তূলায় উন্নত চরকায় সূতা কাটা হয়, ও সেই সূতা দ্বারা উন্নত তাঁতে বস্ত্র বয়ন হয়, তাহা হইলে বিলাতী বাষ্পীয়যন্ত্রজাত বস্ত্র অপেক্ষাও সস্তা হইবে; কাপড়ও ভাল হইবে, সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মরক্ষা করিয়া তন্তুবায়গণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। এইরূপে প্রয়োজনীয় সকল শিল্পেরই উন্নতি করা আবশ্যক। বাষ্পীয় যন্ত্রের যে এককালে প্রয়োজন হইবে না, তাহা নহে। যে সকল কার্য্য যন্ত্রসাহায্য ভিন্ন সুসম্পন্ন হয় না, সে সকল কার্য্য যন্ত্রসাহায্যেই করিতে হইবে; আপাততঃ সূতা, লৌহাদি ধাতুদ্রব্য, দীপশলাকা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রয়োজন। অল্প-সংখ্যক বস্ত্রের কলও কিছুকালের জন্য প্রয়োজনীয়। ইহার জন্যও আমাদের ধনভাণ্ডারের আবশ্যক। কি যন্ত্রশিল্প, কি হস্তশিল্প, সকলই এক্ষণে সাধারণের যত্নে ও অর্থে সম্পন্ন করিতে হইবে। কোম্পানি করিয়া কার্য্য করিবার সময় এখনও আমাদের হয় নাই। কৃষকেরা তূলা বপন করুক, পূর্ব্বের ন্যায় সমগ্র স্ত্রীজাতি চরকা কাটুক, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ভাল চরকা ও ভাল তাঁত

প্রস্তুত করুন, সাধারণ ধন হইতে সাহায্য করিয়া এইসকল কার্য্যের উৎসাহ দেওয়া হউক; অচিরে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যাঁহাদের ধন আছে, তাঁহারা উন্নত তাঁত কিনিয়া তন্তুবায়দিগকে ভাড়া দিউন, অথবা তন্তুবায়গণকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করুন, তূলার আবাদ করিয়া ঘরে ঘরে তূলা ও চরকা দিয়া সূতা প্রস্তুত করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভূত লাভ হইবে। বড় বড় ধনীরা একাই এক একটী বাষ্পীয় যন্ত্র চালাইতে পারেন। দুই চার জন ধনী মিলিত হইয়াও অনেক যন্ত্র চালাইতে পারেন। যখন অধিক বাষ্পীয় যন্ত্র স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে, তখন এইরূপেই বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি প্রভৃতি বিদেশীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যাহাতে এ দেশে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেদের ত কথাই নাই; ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরাও এক্ষণে অনায়াসেই সূতা কাটিতে পারেন। এক্ষণে অগ্নিতাপে রন্ধন করিলে গৃহলক্ষ্মীদের পীড়া হয়, কাযেই এক্ষণে ঘরে ঘরে রাঁধুনি। স্ত্রীলোকেরা অকর্ম্মণ্য উল্ বুনিয়া ও নাটক নবেল পড়িয়া সময় নষ্ট করেন; তাহা না করিয়া সকলেই সূতা কাটিতে পারেন। যে দেশের রমণীগণ যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, চিতারোহণে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছেন, ও বিদেশীয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষিত হইবার জন্য আপন আপন অলঙ্কার মোচন করিয়া দিয়াছেন, সে দেশের স্ত্রীজাতিরা এই সামান্য কাযটা করিতে পারিবেন না? স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া উপার্জ্জন করিলে দেশের উন্নতি হইবে মনে করিয়া যে শিক্ষিত সমাজ স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, সে শিক্ষিত সম্প্রদায় আপন আপন পরিবারকে এই সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লজ্জা বোধ করিবেন? তাহা যদি হয়, তবে আর উন্নতির নাম কেন? আপনারা গোলামী করুন, সাহেবদের মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করুন, আর স্ত্রীদিগকে স্বর্ণমুক্তা-খচিত করিয়া শিঞ্জন-ধ্বনি শ্রবণ করুন।

বাণিজ্যেরও উন্নতি করা প্রয়োজনীয় বটে, তবে এক্ষণে বহির্বাণিজ্যের

তত প্রয়োজন নাই। কেননা ভারত-মাতার কল্যাণে আমরা কিছুরই কাঙ্গাল নই, প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই ভারতে পাওয়া যায়। তবে উদ্বৃত্ত দ্রব্য বিদেশে পাঠাইলে অর্থের আগম হয় এইজন্য, ও বিদেশীয় শিল্পাদি শিক্ষা করিয়া উন্নতি লাভের জন্য বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন। সকলেরই তাহাতে লিপ্ত হইতে হইবে না। আপাততঃ শিক্ষাদির জন্য বর্ষে বর্ষে কতকগুলি লোককে কোন কোন দেশে পাঠাইলেই হইতে পারে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন বর্ণের হিন্দুগণ পূর্ব্বোক্তরূপ আচারাদিপরায়ণ হইয়া যাইতে পারেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণকে পাঠাইলেও চলিতে পারে। তাঁহারা শিক্ষা করিয়া আসিয়া দেশীয়গণকে শিক্ষা দিতে পারেন। প্রথমোক্ত তিন বিষয়ের যদি যথোচিত উন্নতি হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ের উন্নতির ব্যাঘাত হইবে না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসায় আমাদের শরীর জর্জ্জরিত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভেষজ আমাদের দেহের নিতান্ত অনুপযোগী। তাহাতে দিন দিন আমাদের শরীর ভগ্ন হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আমাদের উপযোগী, উহার ফলও স্থায়ী। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি দূরে থাকুক, দিন দিন অবনতিই হইতেছে। প্রকৃত শিক্ষা ত হয়ই না, ঔষধের উপরকরণও মিলে না। অধিকাংশ চিকিৎসকই গাছ-গাছড়া চেনেন না। সামান্য লোকের হাতেই এ কার্য্যের ভার। তাহারা যাহা আনিয়া দেয়, তাহা সমস্ত প্রকৃত নহে; প্রকৃত হইলেও একান্ত গুণহীন। অতএব যাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের স্বাস্থ্য, পরমায়ু ও কার্য্যশক্তি ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এবং ইহা বর্ণবিশেষের বর্ণধর্ম্ম। যাহাতে তাঁহারা বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে পারেন, তাহার উপায়ও করা উচিত। অতএব যাহাতে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়, তৎসংশ্লিষ্ট চিকিৎসালয়, ও উদ্ভিজ্জোদ্যানাদি স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমাদের সুশিক্ষা বিধানের উপায় করাও কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা

কেবল চাকরি করিবার উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছি। কেবল তাহা না করিয়া যাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি, ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিতে পারি, তাহার উপায় করা আবশ্যক। কেবল গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না। আবশ্যক হইলে স্বতন্ত্র স্কুল, টোলাদির স্থাপন করিতে হইবে, এবং যে সকল স্কুল. গবর্ণমেণ্টের নিজ ব্যয়ে ও আংশিক সাহায্যে চলিতেছে, সে সকল স্কুলে ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য আবশ্যক মত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে হইবে। যে সকল গ্রন্থ ছাত্রদিগকে পড়ান হয়, তাহাতে এমন কোন বিষয় না থাকে, যাহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হয়; বাল্যকাল হইতে যাহাতে ছাত্রগণের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কোন প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া কুপ্রবৃত্তি-পরায়ণ না হয়, সে সকল বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবার উপায় করিতে হইবে। বালকেরাই ভবিষ্যতের আশা, এবং বাল্যকালে অভ্যাস না হইলে হৃদয়ের সহিত কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া যায় না। অতএব এ বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য ও বল না থাকিলে কোন ধর্ম্মই সাধিত হয় না। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং'।

এইরূপ নানা প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য আমাদের হাতে আছে, সে সকলের উল্লেখ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভবে না। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। বৃথা কার্য্য, বৃথা আমোদ ত্যাগ করিয়া, যদি আমরা এই সকল দিকে দৃষ্টি করি, তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইলে এসব কার্য্য আমাদের অসাধ্যও নহে। এখনও আমরা এককালে ধন ও বলহীন হই নাই, এখনও যদি আমরা বিলাস ত্যাগ করি, তাহা হইলে সকলেরই কিছু কিছু ধন উদ্বৃত্ত হয়, তাহার কিয়দংশ সকলেই এই সকল হিতকর কার্য্য সাধনের জন্য দিতে পারেন। এখনও রাজা মহারাজগণ, উচ্চপদস্থগণ, ব্যবসায়িগণ নানা উপলক্ষে নানা

ধন ব্যয় করিতেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনাদির জন্য এখনও বৎসর বৎসর প্রভূত ধন ব্যয় হয়। এই সকল অযথা ব্যয় ত্যাগ করিয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অনায়াসেই এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। তাহা হইলে আমাদের ধন, বল, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কার্য্যশক্তি, সকলই বৃদ্ধি পাইতে পারে। তখন রাজকীয় বড় বড় কর্ম্মও আমরা পাইব। আমরা যদি যোগ্য হই, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও রাজভক্ত হই, তাহা হইলে সমস্ত উচ্চপদই আমরা পাইব। এমন কি, শাসনকর্ত্তা, সেনানী প্রভৃতির পদ'ও পাইব। হয় ত পরিশেষে যখন ইংরাজরাজ দেখিবেন, আমরা স্বদেশ রক্ষা ও স্বদেশের উন্নতি করিবার শক্তি লাভ করিয়াছি, তখন আমাদের হস্তে রাজ্যভার দিয়া স্বদেশযাত্রা করিবেন। শক্তিলাভ হইলে সকলই সম্ভব। অতএব কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আশ্রয়ে শক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অধ্যবসায় ভিন্ন কোন কার্য্যই হয় না, সংযম না থাকিলে অধ্যবসায় থাকে না, ধর্ম্মাচরণে অভ্যাস না করিলে সংযম হয় না, ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্মা-চরণে মন যায় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

যদি কেহ মনে করেন ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণে ফললাভ হইবে না, তাহা হইলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ কর্ত্তব্য। কেননা যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে, যে ভাবে আমরা চলিতেছি, সে ভাবে চলিলে যে অচিরেই আমাদের নিপাত হইবে, এ কথা নিশ্চয়। সুতরাং যখন রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও মরিব, তখন রামের হাতে মরাই ভাল—ধর্ম্মপথে থাকিয়া মরাই ভাল। ভগবান্ বলিয়াছেন——

'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্॥

গীতার এই সকল মহাবাক্য স্মরণ করিয়া স্বধর্ম্মপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি মরিতে হয়, তাহা হইলে গৌরবময় Martyr আখ্যা গ্রহণ করিয়া মরিব।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন নিঃস্বার্থভাবে স্বধর্ম্ম পালনই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম বলিতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে না, বর্ণধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। কেননা ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

কেহ কেহ এই সকল শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করেন, কেহ বা এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলেন। বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। কারণ গীতা প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় বর্ণধর্ম্ম পালনই গীতাকারের মতে মুখ্য ধর্ম্ম। কারণ অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি

দেওয়ার জন্যই গীতার অবতারণা। ভগবান্ প্রথমেই অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের আর নাই; কামনাশূন্য হইয়া শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।
সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্রানুযায়ী বর্ণধর্ম্ম, সেই জন্যই এইরূপ বলিয়াছেন। গীতার সর্ব্বত্রই এইভাবে পরিপূর্ণ। স্বধর্ম্মপালন, শাস্ত্রের অনুসরণ ও কামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করার উপদেশই গীতার সার কথা। সুখদুঃখ, লাভালাভ সমান জ্ঞান করিয়া কেবল কর্ত্তব্য ভাবিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় রিপুর চরিতার্থতা সম্পাদন জন্য কোন কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রবিধি মানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্র মানিতে হইলে, বর্ণধর্ম্ম পালন একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ মন্বাদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মতে বর্ণধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম। কামনাশূন্য হইয়া কার্য্য করিতে হইলেও বর্ণধর্ম্ম-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। বর্ণধর্ম্মপরায়ণ না হইলে কামনাশূন্য কার্য্য হইতে পারে না। কারণ কোনরূপ কামনা না থাকিলে কেহই পিত্রবলম্বিত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করে না; অধিকতর ধন মানাদির আশাতেই লোকে বৃত্তি নির্ব্বাচন করে। যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে ধনাদির বৃদ্ধি করিয়া উচ্চ পদে আরোহণ করিতে এবং ইচ্ছানুরূপ ভোগ্য লাভ করিয়া সুখী হইতে পারা যায় মনে হয়, লোকে সেই বৃত্তিরই অবলম্বনের চেষ্টা করে। সুতরাং নির্ব্বাচিত বৃত্তির অবলম্বনে যাহারা কার্য্য করেন, কামনাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কামনাই যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা কামনাশূন্য হইবেন কি প্রকারে? লাভই যাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদের লাভালাভ সমান জ্ঞান হইবে কি প্রকারে? নিষ্কামভাবে কার্য্য করিতে হইলে যাহাতে আদৌ কামনার উদয় না হয়,

তাহারই চেষ্টা করিতে হয়। জন্মকাল হইতে পিত্রবলম্বিত কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। যাঁহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ পৈতৃক কার্য্যে বাল্যকাল হইতে স্বাভাবিক কার্য্যের ন্যায় নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের মনে কোন কামনা না থাকিতে পারে; তাঁহাদের কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ, এ বিচারের আবশ্যক হয় না; ইহাই কর্ত্তব্য, ইহাই জীবনোপায়, এতদ্ব্যতীত আর কিছুই অবলম্বনীয় নয়; প্রচুর অর্থ হউক আর নাই হউক, একাগ্রচিত্তে ইহাই কর্ত্তব্য, জন্মকাল হইতে এই বিশ্বাস থাকায় মনে কামনার উদয়ই হয় না। ক্ষুধার সময় যেমন আহার করিতে হয়, নিদ্রার সময় যেমন নিদ্রা যাইতে হয়, সেইরূপ কার্য্যের সময় পৈতৃক বৃত্তিপরায়ণ হইতে হয় মনে করিয়া স্বভাবনির্দ্দিষ্টের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকেন। তাহাতেই যাহা যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহাতেই তুষ্ট থাকেন। চেষ্টা করিলে ইঁহারাই লাভালাভ সমানজ্ঞান করিয়া কার্য্য করিতে পারেন। সকলে সেরূপ না হইলেও, যাঁহারা সাধু, তাঁহারা যে এইরূপে কামনার বশবর্ত্তী হয়েন না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জন্ম অনুসারে বৃত্তি ও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে অতি সদাশয় সাধুও নিষ্কাম হইতে পারেন না। অতএব যদি গীতার উপদেশ মানিতে হয়, যদি নিষ্কাম ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া বা Dutyর অনুরোধে কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া প্রধান ধর্ম্ম হয়, তবে বর্ণধর্ম্ম পালনই মানবের কর্ত্তব্য। এইরূপে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইলে মানুষকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব দুঃখনিবৃত্তি যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও বর্ণধর্ম্মপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য। আজিকালি হিন্দুধর্ম্মের সকল কথায় সাধারণের সেরূপ শ্রদ্ধা না থাকিলেও গীতার প্রতি শ্রদ্ধা সকলেরই আছে। এমন কি, অনেক বিধর্ম্মীও গীতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অতএব যখন গীতার মতে স্বধর্ম্মপালন প্রধান ধর্ম্ম, তখন যাহাতে লোকে স্বধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষিতগণকেই নেতা হইতে হইবে।

এক্ষণে কথা এই যে, কে এই স্রোত ফিরাইবে? কাহার কথা কে শুনে? এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, এক্ষণে যে স্রোত বহিতেছে, সে স্রোতের প্রবর্ত্তক কে? কোনও অসাধারণ পুরুষের নেতৃত্বে কি এক দিনেই এই ভাব ধারণ করিয়াছে? কখনই না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, শিক্ষিত দলই ইহার নেতা। আমাদের দেশ পূর্ব্বে জ্ঞান ও ধনে প্রধান ছিল বটে, কিন্তু বহুদিন হইতে বিদেশীয় শাসনের অধীন থাকিয়া জ্ঞান ধন উভয় হইতে আমরা এককালে বঞ্চিত হইতেছিলাম। কেবল ধর্ম্মে যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আমাদের অস্তিত্ব ছিল; ইংরাজি শিক্ষার ফলে সে ধর্ম্মেও আর দৃঢ়তা থাকিল না। মিশনরিগণের বক্তৃতায় ও পাশ্চাত্য যুক্তির প্রভাবে আমাদের ধর্ম্ম একেবারে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইংরাজি শিক্ষিতগণ তাঁহাদের উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেহ খৃষ্টান ও কেহ নাস্তিক হইলেন; যাঁহাদের জাতীয় গৌরব প্রবল, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়া ধর্ম্মপিপাসা মিটাইলেন; হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাদের সকলেরই নিকট নিতান্ত ঘৃণার বিষয় হইল; এমন কি, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর রীতিনীতি অনুসারে না চলায়, তাঁহাদের অনেক বিষয়ে সুবিধাও বোধ হইল; পূজা পার্ব্বণ বারব্রত অতিথিসেবা পিতামাতার ও ভ্রাত্রাদির পালনরূপ কার্য্যে লোকের যে ব্যয় হয়, তাহা তাঁহাদের করিতে হয় না, সমস্ত অর্থই নিজের ও পরিবারের সুখবিধানে ব্যয় করিয়া মহাসুখী বোধ করিলেন। ভূস্বামিগণের অপেক্ষাও উচ্চে উঠিলেন। ইংরাজি শিক্ষিতগণই শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার, হাকিম প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত ও রাজার নিকট সম্মানিত হইলেন, অর্থও প্রচুর উপার্জ্জন হইতে লাগিল; সুন্দর পরিচ্ছদ, উত্তম গৃহ, নানাপ্রকার গৃহোপকরণ হইল। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, সকল

বিষয়েই তাঁহারা শীর্ষস্থানীয় হইলেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের সকলকেই তাঁহারা মূর্খ ও কুসংস্কারসম্পন্ন জ্ঞানে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। কাযেই সাধারণ জ্ঞানহীন জনগণের ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমেই শিথিল হইতে লাগিল। সুখের আকর্ষণ ত্যাগ করা সহজ নহে, কাযেই শিক্ষিতের আদর্শে সমাজ গঠিত হইতে লাগিল। শিক্ষিতেরা মদ্যপান করেন, হিন্দুর অভক্ষ্য ভোজন করেন, পাশ্চত্য অনুকরণে বেশ পরিধান করেন, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে মূর্খ জ্ঞানে ঘৃণা করেন; স্ত্রীই একমাত্র উপাস্য দেবতা-রূপে পূজিত হইলেন। তাহাতে তাঁহারা সুখী ও সম্মানিত হইয়াছেন দেখিয়া, ক্রমে সকলেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতে লাগিল। "যদ্ যদা-চরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ"। সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা ধনীদিগের সহিত সমকক্ষতা করিতে লাগিলেন। নীচ জাতীয়েরাও ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অপেক্ষাও সম্মান লাভ করিলেন। পূর্ব্বে ধনী জমীদারবর্গ উচ্চ চা'লে চলিতেন, মধ্যমেরা মধ্যম চা'লে চলিতেন, নিম্নগণ নিম্ন চা'লে চলিতেন। সে উচ্চনীচ ভাব আর থাকিল না, সকলেই সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন; শিক্ষিতগণ বিলাতী অনুকরণে বেশ ধারণ করিয়া সভ্য হইলেন, পূজা পার্ব্বণাদিও ত্যাগ করিয়া গৌরবজনক কুসংস্কারবিহীন, সভ্য ও ধার্ম্মিক নামে অভিহিত হইলেন, এবং স্কুল ও ডাক্তারখানায় কিছু কিছু চাঁদা দিয়া দানশীল আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহারা দেশের শীর্ষস্থানীয় ও আদর্শ হইয়া পড়িলেন। সে সময়ে এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাদিতা, সরলতাদি কোন কোন গুণেরও বিকাশ হইয়াছিল। তখনকার শিক্ষিতগণ মিথ্যাবাক্য কহা, উৎকোচ গ্রহণ করা, পক্ষপাত করা প্রভৃতিকে বড়ই ঘৃণা করিতেন। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে অনেক ক্ষতিও স্বীকার করি-তেন। সাধারণ হিন্দুর মধ্যে সে সময়ে অনেকে ঐ সকলকে তাদৃশ পাপ মনে করিতেন না। কাজেই অনেকের চক্ষে শিক্ষিতগণ পরম ধার্ম্মিক নামে অভিহিত হইলেন। সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিতগণ সমাজের শীর্ষস্থানে বসি-

লেন। প্রথমে প্রাচীন গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিলেও, শেষে তাঁহারাই Old fool নামে অভিহিত হইলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সংক্রান্তি, সং প্রভৃতি নামে ঘৃণিত হইতে লাগিলেন, ও পরিশেষে অর্থের ও সম্মানের লোভে আপন আপন পুত্রগণকে ইংরাজি শিখিতে দিলেন। তদবধি ইংরাজি শিক্ষিতগণই শিক্ষিত নামে অভিহিত হইলেন। সংস্কৃত ভাষায় যিনি মহা-মহোপাধ্যায় হইয়াছেন, বেদ ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি শিক্ষিত আখ্যা ধারণের অধিকারী নহেন; তাঁহাদের শিক্ষা শিক্ষাই নহে, নিতান্ত ভ্রান্ত শিক্ষা। যাঁহারা ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষিত, এবং তাঁহাদের মতই শ্রেষ্ঠ মত, ইহাই সাধারণ মত হইল। ঐ শিক্ষিতেরা যে স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন, সেই স্রোতই বহমান হইল। ইহার অনুকরণও অতি সহজ, বিলাতি বেশ ধারণ করিতে কিছু বেশী লাগিলেও ক্রিয়াকর্ম্মাদির ব্যয় কমিয়া গেল, সুখভোগের পথ প্রসর হইল। মদ্যপান, হোটেলে খাওয়া, বিলাতী বেশ পরিধান, স্ত্রী-পুত্রমাত্র প্রতি-পালনই সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হইল। এইরূপ শিক্ষিতের আদর্শে আমাদের ধর্ম্ম, শিল্প, মনুষ্যত্ব, সুখ, সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষানুযায়ী শিক্ষিতের দ্বারাই আমাদের এই বর্ত্তমান স্রোতের উৎপত্তি ও প্রবলতা। ইহার জন্য কোন মহা-জন আবির্ভূত হয়েন নাই। সুতরাং আমাদের এই স্রোত ফিরাই-বার জন্যও কোন মহাজনের আবশ্যকতা নাই। শিক্ষিতগণ চেষ্টা করিলেই এ স্রোত ফিরিয়া যাইবে। তবে মন্দ শিক্ষা যত সহজে হয়, ভাল শিক্ষা সেরূপ সহজে হয় না। এইজন্য শিক্ষিতগণের একটু মাত্রা চড়ান আবশ্যক। যতটুকু আবশ্যক, তাহারও অপেক্ষা অধিক উচ্চে উঠা আবশ্যক। শিক্ষিতগণ যদি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে চলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনুকরণে অশিক্ষিতেরাও আবার ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হইবেন। শিক্ষিতগণ যদি বেশভূষার আড়ম্বর ত্যাগ করেন ও সংযমপরায়ণ হয়েন,

তাহা হইলে অশিক্ষিতেরাও তদনুসরণ করিবে। যদি শিক্ষিতেরা সর্ব্বদাই দেশী মোটা কাপড় পরিধান করেন, সভা সমিতি ও নিমন্ত্রণাদি স্থানে দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গমন করেন, যদি দেশীয় বিবিধ ব্যঞ্জনাদিতে নিমন্ত্রিতগণের তৃপ্তি সম্পাদনের চেষ্টা করেন, সাধ্যমত পূজা পার্ব্বণ ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠানপরায়ণ হয়েন, পরিবারকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করা অপেক্ষা ভ্রাতা প্রভৃতির প্রতিপালন ও পিতামাতার তুষ্টি বিধানে অধিক মনোযোগী হয়েন, বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া যদি সজ্জন, ব্রাহ্মণ ও দেশীয় শিল্প রক্ষণে মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে ক্রমে সকলেই সেই পথাবলম্বী হইবে। কেবল বক্তৃতা করিলে হইবে না, উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহারা পদস্থ, মাননীয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন, তাঁহাদিগকেই অগ্রে পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। কেননা তাঁহাদের মান সম্ভ্রম আছে; তাঁহারা যদি সামান্য বেশে সভা সমিতিতে উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্ভ্রমের হানি হইবে না, বরং বিদ্যাসাগরের ন্যায় তাঁহাদের সম্ভ্রমের বৃদ্ধি হইবে। শিক্ষিতেরা বিলাতিবেশধারী বৃথা-আমোদপ্রিয়গণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে থাকিলে, ক্রমে সামান্য বেশ উচ্চতার লক্ষণ হইয়া পড়িবে। যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগের প্রয়োজন মত বেশ বিন্যাসের আবশ্যকতা বটে। কৃষকের যেমন হল, তন্তুবায়ের যেমন তাঁত, সূত্রধরের যেমন অস্ত্রাদি যন্ত্রস্বরূপ, তাঁহাদেরও সে বেশ সেইরূপ উপার্জ্জনের যন্ত্রস্বরূপ হইবে মাত্র। কেবল সেইরূপ প্রয়োজন সময়েই তাহা ব্যবহার করিবেন। তাহাও যতদূর দেশীয় দ্রব্যের দ্বারা দেশীয় ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়েই তাঁহাদিগকে অগ্রণী হইতে হইবে।

যাঁহারা মনে করেন, আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের উচ্চস্তরে উঠিয়াছি, নিম্নস্তরের ক্রিয়াকাণ্ডে আমাদের প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের সে অভিমান ত্যাগ করিতে

হইবে। যদি বাস্তবিক তাঁহারা উচ্চস্তরে উঠিয়া থাকেন, নিরাকার উপাসনা করিবার শক্তি জন্মিয়া থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও কর্ত্তব্যের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া থাকেন, পরমহংসের ন্যায় অনুষ্ঠানধর্ম্মের পালন অনাবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলেও যত দিন গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেন ততদিন সমাজের খাতিরে তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুষ্ঠানপরায়ণ হইতে হইবে। যতদিন তাঁহার পরিবারবর্গ, প্রতিবেশিবর্গ, স্বদেশীয় জনগণ তাঁহার ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল নিয়মই পালন করিতে হইবে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

গীতা।

তুমি বুঝিয়াছ, তাই ফুল জল দিয়া পূজা না করিয়া ভক্তিভাবে হৃদয়ের অন্তস্তলে ঈশ্বরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মনে মনে ঈশ্বর উপাসনা কর; কিন্তু তোমার পরিবারবর্গ, সন্তানসন্ততি ও প্রতিবেশিবর্গ তাহা বুঝে নাই, তাহারা সেরূপে উপাসনা করিতে পারে না, তোমার উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারে না, কাযেই তোমার দেখাদেখি পূজা ও সন্ধ্যাহ্নিক পরিত্যাগ করে, অথচ তোমার ন্যায় ভক্তিভাবে ভগবান্‌কে ডাকে না, ও তোমার ন্যায় সংযমীও হইতে পারে না। অতএব যাহাতে অজ্ঞানগণের সন্দেহ না জন্মে, এই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। যাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্মে সকলের আনন্দ বোধ হয়, তাহা করিতে হইবে। তাই পূজায় বাদ্য-নৃত্য-গীতের আয়োজন ও ভূরিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলতঃ যদি শিক্ষিতগণ বুঝেন যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, ও তদনুসারে সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পথপ্রদর্শক হয়েন, তাহা হইলে এখন সকলেই সেই পথের অনুসরণ করিবেন।

সুখের বিষয়, এক্ষণে শিক্ষিতগণ সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন,

পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিচার-শক্তির প্রখরতা হইয়াছে। সকল দেশের ধর্ম্ম রীতিনীতি প্রভৃতির সহিত সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকলের তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে কায়মনোবাক্যে স্বধর্ম্মের পরিরক্ষণ করিয়া স্বজাতির রক্ষা বিধানে যত্নশীল হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও সুখের কথা এই যে, বঙ্গের ধনমানজ্ঞানোজ্জ্বল কায়স্থ সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়ের আসনে বসিতেছেন; হ্যাট, কোট, প্যাণ্টুলন অপেক্ষা তাঁহারা উপবীতকে অধিক সৌন্দর্য্যবিধায়ক মনে করিয়াছেন। তাঁহারা যে কেবল নাম ও উপবীত চিহ্ন দ্বারাই আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বের জ্ঞাপন করিবেন, ব্রাহ্মণের প্রতিনমস্কার ও অন্যান্য জাতির প্রণাম গ্রহণের জন্যই উপবীত ধারণ করিবেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না; অবশ্যই তাঁহারা ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিবেন। অসিজীবী না হইয়া মসিজীবী হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম—রাজজাতির ধর্ম্ম পালন করিবেন; প্রজারক্ষাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। কেবল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিলেই প্রজারক্ষা করা হয় না, যাহাতে প্রজার ধর্ম্মরক্ষা হয়, আহারাভাবে কেহ কষ্ট না পায়, যাহাতে সকলেরই শিক্ষাবিধান হয়, সে সকলও রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। কালিদাস দিলীপের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি।
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ॥

রক্ষণকার্য্য ও দণ্ডনীতি ইংরাজরাজের হস্তে থাকিলেও ভরণ ও বিনয়াধানের ভার ক্ষত্রিয়ের উপর এখনও আছে; কেননা উহা তাঁহাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম। অতএব আশা করা যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার উপায় করিয়া আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা করিবেন।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

এই গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের বঙ্গানুবাদ।

২ পৃষ্ঠা—আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, ঐ সকল পশু ও মানব উভয়েরই আছে। কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষত্বের হেতু ; সুতরাং ধর্ম্মহীন হইলে মনুষ্য পশুরই তুল্য।

৯৯ পৃষ্ঠা—যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না ; তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। গীতা ৬।৩

১০০ পৃষ্ঠা—যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই নিষ্কাম ভক্ত কর্ত্তৃক ভক্তিসহকারে প্রদত্ত পত্র পুষ্পাদি গ্রহণ করি। গীতা ৯।২৬

হে কুন্তীনন্দন! যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে। গীতা ৯।২৭

১০১ পৃষ্ঠা—হে কুন্তীনন্দন, শ্রদ্ধান্বিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া যাঁহারা অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকেন। গীতা ৯।২৩

যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ! মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজন-মার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। গীতা ৪।১১

যে যে ভক্ত মদীয় যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ভক্তের তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি। গীতা ৭।২১

সেই ভক্ত তাদৃশ শ্রদ্ধা সহকারে সেই মূর্ত্তির আরাধনা করে ; এবং সেই সেই দেবতা হইতে আমা কর্ত্তৃকই বিহিত কামনা সকল লাভ করে। গীতা ৭।২২

১০৩ পৃষ্ঠা—শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ ও পরা গতি কিছুই লাভ করিতে পারে না। গীতা ১৬।২৩

অতএব ইহা কর্ত্তব্য, ইহা অকর্ত্তব্য এই তত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার কর্ত্তব্যের নির্ণায়ক ; শাস্ত্রোক্ত বিধি সকল জানিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। গীতা ১৬।২৪

১০৩।৪ পৃষ্ঠা—যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি দম্ভ এবং অহঙ্কার সহকারে কামনা ও আসক্তিপরায়ণ হইয়া বৃথা শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তর্যামিরূপে দেহমধ্যে অবস্থিত

আমাকে কৃশীকৃত করিয়া শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ অত্যুগ্র তপস্যা করে, তাহাদিগকে অতি ক্রূরকর্ম্মা অসুর বলিয়া জানিবে। গীতা ১৭।৫,৬

১০৯ পৃষ্ঠা—যে ধর্ম্ম ধর্ম্মবিরোধী, সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়—কুধর্ম্ম-স্বরূপ।

১২৪ পৃষ্ঠা—দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করেন, অতএব তাঁহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে, সে চোরই। গীতা ৩।১২

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ পঞ্চশূনাদিকৃত সকল পাপ হইতেই মুক্ত হয়েন। যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোগ করে। গীতা ৩।১৩

১২৬ পৃষ্ঠা—উপভোগের দ্বারা কামনার উপশম হয় না। অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়, উপভোগের দ্বারা সেইরূপ কামনা বৃদ্ধি হয়।

১৩৫ পৃষ্ঠা—যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্ট না হয়, অথবা অভাব পক্ষে অল্পমাত্রই পীড়ন হয়, আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময়ে এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।

প্রাণযাত্রামাত্র চলিয়া যায়, এই লক্ষ্য রাখিয়া শরীরকে কোন ক্লেশ না দিয়া, স্বকীয় বর্ণ-বিহিত অনিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবেন।

জীবিকার জন্য কখন লোকবৃত্তি অর্থাৎ তোষামোদ ভাঁড়ামি প্রভৃতি করিবে না। যাহার অবলম্বনে কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা বিশুদ্ধ, যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্রও নাই, এইরূপ ব্রাহ্মণ-জীবিকা দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিবেন।

সুখার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত হইবেন। সন্তোষই সুখের মূল, ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ।

ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় ভিক্ষাচরণ ও সায়ং প্রাতে অগ্নিতে হোম না করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহাকে সপ্তরাত্র অবকীর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

আচারহীন, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহ, নিত্য যাচ্ঞা-পরায়ণ, কৃষিজীবী ও ক্লীপদী ব্রাহ্মণ সাধুদিগের নিন্দিত।

আপনার যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যেপ্রকার বেদাধ্যয়ন ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশভূষা বাক্য বা বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবে।

১৩৬ পৃষ্ঠা—কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন, বেদহীন ব্রাহ্মণও তদ্রূপ; ইহারা তিনজনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে।

ক্লীবের স্ত্রীসহবাস যেমন নিষ্ফল, গাভীতে গাভীতে সঙ্গম যেমন কোন ফলদায়ক নহে, অজ্ঞে দান যেমন কোন কার্য্যেরই হয় না, তদ্রূপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও কোন কর্ম্মের নহে।

যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্য বিদ্যাদি লাভে যত্নবান্ হন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

তৃণের অগ্নি যেমন শীঘ্র নিবিয়া যায়, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। তৃণের অগ্নিতে যেমন কেহই ঘৃতাহুতি প্রদান করে না, জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকেও সেইরূপ হব্যাদি প্রদান করা উচিত নয়।

দাতা মোহ বশতঃ বেদাধ্যয়ন অথবা জ্ঞানানুষ্ঠানশূন্য ভস্মের ন্যায় নিস্তেজ ব্রাহ্মণকে যে হব্যকব্য দান করেন, তাহা নিষ্ফল হয়।

বিদ্যা ও তপস্তেজঃসম্পন্ন অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের মুখে যে হব্যকব্যের আহুতি প্রদত্ত হয়, তদ্দারা বিবিধ সঙ্কট হইতে ও মহৎ পাপ সকল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

দূর হইতে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান লইবে। বংশপরম্পরাশুদ্ধ বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য-বহনে তীর্থস্বরূপ। এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্যায় মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদানভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল ধর্ম্মতঃ একা ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্যকব্য প্রদান করা উচিত। রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখনও শুদ্ধ হয় না। অর্থ এই যে, মূর্খ পাপী লোকদিগকে ভোজন করাইয়া পাপীর পাপ কখনও বিদূরিত হয় না।

অজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্যকব্যের যে কয়েকটী গ্রাস ভোজন করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়।

যে গ্রামবাসিগণ মিথ্যাপরায়ণ ও অধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষা দেয়, সে গ্রাম চৌরপালক। রাজা সে গ্রামবাসীর দণ্ড বিধান করিবেন। পরাশর ৫৬।১

১৩৭ পৃষ্ঠা—যে অধ্যাপক বেতন লইয়া অধ্যাপনা করেন সেই অধ্যাপক, যে শিষ্য তাদৃশ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করে সেই শিষ্য, এবং যে গুরু শূদ্রকে শিষ্য করেন ও নিষ্ঠুরভাবী, তাহারা কুণ্ড ও গোলক। (স্বামীর জীবিতাবস্থায় জারজ সন্তানকে কুণ্ড বলে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর জারজ সন্তানকে গোলক বলে)।

ধর্ম্মজ্ঞ শিষ্য গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে কিঞ্চিন্মাত্র ধনও গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দিবেন না। পরন্তু যখন গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রতসমাপন স্নান করিবেন, তখন গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবেন।

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর বেদত্রয়াধ্যয়ন করিবেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল বা চতুর্থাংশ কাল, কিংবা সমগ্র বেদের শিক্ষায় যত দিন আবশ্যক তত-কাল গুরুগৃহে যাপন করিবেন।

অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় সমগ্র বেদ, বা দুই বেদ, বা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

ক্ষেত্র, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র, পাদুকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র, যাহা সাধ্য গুরুকে প্রদান করিয়া প্রীতিসাধন করিবে।

১৩৮ পৃষ্ঠা—দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল বিশেষরূপে না জানিয়া প্রাজ্ঞজনে ক্ষুধায় অবসন্ন হইলেও কখনও প্রতিগ্রহ করিবেন না।

ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না। যাহারা পশু বিনাশ করিয়া মাংস বিক্রয় করে, যাহারা তৈল বিক্রয় করে, যাহারা মদ্য বিক্রয় করে ও যাহারা বেশ্যার আয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, ইহাদের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না।

লুব্ধ শাস্ত্রমার্গপরিত্যাগী ক্ষত্রিয় রাজার নিকটও যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করে, সে ক্রমান্বয়ে একবিংশতি নরক ভোগ করে।

ব্রাহ্মণগণের নিন্দিতাধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ, এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহই অতীব নিকৃষ্ট।

প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হইয়া যায়।

১৩৯ পৃষ্ঠা—বেদজ্ঞ, গৃহস্থ ও যশোযুক্ত ব্রাহ্মণগণের সেবা করাই শূদ্রের পরম শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম।

১৪৫ পৃষ্ঠা—যে অপরাধে প্রাকৃত জনের এক পণ দণ্ড হইবে, রাজা স্বয়ং যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁহার সহস্রগুণ দণ্ড হইবে, ইহাই ধর্ম্মব্যবস্থা।

শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডের অষ্টগুণ দণ্ডনীয়। বৈশ্য চোর ষোড়শগুণ দণ্ডনীয়। এবং ক্ষত্রিয় চোরের বত্রিশগুণ দণ্ড হইবে।

ব্রাহ্মণ চোরের চৌষট্টিগুণ ও অবস্থা অনুসারে শতগুণ বা একশত আটাইশগুণ দণ্ড হইবে। যেহেতু তিনি সকল কার্য্যের গুণদোষে অভিজ্ঞ।

১৪৬ পৃষ্ঠা—শুচি, উৎকৃষ্ট জাতির সেবাকারী, ব্রাহ্মণাদির আশ্রিত, মৃদুভাষী, অনহঙ্কৃত শূদ্র উৎকৃষ্টজাতি প্রাপ্ত হয়।

১৭৫ পৃষ্ঠা—হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। গীতা ৪।৭

১৭৯ পৃষ্ঠা—যিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আমাকে একাগ্রচিত্তে ভজনা করেন, সেই যোগী যে কোনরূপে অবস্থান করুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। গীতা ৬।৩১

২০০ পৃষ্ঠা—বিষয়চিন্তারত ব্যক্তির সেই সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সদসৎ বিবেকের নাশ হয়, তাহা হইতে শাস্ত্রোপদেশ ও আচার্য্যোপদেশ-জনিত স্মৃতির বিনাশ হয়, তাহা হইতে চেতনানাশ এবং চেতনানাশ হইতে মৃত্যু হয়। গীতা ২।৬২,৬৩

২০৪ পৃষ্ঠা—রাগদ্বেষহীন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও শান্তিলাভ করেন। গীতা ২।৬৪

২১৮ পৃষ্ঠা—সমগ্র বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও শীল, সাধুগণের আচার এবং আত্ম প্রসাদ, এইসকল ধর্ম্মের মূল প্রমাণ।

২৬২ পৃষ্ঠা—বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে আচ্ছাদন ও অর্চ্চনা করিয়া যে দান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। মনু ৩—২৭

২৭৫ পৃষ্ঠা—পূর্ব্বে যে সকল কঠিন প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইল, সে আবিষ্কৃত পাপ ক্ষালনের জন্য। যে মহাপাপ অনাবিষ্কৃত অর্থাৎ লোকে জানিতে পারে নাই, সে সকল পাপ মন্ত্র ও হোম দ্বারা ক্ষালিত হয়। মনু ১১—২২৭

খ্যাপন, অনুতাপ, তপ, অধ্যয়ন ও আপৎকালে দানে পাপ নষ্ট হয়। মনু ১১—২২৮

পাপ করিয়া যদি সন্তাপ উপস্থিত হয় ও পুনরায় আর করিব না বলিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পাপ নষ্ট হয়। মনু ১১—২৩১

হে কৌন্তেয়! প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ সংযতচিত্ত পুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে। গীতা ২—৬০

২৮৯ পৃষ্ঠা—স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। গীতা ৩—৩৫

স্বধর্ম্ম ভাবিয়াও কম্পিত হওয়া উচিত নহে। গীতা ২—৩১

যদি হত হও, স্বর্গ লাভ হইবে; যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে। গীতা ২—৩৭

২৯০ পৃষ্ঠা—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল স্বভাবজাত গুণানুসারে বিভক্ত। গীতা ১৮—৪১

শম, দম, তপ, শুচিত্ব, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং পরলোকে বিশ্বাস, এই সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের স্বাভাবিক। গীতা ১৮—৪২

পরাক্রম, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, যুদ্ধে অপলায়ন, ঔদার্য্য, নিয়মনশক্তি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক। গীতা ১৮—৪৩

কৃষি, গোরক্ষ্য (পশুপালন) এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক, এবং পরিচর্য্যা শূদ্রদিগের স্বাভাবিক। গীতা ১৮—৪৪

স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করেন। স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি যেরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন তাহা শ্রবণ কর। গীতা ১৮—৪৫

যে বিভু হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি আসে এবং যিনি বিশ্বব্যাপী, মানব স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে। গীতা ১৮—৪৬

বিগুণ স্বধর্ম্ম, স্বনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া লোকে পাপভাগী হয় না। গীতা ১৮—৪৭

হে কৌন্তেয়, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাববিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। যেহেতু ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় সমুদয় কর্ম্মই দোষে আবৃত। গীতা ১৮—৪৮

যাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়েই অনাসক্ত, যিনি নিরহঙ্কার এবং নিঃস্পৃহ, তিনি আসক্তি ত্যাগ এবং কর্ম্মফল ত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট সত্ত্বশুদ্ধি প্রাপ্ত হন। গীতা ১৮—৪৯

২৯১ পৃষ্ঠা—ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই। গীতা ২—৩২

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর, তাহাতে পাপ হইবে না। গীতা ২—১৮

২৯৪ পৃষ্ঠা—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা করেন, অন্য লোকেরা তাহাই করে। গীতা ৩—২১

২৯৭ পৃষ্ঠা—অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে নাই। বিদ্বান্‌দিগের নিজেই সকল কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানগণকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা উচিত। গীতা ৩—২৬

২৯৮ পৃষ্ঠা—শিক্ষাদান, ভরণ ও রক্ষণ জন্য রাজাই প্রজাগণের পিতা; তাহাদের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতা মাত্র।